গান্ধী-হত্যার কাহিনী

●

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী

●

শ্রীশিশির কুমার বসু
সম্পাদিত

শ্রীগুরু লাইব্রেরি
২০৪, কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

প্রথম প্রকাশ

ফাল্গুন, ১৩৫৫

প্রকাশক

শ্রীভুবনমোহন মজুমদার

শ্রীগুরু লাইব্রেরি

২০৪, কর্নওয়ালিস্ স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর

শ্রীবিশ্বতোষ সেন, এম্-এ

ফাইন প্রিণ্টার্স লিমিটেড

৪২, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন

কলিকাতা-৬

দাম : সাড়ে চার টাকা

গান্ধীবাদী ও গান্ধীবিবাদীদের হাতে।

বিনীত

গ্রন্থকার

নিবেদন

এই গ্রন্থের নামকরণ করেছেন আমার সাহিত্য-গুরু পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার। গ্রন্থ-রচনার মূলে রয়েছে কবি-বন্ধু শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্যের প্রেরণা ও শুভেচ্ছা। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মাননীয় 'ভগ্নদূত'-সম্পাদক শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার বসু মহাশয়ের সুযোগ্য সম্পাদনা। যে-সকল পত্র-পত্রিকার সংবাদ-ঘৃতপানে পরিপুষ্ট হয়েছে গ্রন্থের কলা ও কলেবর, তাদের ঋণ অপরিশোধ্য হলেও অনস্বীকার্য্য। গ্রন্থের প্রচ্ছদপট এঁকেছেন চিত্রকর-বন্ধু শ্রীকালিদাস কর ও শ্রীসমর গঙ্গোপাধ্যায়। চিত্রপট উপলক্ষে তাঁদের অকপট বন্ধুপ্রীতি আঁকা রইলো আমার চিত্তপটে।

আর-একটি কথা। গান্ধী-হত্যা-মামলার শুনানিকালে এই রচনার প্রায় সবটুকুই ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো 'ভগ্নদূতে'। গ্রন্থের প্রতিটি পরিচ্ছেদও সাজানো হয়েছে সেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিচ্ছদে। গ্রন্থপাঠকালে পাঠক-পাঠিকাগণ অনুগ্রহ করে এই কথাটি স্মরণ রাখলে বাধিত হবো। ইতি

১লা ফাল্গুন, ১৩৫৫
কলকাতা

বিনীত
বীরেন্দ্রনাথ পালচৌধুরী
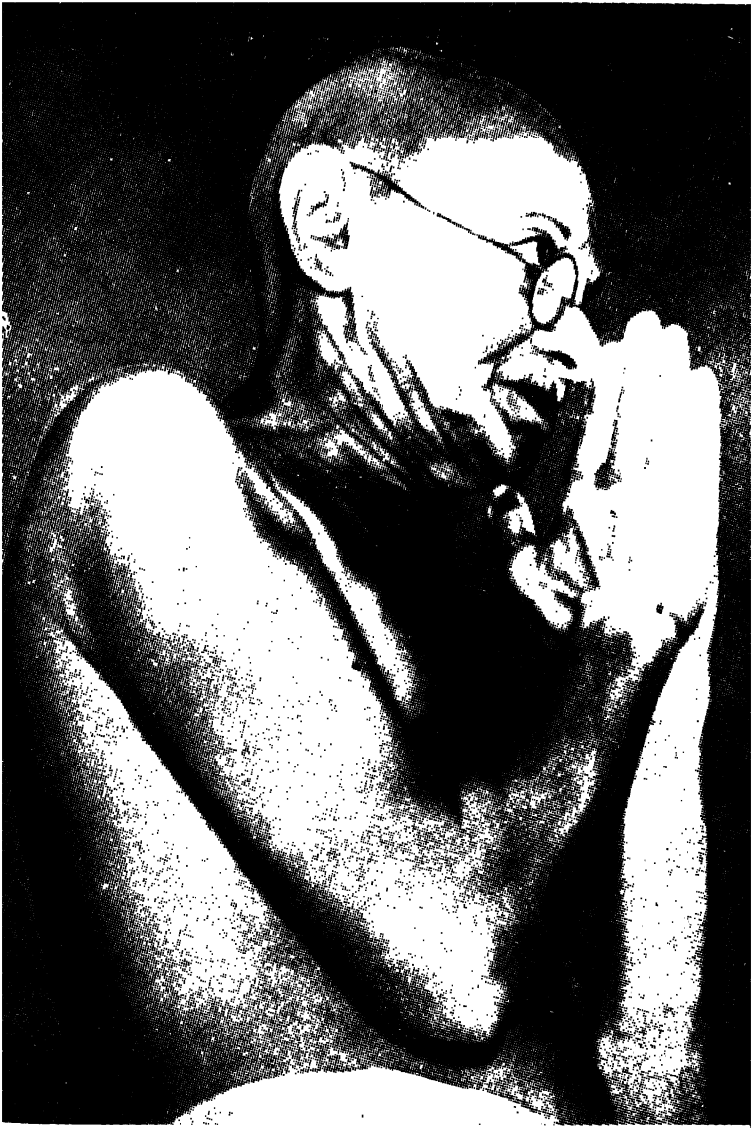
জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী

গান্ধী-হত্যার কাহিনী

এক

কথারম্ভ

ইংরেজি ১৯৪৮ সাল, ৩০শে জানুয়ারি, শুক্রবারের অপরাহ্ন।

ভারত-ভাগ্যাকাশে ছিলো শনির বক্রদৃষ্টি, ঘটলো অশনিপাত। ফলে হলো গুরুদলের মহাগুরুনিপাত।

বেতারযোগে সেই বার্ত্তা প্রচারিত হলো চারিদিকে। তারই দিকে নিবদ্ধকর্ণ নরনারীর বোধশক্তি ক্ষণকালের জন্যেও গেলো হারিয়ে। আততায়ীর গুলীতে মহাত্মাজী নিহত, বিশ্বাস হলো না সে-কথা। অজ্ঞাতে তবু দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো, চোখের কোণে দেখা দিলো অশ্রু। 'অসম্ভব' কথাটা আবার এক নতুন অর্থে সম্ভব হলো, শত্রু জাত হলো অজাতশত্রুর।

কিন্তু অজাতশত্রু কি জাত হয় জগতে? ইতিহাস হয় অ-ইতিহাস? পৃথিবীর সর্ব্বত্র চলেছে শক্তির লীলা, শক্তিতে-শক্তিতে সঙ্ঘাত। তারই ঘাত-প্রতিঘাতে আবর্ত্তিত হচ্ছে সৃষ্টি। বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে ঠোকাঠুকি করে এবং তাকে ঠেকিয়ে-ঠেকিয়েই এগিয়ে চলে প্রাণধর্ম্মী জীবজগৎ। তাই না-মরবার কামনার সঙ্গে থাকে মারবার কামনা, প্রেমের সঙ্গে হিংসা। এই প্রেমেরই আর-এক রূপ হিংসা, হিংসারই রূপান্তর প্রেম। দু'টিই অবিচ্ছেদ্য। এর যে-কোনো একটাকে অস্বীকার করা আর জীবধর্ম্মকে অস্বীকার করা একই। অতএব, শত্রু নেই, এ-কথা বলতে পারে কেউ? পেরেছেন বুদ্ধদেব, যীশুখ্রীষ্ট, শ্রীচৈতন্য—মহাপ্রেমিক হয়েও? পেরেছেন কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং?

গান্ধী-হত্যার কাহিনী

পরদিন সংবাদপত্রের স্তম্ভে দেখা দিলো স্তম্ভিত বিস্ময়। তার চিত্রটি এইরূপ :

দিল্লীর বিড়লা ভবনের কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গান্ধীজী আসছিলেন প্রাঙ্গণের প্রার্থনা সভায়। দু'পাশে ক্রাচের মতো ছিলেন তাঁর নাতনী মানু গান্ধী আর নাত-বৌ আভা গান্ধী। তাঁরা মঞ্চের পাশে এসেছেন, এমন সময় জনতার মাঝখান থেকে বেরিয়ে এলো এক যুবক, এগিয়ে গেলো মহাত্মার দিকে। বোধ করি, বাপুজীকে সে প্রণাম করতে এসেছে, এই ভেবে তার হাত ধরতেই হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সে পিস্তল বার করে মহাত্মাকে গুলী করলো,—একবার, দু'বার, তিনবার। যোড়করে 'হা রাম!' বলে গান্ধীজী ভূমিতলে পড়ে গেলেন। সেদিন শুভ্র খদ্দর-বাসে পড়িল রক্তলিখা!

তাঁকে বহন করে নিয়ে যাওয়া হলো তাঁর কক্ষে: কিন্তু বক্ষের রক্তপাত থামলো না কিছুতেই, খানিকক্ষণ পরে চক্ষে নেমে এলো চির অন্ধকার।

একাগ্রচিত্তে মানুষ যা চায় তাই না কি পায়। গান্ধীজী তাঁর শেষ জীবনে সব ছেড়ে চেয়েছিলেন তাঁর ইষ্টদেবতা 'রাম'কে। সেই 'রাম'ই কি এসেছিলেন তাঁর কাছে 'নাথুরাম' হয়ে? ভক্ত কি মৃত্যুর মাঝেও দেখেছিলেন তাঁকে? তাঁর উদ্দেশ্যেই উচ্চারিত হয়েছিলো, 'হা রাম'?

কিন্তু ভক্তের চোখে যা-ই হোক, লোকের চোখে নাথুরাম আততায়ী। ইতিমধ্যে ধরা পড়লো সেই আততায়ী, বন্দী করে রাখা হলো তাকে। আপাতত পক্ষকাল তার দিকে তাকাবার অবকাশ নেই। বি-পক্ষের তখন শোকের সময়। তবু তার সম্বন্ধে জানা গেলো দু'টি কথা,—

গান্ধী-হত্যার কাহিনী

নাম তার নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে, জাতিতে মারাঠি; আর সে বললে, তার কাজের জন্যে মোটেই সে দুঃখিত নয়।

শোক হৃদয়ের, আর বুদ্ধি মস্তিষ্কের। প্রথমটাতে আছে অনুরক্তি, পরেরটায় যুক্তি। একটার প্রকাশ আচারে, অন্যটার বিচারে। শোকের সময় সবাই এই দুর্ঘটনার সম্বন্ধে ভেবেছে,—ভারতের ইতিহাসে এই নৃশংসতা অসংশয়ে অদ্বিতীয়। খুঁজে খুঁজে এর জুড়ি বার করেছে,—ঈশার মৃত্যু, লিংকনের মৃত্যু, গুলীবিদ্ধ লেনিনের কাহিনী। কেউ বলেছে, প্রবুদ্ধ ভারতের নব বুদ্ধ; কেউ বলেছে, প্রেমিক চৈতন্যের নব চৈতন্য-লীলা। এতে গান্ধীকে বড়ো করা হয়েছে কি ছোটো করা হয়েছে, সে-প্রশ্ন অবান্তর। কারণ, এ কথা ভেবেছে, বুদ্ধি নয়,—অন্তর।

অনন্তর শোকাবেগ অন্তে যখন বিচারের দিন এলো, সবাই দেখলে, গান্ধী-হত্যা কেবল আকস্মিক ঘটনা নয়, তার পেছনে রয়েছে একটা সুপরিচালিত পরিকল্পনা, একজনের নয়—বহুজনের।

গ্রহবৈগুণ্যেই ঘটে বিগ্রহ, জ্যোতির্ব্বিদগণের এই অভিমত। রাজনীতিবিদগণও এ-বিষয়ে একমত। তবে গ্রহকে তাঁরা আকাশচারী বলে গ্রহণ করেন না, ভাবেন মর্ত্যচারী বিগ্রহ বলে। ক্রমশ জানা গেলো, একাধিক ব্যক্তিই নেড়েছেন এই ষড়যন্ত্রের যন্ত্রকাঠি। তাঁরা এই দেশেরই লোক; এবং সর্ব্বাধিক বিস্ময়ের কথা এই যে, তাঁরা সবাই হিন্দু।

মহাত্মার সংগ্রাম ছিলো যান্ত্রিক জড়বাদের সঙ্গে আত্মিক শক্তির সংগ্রাম; আদর্শ ছিলো,—হিংসার পরিবর্ত্তে প্রেম, আঘাতের বিনিময়ে

আলিঙ্গন। কংগ্রেসের ইতিহাসও এই সংগ্রামেরই ইতিহাস। সৃষ্টির ইতিবৃত্তও তা-ই। চিরকাল ধরে চলে আসছে এই সংগ্রাম। এক পক্ষে দেব, আর-এক পক্ষে দানব। এক দিকে জীবন-ধর্মের মজ্জাগত সংস্কার, আর-এক দিকে তাকে অতিক্রম করবার আদর্শ। দুই পক্ষই শক্তিধর। কখনো জিতেছে দেব, কখনো দানব। শেষ মীমাংসা হয় নি কোনোদিন, আজো না। দানব নিঃশেষে মরে না কখনো। রক্তবীজ সে। ভূতের অনুভূতির মতো। যে-ভূত তাড়াবার সাধনা ওঝার সেই ভূতই একদিন তাড়ায় ওঝাকে। যে-হিংসাকে জয় করবার সাধনা ছিলো গান্ধীজীর সেই হিংসাই তাঁর বুকে বিঁধলো গুলী হয়ে।

কিন্তু কংগ্রেসের প্রতি হিন্দুর এ-হিংসার কারণ কি? শুধু পথ নয়, মতেরও অমিল। এখন বাদ হয় মতবাদে-মতবাদে ; যেমন,—ধনিক-বাদে-সাম্যবাদে, ফ্যাসিবাদে-জাতীয়তাবাদে। কংগ্রেস চেয়েছিলেন ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র, এঁরা চেয়েছিলেন ধর্ম্মরাষ্ট্র। একদল চেয়েছিলেন আত্ম-বিলোপের মধ্যে মুক্তি, আর-একদল খুঁজেছিলেন আত্মরক্ষার মধ্যে শক্তি। এইখানেই দ্বন্দ্ব। এঁদের প্রতিবন্ধ ছিলেন কংগ্রেস-গুরু মহাত্মা। তাই সেখানেই এলো চরম আঘাত।

অবশ্য পরে জানা গেছে এসব খবর। আরো জানা গেছে যে, 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ' এবং 'হিন্দু মহাসভা' না কি অংশ গ্রহণ করেছিলেন হিন্দুপক্ষে। অতএব ঐ দু'টি প্রতিষ্ঠানের উপরেই পড়লো কংগ্রেস কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি। এঁদের সন্ধানে তাঁরা সৃষ্টি তোলপাড় করলেন। ফলে বহুলোক পড়লো ধরা, তাঁদের কাছ থেকে পাওয়া গেলো বহু প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও তথ্য। এমন কি, তাঁদের একটি

শাখা-কার্য্যালয়ে দেখা গেলো,—গান্ধীজীর চিত্রের দিকে তাঁর বুক লক্ষ্য করে বসানো রয়েছে একটা বন্দুক, এবং চিত্রে তার লক্ষ্যস্থানটিতে রয়েছে একটি ছিদ্র। গুলীবিদ্ধ মহাত্মার প্রতীক। সন্দেহ পরিণত হলো বিশ্বাসে। কিন্তু যাঁদের ধরা হলো এ সম্পর্কে, তাঁদের অনেকেই অবিশ্বাস্যরূপে বিশ্বাসযোগ্য।

ধরা হলো অনেককেই। আবার ছাড়াও হলো অনেককে। শেষ পর্য্যন্ত টিকলো ন'জন।

আকাশে রয়েছে নবগ্রহ। তাদের বিরূপ সংস্থানেই পৃথিবীতে ঘটে বিপর্য্যয়। এই রাজনৈতিক বিপর্য্যয়ের পেছনেও কি রয়েছে তেমনি ঐ ন'জনের কোনো গুপ্ত অভিসন্ধি, উত্তরকাল দেবে তার উত্তর। আপাতত এঁরা রইলেন বন্দী—ভবিষ্যৎ-বিচারের প্রতীক্ষায়। ইত্যবসরে ঐ নব-গ্রহের পরিচয় গ্রহণ করি আমরা।

দুই

নব-গ্রহ পরিচয়

নাথুরাম রিনায়ক গড্‌সে

গৌরকান্তি মারাঠি যুবক এই নাথুরাম। বয়স সাঁইত্রিশ বছর। উচ্চতা পাঁচ-ফুট দু'-ইঞ্চি। যদিচ বয়স তাঁর খুব বেশি নয় তবু এরই মধ্যে মাথার চুল তাঁর অর্দ্ধেক শাদা হয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ-শাস্তির ভাবনায়

নয়, অনেক দিন আগে থেকেই কেশের এই অকালপক্কতা। তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা এক খৃষ্টান মিশনারি স্কুলে। কিন্তু সেখানকার প্রভাবেই গড়ে উঠে নি তাঁর মনোভাব। মিশনারির সংস্পর্শে 'মিশন' হারান নি তিনি। আগাগোড়া তিনি গোঁড়া হিন্দু। জীবনে ডিপ্লোমা একটি পেয়েছিলেন, সেটি দর্জ্জির। দর্জ্জির দোকানের দরজাও খুলেছিলেন কিছুদিন। ১৯৩৭ সালে বীর সাভারকরের সঙ্গে ঘটে তাঁর পরিচয়। তাঁর কর্ম্মসচিব হয়ে কিছুকাল এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ান নাথুরাম। আগে ছিলেন তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের সভ্য। পরবর্ত্তী জীবনে গ্রহণ করেন সাংবাদিক ব্রত। পুণায় একটি মারাঠি পত্রিকা প্রকাশ করেন ১৯৪৪ সালে, নাম "অগ্রণী"। কিছুকাল পরে সেটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে অন্য একটি পত্রিকার সম্পাদনা সুরু করেন, সে-পত্রিকাটি "হিন্দু রাষ্ট্র"।

কাঁচি ও কলম-চালানো হাত-যে পিস্তল চালাতেও কাঁচা নয়, গান্ধীজীকে নিজ হস্তে গুলী করে এই কথাই প্রমাণ করলেন তিনি, যদিও সে-প্রমাণ বিস্ময়কর।

বিনায়ক দামোদর সাভারকর

হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব্ব সভাপতি এই বিপ্লবী বীরের অভূতপূর্ব্ব জীবনীর সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় আছে শিক্ষিত ভারতবাসীর।

মারাঠা জাতি চিরকাল স্বাধীনতা ও বীরত্বের উপাসক। সেই জাতিরই এক মহান বংশে জন্মেছিলেন রাজনীতিবিশারদ নানা ফাড়নাবীশ, জন্মেছিলেন ভারতের প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম সিপাহী-বিদ্রোহের অন্যতম

অধিনায়ক নানাসাহেব, জন্মেছিলেন মহামতি গোখেল, লোকমান্য তিলক। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে সেই পবিত্র বংশেই বীর সাভারকরের জন্ম।

পুণার কলেজে যখন পড়তেন তিনি, তখন থেকেই যোগ দেন ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলনে। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সর্ব্বপ্রকার বিপ্লবী পন্থাকেই করেন অনুসরণ। লণ্ডনে গিয়ে ব্যারিষ্টারি পাশ করেছিলেন, কিন্তু সরকারের ইচ্ছাক্রমে তাঁর নাম তালিকাভুক্ত হয়নি। সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্র করেছেন, এই অভিযোগে ১৯১০ সালে লণ্ডনেই ধৃত হন তিনি। এই সম্পর্কে যে-মামলা চলেছিলো, নাসিক ষড়যন্ত্রের মামলা নামে সেটি খ্যাত। লণ্ডন থেকে জাহাজে করে তাঁকে পাঠানো হলো ভারতে। পথে Marseilles-র কাছে এসে প্রহরীদের চোখ এড়িয়ে সাভারকর ঝাঁপিয়ে পড়লেন সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে। পালিয়ে আশ্রয় নিলেন ফরাসি এলাকায়। দুর্ভাগ্যক্রমে সেখানেও আবার হলেন ধৃত। এবার কিন্তু বিরোধ উপস্থিত হলো, কার হাতে তিনি বন্দী থাকবেন, এই নিয়ে,—ইংরেজের, না ফরাসির? পরে তাঁকে পাঠানো হলো "দি হেগ"-এর আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়ে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু তাঁকে আসতে হলো ভারতে, আর সেখানেই হলো তাঁর বিচার। দণ্ড হলো যাবজ্জীবন কারাবাস। আন্দামানে চোদ্দ বছর রইলেন বন্দী। সেখান থেকে ১৯২৪ সালে আবার তাঁকে আনা হলো ভারতে। রত্নগিরিতে করা হলো অন্তরীণ। ১৯৩৭ সালে বোম্বাই-য়ের অন্তর্ব্বর্ত্তী মন্ত্রীসভা সমস্ত বাধানিষেধ অপসারিত করলেন তাঁর উপর থেকে। সাভারকর তারপর যোগদান করেন হিন্দু মহাসভায়, নির্ব্বাচিত হন তার সভাপতি।

সাভারকরের আর-এক পরিচয়,—মারাঠি ভাষার একজন প্রসিদ্ধ লেখক তিনি। আবার একজন সমাজসংস্কারকও বটেন।

তাঁর বর্ত্তমান বয়স পঁয়ষট্টি।

নারায়ণ দত্তাত্রেয় আপ্তে

আপ্তের বয়স চৌত্রিশ, গড়ন ছিপছিপে, সদাহাস্যময় মুখ।

তিনি বি. এস-সি ও বি. টি. পাশ। পূর্ব্বে বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা করতেন আমেদনগরে। তিনি একটি রাইফেল ক্লাব স্থাপন করেছিলেন সেখানে।

বিষ্ণু রামচন্দ্র করকারে

করকারের বয়স সাঁইত্রিশ। দেহের গঠন আপ্তের বিপরীত। আমেদনগরের অধিবাসী তিনি। একটি রেস্তোরাঁ ও বহু অর্থের মালিক এই করকারে।

দিগম্বর রামচন্দ্র বাদগে

বাদগে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের একজন কর্ম্মী। বয়স পঁয়ত্রিশ। পুণার একটি ছোরা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রের দোকানের মালিক।

মদনলাল পাওয়া

মাত্র বিশ বছরের যুবক এই মদনলাল।

মহাত্মা গান্ধী নিহত হবার দশ দিন আগে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভার প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে একটি বোমাবিস্ফোরণ ঘটে। সন্দেহ-

ক্রমে মদনলালই ধৃত হন সেখানে। অনুসন্ধানে তাঁর কাছে হাত-বোমাও আবিষ্কৃত হয় একটি।

গোপাল বিনায়ক গড্‌সে

নাথুরাম গড্‌সের ছোটো ভাই। বয়স সাতাশ।

গত যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন ইনি। যুদ্ধের পর একটি কারখানা খুলেছিলেন। কিন্তু গান্ধী-হত্যার পরদিন উত্তেজিত জনতা নষ্ট করে ফেলে সেই কারখানা।

দত্তাত্রেয় সদাশিব পারচুরে

ভদ্রলোকের বয়স উনপঞ্চাশ।

গোয়ালিয়রের জনৈক চিকিৎসক ইনি।

শঙ্কর কিস্তায়া

ইনি বাগদের ভৃত্য।

ভৃত্য, বিশেষত পুরাতন ভৃত্য, বন্ধুর মতো। অন্তত এই ক্ষেত্রে তার কিছু লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়েছে। বিলাস, ব্যসন ও দুর্ভিক্ষে ইনি বাদগের সঙ্গী ছিলেন কি না, জানি না। তবে রাষ্ট্রবিপ্লবে যে সঙ্গী ছিলেন সে তো প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছি। এখন এসেছেন রাজদ্বার পর্য্যন্ত। 'শ্মশানে চ' সঙ্গ নেবেন কি না, সে-কথা নির্ভর করছে ভবিতব্যের উপর।

অভিযুক্তদের সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মতো। ন'জনের মধ্যে সাতজনই মহারাষ্ট্রের অধিবাসী।

তিন শতাব্দী পূর্ব্বে মোগল রাজত্বের আমলে মহারাষ্ট্র-নায়ক শিবাজী মহারাষ্ট্রে স্থাপন করেছিলেন হিন্দু-রাষ্ট্র। তাঁর স্বপ্ন ছিলো, "এক ধর্ম্ম-রাজ্য-পাশে খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারত"কে বেঁধে দেবেন তিনি। ঐতিহাসিক প্রয়োজন ঘটেছিলো তার। আকবর যখন রাজাসনে তখন যার দরকার হয় নি, আওরংজেবের শাসনে তাই এলো আসন্ন হয়ে। আত্মরক্ষার সংস্কার প্রবল হয়ে উঠলো হিন্দুদের মধ্যে। সেই আবেগ কেন্দ্রীভূত হলো মহারাষ্ট্রে, পরে আঘাত হানলো হিন্দু-দ্বেষী সম্রাটকে। কংগ্রেসী শাসনেও আবার দেখা দিলো সেই ঐতিহাসিক প্রয়োজন। ভালো-মন্দের প্রশ্ন এখানে নেই, যা হয়ে থাকে তারই কথা। কংগ্রেসের অহিংসা ধর্ম্মের আদর্শ উচ্চ, কিন্তু সাধারণ জীবধর্ম্মী মানুষের কাছে তার মূল্য তুচ্ছ। কারণ, অনধিকারীর তামসিক অহিংসা আত্মহত্যারই নামান্তর, কংগ্রেসী-প্রেম আর্জ্জুনিক ক্লৈব্যেরই রূপান্তর। মানুষ কেউ আত্মহত্যা করতে চায় না। কিন্তু কংগ্রেস হিন্দুকে পরোক্ষে বললে, তাই করো, অর্থাৎ মরো। কারণ, হিন্দুত্বের চেয়ে মানবত্ব বড়ো, হিংসার চেয়ে প্রেম। কিন্তু প্রাণের সংস্কার যার মধ্যে সে কেন বুঝবে এই কথা? আর আদর্শ তার অনুকূল না হলে আবেদন ব্যর্থ হতে বাধ্য,—তা সে আদর্শ যতো বড়োই হোক না কেন। স্বভাবের প্রভাবই তাই বড়ো হয়ে উঠে। এই স্বভাবের ভাবাবেগই সৃষ্টি করে ইতিহাস। তারই প্রয়োজনে ইতিবৃত্ত হলো পুনরাবৃত্ত। যে-মহারাষ্ট্রীয় রক্তে একদা জেগেছিলো মহাবিপ্লব সেই মহারাষ্ট্রীয় রক্তেই আবার দেখা দিলো তার তরঙ্গোচ্ছ্বাস।

যে-ধারা ধীরপ্রবাহে সঞ্চারিত হচ্ছিলো পুরুষ হতে পুরুষানুক্রমে, বাধা পেয়ে তারই পৌরুষ গর্জ্জে উঠলো কূলপ্লাবী তাণ্ডবে। আশ্চর্য্য, সেই রুদ্র-লীলা আর-কোথাও প্রকাশ পেলো না, প্রকাশ পেলো মারাঠিদের মাঝে, একদা যাঁদের পূর্ব্বপুরুষ তাঁদের মতোই দেখেছিলেন হিন্দু-রাষ্ট্র-গঠনের স্বপ্ন। কে বুঝবে ইতিহাস-বিধাতার এই রহস্যময় নিগূঢ় ইঙ্গিত?

অবশ্য কোনো বিশেষ ধর্ম্মরাষ্ট্র সফল হতে পারে না কখনো। শিবাজীর হিন্দু-রাষ্ট্র ব্যর্থ হতো না তা হলে। পাল্টা প্রশ্ন হতে পারে, ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রই বা ক'টা সফল হয়েছে? হয় নি সত্য। তবু মানুষের সুমুখে থাকে মহান আদর্শ, তাকে লক্ষ্য করেই তার পথ চলা। সেদিক দিয়ে বিচার করলে বলতে হয়, মানুষের আদর্শ হওয়া উচিত,—হিন্দুত্ব নয়, মুসলমানত্ব নয়, ক্রিশ্চানত্ব নয়,—মানবত্ব। এই তত্ত্বের উপরেই সম্ভব সত্যের প্রতিষ্ঠা। প্রাণের সহজাত সংস্কার ও জীবধর্ম্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই মানবত্বের ভিত্তির উপর কখনো যদি গড়ে উঠে কোনো রাষ্ট্র, সেদিনই হয়তো হবে এই দ্বন্দ্বের নিরসন!

আত্মকলহের ভীষণ রক্তপাতের মধ্যে, গান্ধীজীর এই নির্ম্মম হত্যা-কাণ্ডের মধ্যে, সংহার-দেবতার ভবাবহ রুদ্র-তাণ্ডবের মাঝখানেও ভারত চেয়ে আছে সেই নবসৃষ্টির পানে, অন্তরের অন্তরে শুনতে পাচ্ছে সেই অনাগত দেবতারই পদধ্বনি।

তিন

লাল কেল্লা

দিল্লীর লাল কেল্লা!

যাকে ঘিরে ছিলো অপরিচয়ের বিস্মৃতির কালো, তাকে ঘিরেই আজ অতিপরিচয়ের প্রীতির আলো। সকলের চোখে আজ লাল কেল্লার ছবি, সকলের মুখে আজ লাল কেল্লার গান, লাল কেল্লার মানই আজ ভারতের সম্মান, দুর্গশীর্ষে তারই নিশানা ঐ তে-রঙা নিশান।

লাল কেল্লার ইতিহাস তিনশো বছরের প্রাচীন ইতিহাস। সম্রাট শাহ্‌জাহান তখন্ দিল্লীর শাহীতখ্‌তে। মুঘল রাজত্বের তখন "স্বর্ণ-যুগ", আধিপত্যের নয়, স্থাপত্যের। কলকৌশলের চেয়ে কলাকৌশলের দিকেই দৃষ্টি ছিলো সম্রাটের। তাই সৃষ্টি হলো তাজমহল, দেওয়ান-ই-খাস, লাল কেল্লা।

লাল কেল্লার কথা এতোদিন ছিলো ইতিকথার নির্জীব অক্ষর। আজ তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানুষের স্বাক্ষর। একদা যে-ছিলো শুধু রক্ষী, আজ সে হয়েছে সাক্ষী। সাক্ষী আমাদের জাতীয় জীবনের।

১৭৫৭ সালে পলাশী-প্রান্তরে যাকে আমরা হারিয়েছিলাম, এক শতাব্দী পরে তাকেই আমরা খুঁজে পেয়েছিলাম সিপাহী-বিদ্রোহের মুক্তি-সংগ্রামে। যে-আগুন ছিলো চাপা, ১৮৫৭ সালের মার্চ মাসের এক সন্ধ্যায়, ব্যারাকপুরের শিবিরে, ৩৪ নং পদাতিক বাহিনীর ব্রাহ্মণ সৈনিক মঙ্গল

পাণ্ডের বন্দুকের মুখে সেই আগুনই এলো বেরিয়ে। জাতীয় জীবনের হলো অগ্নিময় প্রকাশ।

তারপরেই সুরু হলো আগুনের খেলা। একটি স্ফুলিঙ্গই দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চতুর্গুণ—অবশেষে বহুগুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়লো ব্যারাকপুর হতে বহরমপুরে, সেখান থেকে আম্বালায়, পরে মীরাটে, তারপর ক্রমশ লক্ষ্ণৌ, দিল্লী, কাশী, জৌনপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, ফতেপুর, বিঠুর, ফিরোজপুর, পেশোয়ার, পাটনা, দানাপুর, শাহারাণপুরে।

বিদেশী বণিক এই অপরূপকে দেখিয়েছে বিরূপ করে, সংগ্রামকে বলেছে বিদ্রোহ। তার কারণ নির্দ্দেশ করেছে, অজ্ঞ সৈনিকদের ধর্ম্মান্ধতা। কিন্তু সামান্য চর্ব্বির টোটা থেকে যার জন্ম সে কি করে পায় অটুট বল? স্বার্থের গল্প তাই আজ আমাদের কাছে অর্থহীন কল্পনা, সত্য শুধু সৈনিকের মুক্তি-সঙ্কল্প।

সেই সঙ্কল্পের লক্ষ্যস্থল ছিলো দিল্লী। শেষ স্বাধীন সম্রাট বাহাদুর শাহ্ তখন দিল্লীর মসনদে। হিন্দু-মুসলমানকে তিনি ডাক দিয়েছিলেন দেশকে বিদেশী-মুক্ত করবার জন্যে। ঘোষণা করেছিলেন, সবাই পাবে রাজ্যে সমান অধিকার, রাজনীতির মাঝে ধর্ম্মকে টেনে এনে অধর্ম্ম তিনি করবেন না। হিন্দু-মুসলমান সকলেই সাড়া দিয়েছিলো সেই ডাকে।

কিন্তু হায় ভাগ্য! সেই বাহাদুর শাহ্-রই বিচার হলো দিল্লীতে,—ঐ যমুনাতীরের লাল কেল্লায়! দণ্ড হলো রেঙ্গুনে নির্ব্বাসন। লাল কেল্লা হয়ে রইলো সেই ঐতিহাসিক বিচারের নীরব সাক্ষী।

ইতিহাস মাঝে মাঝে নিজেরই পুনরাবৃত্তি করে। সেই আবৃত্তি ঘটলো আবার প্রায় শতাব্দীকাল পরে। এবারেও সেই বীর সৈনিকদের

গান্ধী-হত্যার কাহিনী

মুক্তি-সংগ্রাম।– সেবারে ভারতের অভ্যন্তরে, এবারে বাইরে। লক্ষ্য কিন্তু এক,—দেশকে বিদেশীমুক্ত করা। তাঁদের সর্ব্বাধিনায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্রের স্বপ্ন ছিলো এই দিল্লী,—দিল্লীর এই লাল কেল্লা। তাঁর সৃষ্ট আজাদ হিন্দ্ ফৌজের রণ-সঙ্গীতেও ছিলো লাল কেল্লার উল্লেখ,—

"চলো দিল্লী পুকারকে
কোমী নিশান সাম্হাল্কে
লাল কিল্লে পৈ গাড়কে
লহরায়ে জা লহরায়ে জা।"

কিন্তু সেই ভাগ্য! বছর আড়াই আগে সেই বাহিনীর অধিনায়কগণের বিচার হলো এই লাল কেল্লায়। এবারেও ইংরেজই বিচারক। দণ্ড অবশ্য নির্ব্বাসন হলো না, হলো নিষ্ক্রিয়বাসন। এবারেও লাল কেল্লা রইলো নীরব সাক্ষী,—সাক্ষী দ্বিতীয় ঐতিহাসিক বিচারের।

তারপর এলো ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। যার জন্যে আমাদের শত বছরের প্রাণপণ সাধনা, অংশত ঘটলো তার সিদ্ধি লাভ। ইউনিয়ান জ্যাক পরিবর্ত্তিত হলো অশোকচক্রলাঞ্ছন ত্রিবর্ণ পতাকায়; নেতাজীর স্বপ্ন হলো সফল, "লাল কিল্লে পৈ" প্রোথিত হলো "কোমী নিশান"—জাতীয় পতাকা।

কিন্তু পতাকীচক্রে ছিলো পাতক, জাতক পাঁচ মাসের হতে হতেই আততায়ীর হাতে ঘটলো পিতার অপমৃত্যু। সেই আততায়ীরই বিচার হবে আজ এই লাল কেল্লায়,—তৃতীয় ঐতিহাসিক বিচার।

শাহ্‌জাহান যদি ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টা হতেন তো লাল কেল্লার নামকরণ করতেন লাল আদালত। বড়ো নয়, ছোটো নয়,—লাল আদালত,

যে-আদালতের বিচার-কাহিনী মহাকালের পুঁথির পাতায় জ্বলজ্বল করবে নীচে-লাল-দাগ-দেওয়া লাই নের মতো।

চার

অধিবেশনের আরম্ভে

১৯৪৮ সালের ২৭ মে বৃহস্পতিবার দিন আরম্ভ হলো বিচার।

লাল কেল্লার মধ্যে যে-বাড়ীটি ছিলো, "মিলিটারি পুলিশের হেড কোয়ার্টার", তার দ্বিতলের একটি কক্ষই হলো আদালত। এই চতুষ্কোণ কক্ষটির দৈর্ঘ্য একশো ফুট, প্রস্থ তেইশ ফুট।

কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হলো আদালত-গৃহের চারিদিকে। তাকে ঘিরে রইলো বহু সশস্ত্র প্রহরী। কড়াকড়ি যা করবার কর্তৃপক্ষ কিছুমাত্র ত্রুটি করলেন না তার। তিনশোর-ও বেশি 'পুলিশ' আর 'পুলিশ অফিসার' তো সব সময়েই মোতায়েন রইলেন লাল কেল্লায়। তার উপর আবার পঞ্চাশজন 'পুলিশ অফিসার' ও 'কনেস্টবল' আনানো হলো বোম্বাই থেকে,—বোম্বাই রকমের পাহারার ব্যবস্থার জন্যেই। লাল কেল্লাসংযুক্ত সমস্ত সড়কেও নিযুক্ত হলো প্রহরীর দল। দরজার সুমুখেও রইলো পরীক্ষক, প্রবেশকারীকে পরীক্ষা করবার জন্যে। এই হলো বাইরের ব্যবস্থা।

কথায় বলে, হকিমের ঘর, না হাকিমের ঘর। সব সময়ে সকলের সহজ প্রবেশাধিকার নেই সেখানে। হকিম আর হাকিমের অনেক

শুধু আকারে, প্রকার একই। একজন দেখেন রোগ, আর একজন বিচার করেন 'লোগ'। একজন লেখেন প্রেস্ক্রিপশন্, অন্যজন রায়। দাওয়াই দেন দু'জনেই; তবে একটাকে বলে ওষুধ, আর-একটাকে সাজা।

সেই হাকিমের আসন নির্দ্দিষ্ট হলো হলঘরের একপ্রান্তে উঁচু বেদীর উপর। তার সুমুখ দিকে কাঠের রেলিং-ঘেরা বেষ্টনীর মাঝখানে আসন নির্দ্দিষ্ট হলো সরকার ও আসামীপক্ষের কৌস্থলিদের। তার ডান পাশে সাক্ষীদের কাঠগড়া, আর-একদিকে আসামীদের।

পুরাকালে সংবাদপত্র ছিলো না। কিন্তু বর্ত্তমান যুগ পুরাপুরি সংবাদপত্রের যুগ। এরই যোগাযোগে ও যোগেযাগে সংগঠিত হয় মানব-মন, সংঘটিত হয় বহু অঘটন। সংবাদপত্র আজ উপেক্ষার নয়, অপেক্ষার বিষয়। অতএব তার প্রতিনিধিদের আড়াইশোটি আসনের বন্দোবস্ত হলো কৌস্থলিদের আসনের পশ্চাদ্ভাগে। শুধু তাই নয়, তাঁদের আরো সুযোগ-সুবিধার জন্যে আদালত-প্রাঙ্গণের মধ্যেই দেওয়া হলো আর-একটি আলাদা ঘর। সে-ঘরে রইলো টেলিফোনের সুব্যবস্থা।

আর সাক্ষীগোপাল দর্শকগণ শুধুই দর্শক, তাদের জন্যে আড়াইশো আসন নির্দ্দিষ্ট হলো সকলের পেছনে! তাঁরা থিয়েটারের সর্ব্বনিম্ন-শ্রেণীর টিকিটক্রেতার মতো। বসবেন পেছনে, আর দূর থেকে দেখবেন অভিনেতৃর হাত-পা নাড়া, বাণী না-ই বা শুনলেন।

অবশ্য এখানে মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা হয়েছে, কিন্তু রাজকুলের মতো সব সময়ে যে তার উপর আস্থা রাখা যায় না, প্রথম দিনেই

পাওয়া গেলো তার পরিচয়। কৌঁসুলিদের কথাবার্তা সাংবাদিকেরাই শুনতে পাননি, 'দর্শক পরে কা কথা'। তবে মজার কথা এই, দর্শকদের কোনো অসুবিধেই হয় নি তাতে, কারণ তাঁদের নির্দিষ্ট আসনের সব কয়টিই ছিলো আজ শূন্য।

সরকারি কৌঁসুলিদের মধ্যে রয়েছেন বোম্বাইয়ের অ্যাড্ভোকেট জেনারেল ও সরকারপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি শ্রীযুত সি. কে. দফতরি; আর তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে শ্রীযুত এন্. কে. পেতিগারা, বোম্বাইয়ের শ্রীযুত এম্. জি. ব্যবহারকর, পাঞ্জাবের রায়বাহাদুর জওলাপ্রসাদ ও দিল্লীর পণ্ডিত ঠাকুরদাস। বোম্বাইয়ের উপনগররক্ষীপাল (ডেপুটি পুলিশ কমিশনার) শ্রীযুত জে. সি. নাগরওয়ালা ছিলেন এই মামলার প্রধান তদন্তকারী। তাঁকেও আজ দেখা গিয়েছিলো আদালতে।

আসামীপক্ষের কৌঁসুলিদের মধ্যে প্রধান রয়েছেন শ্রীযুত এল্ বি. ভোপৎকার। আর তাঁর সঙ্গে রয়েছেন শ্রীযুত বি. ব্যানার্জি, শ্রীযুত যমুনাদাস মেহ্তা, শ্রীযুত গণপৎ রায় ও শ্রীযুত ইনামদার।

ঘড়িতে তখন দশটা বাজতে দু'মিনিট বাকি।

লাল কেল্লার বিশেষ কারাকক্ষ থেকে রক্ষীর প্রহরায় আসামীরা প্রবেশ করলেন আদালতের কাঠগড়ায়। বসলেন তিন সারিতে। আগে গড্সে, পরে যথাক্রমে আপ্তে, করকারে, বাদগে, মদনলাল, গোপলে গড্সে, শঙ্কর, সাভারকর ও পারচুরে।

গান্ধী-হত্যার কাহিনী

আসামীরা পরস্পর কথা কইছিলেন। তাঁদের কারো কারো মুখে ছিলো হাসি,—যেন কিছু-হয়নি, এমনি ভাব। হয়তো এই-ই তাঁদের স্বভাব। তারই প্রভাবে বন্দী অবস্থায় দু'একজনের ওজন বৃদ্ধি পেয়েছে, এমন কথাও শোনা গেলো।

শুধু দু'জন ব্যক্তির মাঝেই দেখা গেলো পৃথক অভিব্যক্তি। নাথুরাম পরেছিলেন সার্ট আর ধুতি, তবু তাঁকে মনে হচ্ছিলো গম্ভীর। তাঁর মাঝে না-ছিলো আবেগ, না-ছিলো উদ্বেগ। এমন নৃশংস হত্যাকে স্বীকার করেও অসংশয়ে তিনি ছিলেন নির্ব্বিকার।

আর সেই বৃদ্ধ সাভারকর। তাঁকে মনে হচ্ছিলো শান্ত, সমাহিত। চোখে ছিলো তাঁর এক অদ্ভুত দৃষ্টি। এককালে যিনি অনেক কিছু দেখিয়েছেন, আজ তিনি শুধু দেখছেন। পরাধীন ভারতে যিনি ছিলেন বীর বিপ্লবী, অর্দ্ধস্বাধীন ভারতে তিনিই আজ আসামী। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস।

ঢং ঢং করে দশটা বাজলো।

বিচারালয়ে প্রবেশ করলেন বিশেষ বিচারপতি শ্রীযুত আত্মাচরণ। মহাত্মাকে ইনি জানতেন, এইবার দুরাত্মাকে জানবেন। আত্মাকে না জানলেও আত্মকে জানেন, সেটুকু আত্মপ্রত্যয় এঁর আছে।

সেই প্রত্যয়কে প্রত্যক্ষদর্শনে পরিণত করবার জন্যে দর্শন দিলেন ফিল্মচিত্রকার ও ফটোচিত্রকার। তাঁরা নানারকম আলো জ্বাললেন, হরেকরকম ফটো তুললেন। দশ মিনিটের জন্যে ফিল্মচিত্রকারগণ আদালতকে করে তুললেন তাঁদের 'স্যুটিং স্টুডিও'। হয়তো এই ছবি ভবিষ্যতের একটা 'ডকুমেণ্টারি ফিল্ম' হয়ে থাকবে, হয়তো এই ছবি

দেখিয়ে চিত্রনির্ম্মাতাগণ বহু অর্থ উপার্জ্জন করবেন, কিন্তু আসামীদের কাছে তা কি-অর্থ বহন করবে, কেউ ভাবেন নি। হয়তো এই ছবি তোলার ব্যাপার পর্য্যবসিত হবে "in provoking laxity and publicity consciousness among the accsued." বিলাতের আদালতে কিন্তু ছবি তোলবার রেওয়াজ নেই, বিচারের কোনো চিত্রই সংবাদপত্রে বিচিত্র হয়ে দেখা দেয় না সেখানে।

শ্রীযুত সাভারকরকে অসুস্থ মনে হচ্ছিলো। হিন্দু মহাসভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত আসামীপক্ষসমর্থনকারী 'কমিটি'র সভাপতি শ্রীযুত ভোপৎকার, তাঁর অসুস্থ মক্কেলের পক্ষে, একটি আরাম কেদারা দেবার জন্যে আদালতকে অনুরোধ জানালেন। আদালত রক্ষা করলেন সেই অনুরোধ।

তারপর সরকারপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি শ্রীযুত দফ্‌তরি অভিযোগের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী দাখিল করলেন আদালতে। হত্যা, হত্যার ষড়যন্ত্র, হত্যাকার্য্যে সহায়তা, বেআইনীভাবে অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য রাখবার অভিযোগই আসামীদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ। আইনের ধারা অনুযায়ী ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সঙ্গে পঠিত ১২০-বি ধারা, বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩, ৪, ৫ ও ৬ ধারা, ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯-ডি ও ১৯-এফ ধারা, বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত ৫ ধারা ও ৩৪ ধারা, ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ১০৯ ও ১১৪ ধারা, ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯ ও ১১৪ ধারার সঙ্গে পঠিত ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯-ডি ও ১৯-এফ ধারা এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯ ও ১১৪ ধারার সঙ্গে পঠিত ১১৫ ও ৩০২ ধারার সঙ্গে এই অভিযোগের যোগ আছে।

বিচারপতি তখন প্রত্যেক আসামীকেই জিজ্ঞাসা করলেন যে, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছেন তাঁরা? এ সম্পর্কে আদালতের কোনো ব্যবস্থার প্রয়োজন তাঁদের আছে কিনা, তা-ও প্রশ্ন করলেন।

পাঁচ

প্রাথমিক কার্য্য

মানুষের মনে রয়েছে কৌতূহল। এ প্রবৃত্তি তার সহজাত। কর্ণের কবচকুণ্ডল ছিলো বিপদের বর্ম্ম, কৌতূহল মানুষের জ্ঞানের ধর্ম্ম। কৌতূহল নেই, এমন মন নেই। সেই প্রবৃত্তির কি হঠাৎ ঘটলো নিবৃত্তি?—বিচারের প্রথম দিনে দর্শক-আসনের শূন্যতা লক্ষ্য করে সকলের মনেই জেগেছে এই প্রশ্ন। জবাব মেলেনি। প্রশ্নটা দরকারী না হলেও ঘটনার কারণটা সরকারি কি না, এ নিয়ে আমাদের কিন্তু অনন্ত কৌতূহল।

দ্বিতীয় দিনটিও দর্শক সম্বন্ধে নির্ব্বাক।

কিন্তু অবাক করেছেন নাথুরাম বিশেষরূপে সবাক্ হয়ে। আগের দিন দেখেছি তাঁকে শীতের শান্ত পদ্মার মতো নিশ্চিন্ত, নিরুদ্বেগ। তাকে দেখে মনে পড়ে না বর্ষার কূল-ভাঙ্গা শক্তির রূপ। গড্ সেকে দেখে কি ভাবা যায় ৩০শে জানুয়ারির অশুভ অপরাহ্নের কথা? সাধারণ খুনীর মুখে থাকে দুশ্চিন্তার কালো লেখা। কিন্তু এঁর ললাটে তো নেই কোনো কুঞ্চন-রেখা।

গান্ধী-হত্যার কাহিনী

আততায়ীর মুখেও প্রশান্তি আমরা দেখেছি ক্ষুদিরাম, কানাইলালে, উত্তরকালের আরো বহু বিপ্লবীতে। কিন্তু তাঁদের সুমুখে ছিলো এক মহান্ আদর্শ, তাঁরা হত্যাকারী ছিলেন অত্যাচারীর। আর নাথুরাম?

নিশ্চয়ই তাঁরো সুমুখে ছিলো একটি আদর্শ। কি সে আদর্শ, বিচারে হয়তো হবে তার প্রকাশ। কিন্তু গান্ধীজী কি ছিলেন অত্যাচারী?

উত্তরটা যতো সহজ বলে মনে হয় আসলে ততো সহজ নয়। অত্যাচারী কথাটা আপেক্ষিক। ডালমিয়ার কাছে বিড়লা অত্যাচারী নন, কিন্তু তাঁর 'জুট্-মিলে'র একযোট মজুরের কাছে তিনি অত্যাচারী। বৃটেনের চোখে আমেরিকা বন্ধু, কিন্তু রাশিয়ার সে শত্রু। ভারতীয়ের পক্ষে শরীয়তি শাসন,—জুলুম। এমন কি, বর্ত্তমানে ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠন ব্যাপারটা এমন দাঁড়িয়েছে যে, অদূরভবিষ্যতে বাঙালীরা যদি বিহারীদের বলে বিপক্ষ; 'বন্দে মাতরম্'-এর উপলক্ষে তারা যদি দ্বন্দ্বে মাতে কংগ্রেস হাই কম্যাণ্ডের সঙ্গে; পণ্ডিতজীর মহাভারতীয় পাণ্ডিত্যের চেয়ে নিশ্চিন্ত নির্ভর করে নেতাজীর নিরপেক্ষ নিরভিমান নিঃশঙ্ক নেতৃত্বকে, তো বিস্মিত হবো না। লোকে যাঁকে বলে মহাত্মা, নাথুরামের চোখে তিনি যদি হন ব্রিটিশের দালাল, বা ঘনশ্যামের ধামাধরা, কিংবা মুসলিম-তোষক তাতে অদ্ভুতত্ব থাকতে পারে, নেই অস্বাভাবিকত্ব।

আগেও বলেছি, আসল কথা মতবাদের বিরোধ। তাকে নিরোধ করবে কে? প্রশ্নটা ভালো-মন্দের নয়,—রাজনীতির। তার সঙ্গে সম্পর্ক নেই সাধারণ নীতি-দুর্নীতির।

গান্ধীজীও ঐখানেই করেছিলেন ভুল। নীতির সঙ্গে সমন্বয় করতে চেয়েছিলেন রাজনীতির। কিন্তু আদর্শ আর প্রকৃতি কি এক? এথিক্‌স্‌ আর সাইকোলজি? একটা বুদ্ধির পৌরুষ, আর-একটা প্রাণের আবেগ। দু'টো কি মেলে সব সময়? অবশ্য গান্ধীজী করতে চেয়েছিলেন ঐ মেলাবার পরীক্ষা। যাকে তিনি জেনেছিলেন সত্য-নীতি বলে, তাঁর জীবনটাই ছিলো তার এক্‌সপেরিমেণ্ট। কিন্তু রসায়নের যোগের অঙ্কে ছিলো ভুল, ফল দাঁড়ালো বিয়োগের।

তবু আমরা সমর্থন করতে পারি না এই হত্যাকাণ্ডকে। সংঘাতের সঙ্গে সহিংসের সঙ্ঘাত তো এ নয়। মানবাত্মার জয়ঘোষণাকারী শাস্ত-সমাহিত সরলবিশ্বাসী নিরস্ত্রকে অসতর্ক অবসরে হত্যা করায় নেই কোনো পৌরুষ, নেই বীরত্ব। মানুষ তো কেবল অন্ধ প্রকৃতি-পরবশ জীব নয়; তার মধ্যে রয়েছে আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষ। তাকে যে জানলো না সেই 'আত্মভ্রষ্ট হতজ্ঞান' মানুষকে আমরা করি করুণা। কোনো নীতিতেই করতে পারি না তার কাজের সমর্থন। সমর্থন-অসমর্থনের কথা যেখানে, সেখানে আসবেই নীতিশাস্ত্রের কথা। আর নীতিশাস্ত্র যে কোনোকালে করবে না নাথুরামের কাজের সমর্থন, এ কথা বলাই বাহুল্য।

কিন্তু যা বলছিলাম।

গড্‌সে এইদিনে আমাদের অবাক করেছেন। অবাক করেছেন সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। তাঁর বক্তব্য এই যে, সংবাদ-পত্রের বিবরণীতে রয়েছে তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদের বর্ণনা, পুলিশ হেপাজতে তাঁরা যে-ব্যবহার পেয়েছেন নেই সে-কথার কোনো উল্লেখ।

তিনি বললেন, "অবশ্যি অভিযোগের মনোবৃত্তি নিয়ে এ-কথা আমি বলছি না, কারণ তাঁদের কাছ থেকে এর চেয়ে ভালো কিছু আমি আশা করিনি।"

ঐ-কথা তিনি বলতে পারেন। বিচার আরম্ভের আগে তিনদিন ধরে পুলিশ সময়মতো দেয় নি তাঁদের জল, দেয় নি তাঁদের প্রাপ্য বস্তু। কিন্তু নির্দোষ সাংবাদিকের উপর ক্রোধ কেন? তাঁরা লিখতে জানেন, দেখতে জানেন, শুনতে জানেন, কিন্তু অদৃশ্যকে তো গুণতে জানেন না।

তাঁকে উচ্চশ্রেণীর বন্দী হিসাবে গণ্য করবার জন্যে গড্‌সে আদালতে একটি আবেদনপত্র দেবার অনুমতিও প্রার্থনা করলেন।

আদালত তখন জিজ্ঞাসা করলেন, "এ আবেদন কি শুধু আপনার জন্যেই, না সকলের জন্যে?"

উত্তরে গড্‌সে জানালেন যে, এ তাঁর নিজস্ব আবেদন। তবে আর-সকলেও আলাদা আলাদা এই মর্মে আবেদন জানাবেন। এর পর একমাত্র বাদগে ব্যতীত সবাই উচ্চশ্রেণীভুক্ত আসামী হবার জন্যে আবেদনপত্র দাখিল করলেন। শ্রীযুত সাভারকর আগে থেকেই পরিগণিত হচ্ছিলেন "এ" শ্রেণীভুক্ত আসামীরূপে।

সরকারপক্ষের কৌসুলি শ্রীযুত পেতিগারা বললেন, "আসামীদের উচ্চশ্রেণীভুক্ত করতে আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে জেলের মধ্যে তাঁদের পরস্পরের মেলামেশার সুযোগ যাতে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা আমার কর্তব্য। এঁরা এখন কোন শ্রেণীর আসামী হিসাবে রয়েছেন, আমি জানি না। কি বিশেষ ব্যবহার তাঁরা আশা

করেন, তাও জানিনা। তবে তাঁদের খাদ্যের বিষয়ে এটুকু বলতে পারি যে, তাঁদের ভালো খাদ্য পাবার ব্যাপারে আমার কোনো আপত্তি নেই। এমন কি, সে-খাদ্য বাইরে থেকে এলেও না। কিন্তু বাইরের পক্কান্ন গ্রহণের অনুমতি দেওয়া যেতে পারে না তাঁদের।"

তিনি আরো আপত্তি জানালেন এই বলে যে, আসামীদের কেউ নিজে ক্ষৌরকর্ম্ম করতে পাবেন না। তিনি বললেন, "আমি কোনো মন্তব্য করতে চাইনে, উপদেশও দিতে চাইনে। আমি যা বলতে চাইছি, ধর্ম্মাবতারের তা অজ্ঞাত নেই।" তিনি আরো বললেন যে, এ-সম্পর্কে আসামীগণ কারাগারের ক্ষৌরকারের সাহায্য পেতে পারেন স্বচ্ছন্দেই।

আদালত এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিলেন যে, আসামীদের জন্যে বাইরে থেকে অপক্ক খাদ্যদ্রব্য আসতে পারে, তবে পক্কান্ন নয়। তাঁদের উচ্চশ্রেণীর বন্দী হিসাবে গণ্য করবার জন্যে জেল-কর্ত্তৃপক্ষকে যথা-যোগ্য আদেশ দান করবেন, এ-কথাও জানালেন।

আপ্তে মাঝখান থেকে বললেন যে, গ্রেপ্তার হবার সময় পুলিশ তাঁদের কাছ থেকে যে-সব জিনিষ আর টাকাকড়ি হস্তগত করেছিলেন তা তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হোক। গড্‌সেও জানালেন অনুরূপ অনুরোধ।

এ সম্পর্কে আদালত লিখিত-আবেদন করতে বললেন আসামীদের। তাঁদের আশ্বাস দিলেন, পরে তা উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

তৃতীয় দিনের অধিবেশনের গোড়ার দিকে আদালত জানতে চান, শ্রীযুত ভোপৎকারের কিছু বক্তব্য আছে কি না। উত্তরে তিনি জানালেন যে, আসামীপক্ষের কৌঁসুলিরা যাতে কারাগারেই আসামীদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতে পারেন সেই মর্মে প্রয়োজনীয় আদেশ দেওয়া হোক। বর্ত্তমানে তাঁরা আসামীদের সঙ্গে দেখা করতে পান শুধু বেলা ন'টা থেকে এগারোটা, আর অপরাহ্ণ তিনটা থেকে পাঁচটার ভেতর। কিন্তু মামলার দিনে তা-ও আর হয়ে উঠে না। কারণ, ঐ সময়ের মধ্যে চলে আদালতের অধিবেশন।

কারাগার-কর্ত্তৃপক্ষ এবং কৌঁসুলিদের সুবিধামতো সময়ে যাতে কৌঁসুলিগণ আসামীদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন, আদালত সে-সম্পর্কে নির্দ্দেশ দেবেন বলে জানিয়ে দেন।

তারপর সমস্যা দেখা দেয় আদালতের সময় নিয়ে। আদালতের কাজ কি চলবে সকাল দশটা থেকে বিকেলে চারটা অবধি, না ভোর সাড়ে সাতটা থেকে দুপুর একটা পর্য্যন্ত?

এ সম্পর্কে শ্রীযুত পেত্তিগারা বলেন যে, মারাঠিগণ সাধারণত খুব ভোরের দিকেই আহার্য্য গ্রহণে অভ্যস্ত। সরকারি সাক্ষীদের অনেকেই মারাঠি। অতএব সকালে আদালত বসলে তাঁদের অসুবিধা হওয়াই স্বাভাবিক। অবশ্যি সকাল সাড়ে আটটায় আদালতের কাজ সুরু হলে তাঁর কোনো আপত্তি নেই।

ওদিকে শ্রীযুত ভোপৎকারের মত এই যে, বর্ত্তমানে যখন ৪-৪৫ মিনিটে সূর্য্যোদয় হয় সে-ক্ষেত্রে সকাল সাড়ে সাতটায় আদালত বসলে ক্ষতি কি? আসামীদেরো অনেকেই মারাঠি। এই সময়ের মধ্যে তাঁরা আহার সেরে নেবার যথেষ্ট সময় পাবেন।

আদালত স্থির করেন, আগামী দিন বেলা দশটার সময়েই আদালতের কাজ আরম্ভ হবে। পরে যদি গ্রীষ্মের আধিক্য দেখা যায় তবে উভয় পক্ষের সুবিধা অনুযায়ী স্থিরীকৃত হবে নতুন সময়।

কোন ভাষায় মামলা পরিচালিত হবে এবং শুনানি লিপিবদ্ধ হবে, তা নিয়েও আলোচনা হলো কিছুকাল। শেষ পর্য্যন্ত স্থির হলো, শুনানির প্রতিটি কথা নয়, শুধু সাক্ষ্যের সারমর্ম্মই লিখিত হবে ইংরেজিতে ; যে-আসামী তা বুঝতে না পারবেন তাঁকে শুনিয়ে দেওয়া হবে তার অনুবাদ।

এই প্রসঙ্গে সরকারি কৌসুলি আদালতকে জানালেন ভাষা সম্পর্কিত অপর একটি সমস্যার কথা। আসামীদের দু'জন জানেন শুধু মারাঠি, একজন বুঝতে পারেন কেবল তেলেগু। অতএব তিনি প্রস্তাব করলেন, মারাঠি ও তেলেগু ভাষার জন্যে দু'জন দোভাষী পাঠাতে অনুরোধ করা হোক বোম্বাইয়ের চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটকে।

পেশোয়ার-আগত একজন নতুন কৌসুলি আদালতে উপস্থিত ছিলেন এইদিন—আপ্তে, করকারে ও গোপাল গড্‌সের পক্ষ সমর্থন করবার জন্যে। এঁর নাম শ্রীযুত জি. কে. দুয়া।

এই দিনেও প্রারম্ভিক আলোচনা সমাপ্ত হলো না। ঠিক হলো, তার জন্যে আবার আদালত বসবে ১৪ই জুন। নিয়মিত শুনানি সুরু হবে ২১শে জুন থেকে।

শেষ তারিখটির জন্যে আপত্তি জানালেন সরকারপক্ষের কৌসুলি। বললেন. ২১শে তারিখে ভারতের বর্ত্তমান রাষ্ট্রপাল লর্ড মাউন্টব্যাটেন কার্য্যভার ত্যাগ করবেন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন শ্রীরাজাগোপালাচারী—

বর্ত্তমানে বাঙলার প্রদেশপাল। এই দুই পালের সম্মানার্থে পালিত হবে বিশেষ উৎসব। সে-উৎসবে ব্যস্ত থাকতে হবে পুলিশদের। তাতে অসুবিধে হবে আদালতের কার্য্যপরিচালনার।

বিষয়টি গুরুতর বটে। অতএব ২১শের পরিবর্ত্তে দিনস্থির করা হলো ২২শে।

১৬ই জুন আবার আদালত বসলো।

এই দিনের অধিবেশনের স্থায়িত্ব ছিলো মাত্র আধ ঘণ্টা। এই স্বল্পকালের মধ্যে অল্প কাজ হলেও বিচারের যাবতীয় প্রাথমিক কার্য্য এই দিনেই হলো সমাপ্ত। এর পর থেকে চলবে নিয়মিত শুনানি।

সপ্তাহে আদালতের কাজ ক'দিন চলবে, এ-বিষয়টি এদিনকার আলোচনার অন্যতম। শ্রীযুত ভোপৎকার চেয়েছিলেন, সোম থেকে শুক্রবার অবধি পাঁচদিন চলুক আদালতের কাজ। শ্রীযুত দফ্তরিও ছিলেন তাঁর সঙ্গে একমত। কিন্তু বিচারপতি রায় দিলেন, তা হবে না। দিল্লীতে দায়রা আদালতের কাজ চলে সপ্তাহে ছ'দিন। এই নিয়মকেই মেনে চলবেন তিনি। তবে হাঁ, ছ'টি অধিবেশনের পর কাজের গতি বুঝে এ-বিষয়ে বিবেচনা করবেন তিনি।

এইদিনে ফরিয়াদী পক্ষের সাক্ষ্যের সারমর্ম্মের সাইক্লোস্টাইল প্রতি-লিপি দেওয়া হয় আসামীদের হাতে।

আর-একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ, দু'জন নতুন কৌসুলি উপস্থিত ছিলেন আজ আদালতে। শোনা গেলো, একজন সমর্থন করবেন নাথুরাম গড্‌সেকে, অপরজন গোপাল গড্‌সেকে। প্রথমজনের নাম শ্রীযুত ভি. ভি. ওক, দ্বিতীয়জনের শ্রীযুত মোহনলাল মনিয়ার।

ছয়

মামলার উদ্বোধন

বাজনার আগে যেমন সুর বাঁধা, শুনানির আগেও হলো তেমনি প্রাথমিক কার্য্য সমাধা। এইবার সুরু হবে আলাপ; পরে গৎ, সঙ্গে সঙ্গত,—প্রথমে ঢিমে, ক্রমে দ্রুত হতে দ্রুততর লয়ে আস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগে সঞ্চারিত হয়ে সমাপ্ত হবে সমে।

কিংবা এ-ও বলা যায়, নান্দী শেষ হলো, পূর্ব্বরঙ্গ শেষ হলো, এইবার সুরু হবে আসল নাটক। দৃশ্যে-দৃশ্যে উদ্‌ঘাটিত হবে নব-নব বিস্ময়, অঙ্কে-অঙ্কে গড়ে উঠবে ক্লাইমেক্‌স্‌, শেষে চরম উত্তেজনার মাঝে পড়বে পরিণতির যবনিকা। কিন্তু তার এখনো অনেক দেরি।

দৃশ্যের প্রারম্ভেই দেখলাম সরকারপক্ষের কৌসুলি শ্রীযুত সি. কে. দফ্‌তরি মামলার উদ্বোধন করছেন এই বলে—

কিন্তু তার আগে আসামীদের গায়ে নম্বরের দাগ দিয়ে দিই পাঠকপাঠিকার সুবিধার জন্যে। (১) নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে, (২) নারায়ণ আপ্তে, (৩) বিষ্ণু করকারে, (৪) মদনলাল পাওয়া, (৫)

শঙ্কর কিস্তায়া, (৬) গোপাল গড্‌সে, (৭) বিনায়ক দামোদর সাভারকর, (৮) দত্তাত্রেয় পারচুরে। অবশিষ্ট একজন,—কিন্তু তাঁর কথা এখন থাক।

শ্রীযুত দফ্‌তরি আরম্ভ করলেন এই বলে :—

"বর্ত্তমান সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার অপরাধই এই মামলার মূল অভিযোগ। মহাত্মার হত্যাকারী প্রথম আসামী নাথুরাম গড্‌সে মামলার প্রধান আসামী। আপনারা সবাই জানেন, আসামীরাও জানেন যে, মহাত্মা গান্ধী শুধু জাতির অমূল্য সম্পদই ছিলেন না, আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতিও ছিলো তাঁর। অহিংসা ও বিশ্বমৈত্রীই ছিলো তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র. ঐ মন্ত্রের সাধনায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন তিনি। যার জন্যে আত্মনিয়োগ তার জন্যেই আত্মবলি,—একদিক থেকে গান্ধীজীর উপযুক্ত কাজ বলেই মেনে নেওয়া যায়। অহিংসা ও সৌভ্রাত্রের নীতি সমর্থনেই তিনি করেছিলেন জীবনপণ, আর তারই জন্যেই করলেন মৃত্যুবরণ।

"অপরাধ যখন করা হয়, কোন উদ্দেশ্য নিয়ে তা করা হয়েছে সেটা সাধারণত পরীক্ষা করে দেখা হয় না। কিন্তু এই মামলায় হত্যার উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ। কারণ প্রথম আসামীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে আরো সাতজনের ষড়যন্ত্র, আর তার জন্যেই ঘটেছে এই মর্ম্মন্তুদ হত্যাকাণ্ড।

"প্রকৃতপক্ষে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় ৩০শে জানুয়ারি তারিখে। কিন্তু সেদিনকার আক্রমণই প্রথম আক্রমণ নয়। 'আক্রমণ' শব্দটি আমি আইনগত খুঁটিনাটির দিক থেকে বিচার না করেই ব্যবহার

করছি। ঘটনার দশদিন আগে, ২০শে জানুয়ারি, সপ্তম আসামী শ্রীযুত সাভারকর ও অষ্টম আসামী ডাঃ পারচুরে ছাড়া আর সব ক'জন আসামীই একসঙ্গে ছিলেন দিল্লীতে। বিড়লা ভবনে যেখানে বসতো গান্ধীজীর সান্ধ্যপ্রার্থনার আসর, চতুর্থ আসামী মদনলাল ঐদিনেই সেখানে করেন বোমাবিস্ফোরণ। মহাত্মা গান্ধী সাধারণত তাঁর কক্ষ থেকে বাগানের প্রান্তভাগে প্রার্থনাসভায় যেতেন বিকেল প্রায় পাঁচটার সময়। মাঝে মাঝে বিপুল জনসমাগম হতো সভায়, মাঝে মাঝে হ্রাস পেতো তার সংখ্যা। এসব কথা জনসাধারণ জানতো ভালোরকমেই।

"২০শে জানুয়ারি চতুর্থ আসামী মদনলালের হাতে বোমাবিস্ফোরণ ঘটলো। ঠিক ঐ সময়ে সপ্তম ও অষ্টম আসামী ছাড়া আর সব আসামীই উপস্থিত ছিলেন সেখানে। এই ব্যাপারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই ঘটনার তিন দিন আগে আসামীরা উপস্থিত হয়েছিলেন দিল্লীতে, বাস করেছিলেন একসঙ্গে, বোমাবিস্ফোরণকালে সশরীরে উপস্থিত ছিলেন ঘটনাক্ষেত্রে, তাঁদের সকলের কাছেই ছিলো হাতবোমা আর রিভলবার,—এসব যদি প্রমাণিত হয় তা হলেই স্পষ্টীকৃত হবে আসামীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাঁরা কেবল দৈব-চক্রেই দিল্লীতে উপস্থিত হন নি, তার পেছনে ছিলো একটি সুগঠিত চক্রান্তের পরিকল্পনা।

"চতুর্থ আসামী বোমাবিস্ফোরণের কথা স্বীকার করেছেন (শ্রীমদনলালের এই স্বীকৃতির কথা পরে বলছি।—লেখক)। তবে তিনি এইমাত্র যা বলেছেন, আমরা প্রমাণ করবো,—তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। শুধু তাই নয়, আরো প্রমাণ করবো,—গান্ধী-হত্যা যে ঐদিনই সংঘটিত হবে, পূর্ব্ব থেকেই ছিলো তার ইচ্ছাকৃত পরিকল্পনা।

গান্ধী-হত্যার কাহিনী

"কিন্তু কেন-যে পূর্ব্বপরিকল্পনা অনুযায়ী ঐদিনই হত্যাকাণ্ড ঘটে নি, তার বিশদ বর্ণনা এখানে দেবো না। ঐ তারিখেই মদনলালকে গ্রেপ্তার করা হয়, অন্যান্য আসামী যান পালিয়ে। তারপর প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসামী আবার মিলিত হন বোম্বাইয়ে। পরে ৩০শে জানুয়ারি আবার আসেন দিল্লীতে। প্রথম আসামী গান্ধীজীকে হত্যা করেছিলেন সত্য, কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসামীও যে হত্যার সময় বিড়লা ভবনে, কি তার আশেপাশেই কোথাও উপস্থিত ছিলেন, এ কথাও হবে প্রমাণিত। ব্যাপারটি অকারণ নয়, ষড়যন্ত্রের অঙ্গমাত্র।

"১৯৪৪ সালের মধ্যভাগ থেকে প্রথম আসামী, মারাঠি দৈনিক "অগ্রণী"র সম্পাদকতা সুরু করেন। পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো পুণা থেকে। দ্বিতীয় আসামী ছিলেন তার ম্যানেজার। তাঁরা দু'জনেই ছিলেন পত্রিকার স্বত্বাধিকারী। ঐ কাগজে প্রকাশিত মতামতের অংশবিশেষ উল্লেখ করে আমি পরে দেখবো যে, তাঁদের মত ছিলো গান্ধীজী-অবলম্বিত অহিংসা ও সৌভ্রাত্র-নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত। আর ঐ মতবাদের মধ্যেই নিহিত রয়েছে হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠানের হেতুবা উদ্দেশ্য।

"এ কথা বিদিত যে ১৫ই আগস্টের পূর্ব্ববর্ত্তী কাল ছিলো সঙ্কটকাল। ঐ সময়েই দেশ হয়েছিলো দ্বিধাবিভক্ত। পরবর্ত্তীকালে এলো আরো দুঃসময়, দু'টি প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তপাতের ভেতর আরম্ভ হলো নিদারুণ আত্মঘাতী কলহ। ঐ সময়ে মহাত্মা গান্ধী প্রচার করতে সুরু করেন যে, ভারতীয় ডোমিনিয়নে প্রতিশোধগ্রহণস্পৃহা ও পাল্টা

আক্রমণের কারণ থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের সঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে হবে। ১৯৪৬ সালের গোড়াতেই পূর্ব্ববঙ্গে আরম্ভ হয় সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা। তারপর তা ছড়িয়ে পড়ে বিহারে, পরে পাঞ্জাবে এবং আরো অন্যান্য জায়গায়। সর্ব্বত্রই গান্ধীজী প্রচার করতে থাকেন তাঁর ঐ এক আদর্শ,—মুসলমানদের সঙ্গে সদ্ভাব রক্ষাই হলো হিন্দুদের পক্ষে পরম শান্তিলাভের উপায়, আর ভারতীয় ডোমিনিয়নের হিন্দুদেরই বিশেষ করে সেই নীতির অনুসরণ করা উচিত। ঐ সময়ে নোয়াখালি যাত্রার সঙ্কল্প করেন তিনি।

"এবার আমি প্রথম আসামীর কথা বলবো। তাঁর সম্পাদিত পত্রিকার মতবাদ থেকে বেশ বোঝা যায় যে, গান্ধীজীর মতবাদের সঙ্গে রয়েছে তার ঘোরতর তিক্ত বিরোধ। আসামী হিংসার পক্ষপাতী, প্রতিশোধস্পৃহা,—এক কথায় গান্ধীজী-প্রচারিত নীতির যা কিছু বিপক্ষে,—তিনি তারই দলে। আসামীর মনে এই বিদ্বেষ ও বিতৃষ্ণা পরিণামে এমনি উৎকট হয়ে উঠে যে, তিনি হারিয়ে ফেলেন তাঁর মানসিক স্থৈর্য্য। নিতান্ত মূর্খের মতো এই সিদ্ধান্ত তিনি করেন, যে-মতবাদকে তিনি সত্য বলে স্থির করেছেন, শুধু অহিংসার বাণী-প্রচারককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে পারলেই সম্ভব সেই সত্যের প্রতিষ্ঠা। মানসিক বিকৃতি না ঘটলে আসামী বুঝতে পারতেন যে, কাউকে,—বিশেষ করে গান্ধীজীর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন লোকোত্তর মানবকে, —হত্যা করলেই হত্যা করা যায় না তাঁর আদর্শকে। তা ছাড়া আসামীর মনে নিঃসন্দেহে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিলো যে, গান্ধীজীকে হত্যা করলে তাঁর নিজস্ব প্রতিশোধগ্রহণের মতবাদ তিনি প্রচার করতে পারবেন জনসাধারণের কাছে।

"আমাদের মতে কিন্তু গান্ধীজীর হত্যার জন্যে নাথুরামই একা দায়ী নন। তাঁর ও তৃতীয় আসামী করকারের মধ্যে বহুকালের সম্পর্ক বর্তমান। অনেকদিন থেকেই দু'জনে দু'জনকে জানতেন। দু'জনই যে হত্যাকাণ্ডে সংশ্লিষ্ট তার কারণ অত্যন্ত পরিষ্কার।

"চতুর্থ আসামী মদনলাল, পাঞ্জাবের আশ্রয়প্রার্থী। উত্তেজনাপ্রবণ বেপরোয়া তাঁর স্বভাব; দুঃসাহসিক কর্মেই তাঁর প্রবৃত্তি। আসামী করকারের সঙ্গে আমেদনগরে হয় তাঁর প্রথম পরিচয়। তাঁর বেপরোয়া স্বভাবের কথা বিদিত হন অনেকেই। তাই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসামী তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে নিয়োগ করেন ঐ বেপরোয়া লোকটিকেই।

"পঞ্চম আসামী শঙ্কর, বাদগের ভৃত্য। পুণায় বাদগের একটি অস্ত্র বিক্রয়ের দোকান আছে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসামীর প্রয়োজন ছিলো অস্ত্রের। বাদগে সক্ষম ছিলেম অস্ত্র আর গুলীবারুদ সরবরাহে। এই সূত্রে সূত্রপাত হলো তাঁদের আলাপের। বাদগে তাঁদের বহু অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিলেন। ২০শে জানুয়ারির অব্যবহিত পূর্বে হত্যাকাণ্ডে যোগ দিতে প্ররোচিত হন তিনি, এবং যোগদানও করেন।

"শঙ্কর তাঁর প্রভুর অনুসরণ করেছিলেন জেনেশুনেই। অতএব দিল্লী আসবার কারণ যে তাঁর অজানা, এমন প্রশ্নই উঠতে পারে না। ২০শে জানুয়ারির বোমাবিস্ফোরণকালে প্রার্থনা সভায় তিনিও সশস্ত্র হয়ে উপস্থিত ছিলেন।

"গোপাল গড্‌সে প্রধান আসামীর ভ্রাতা। তিনি কিরকির একটি সরকারি আপিসের কর্মচারী। অন্যান্যের সঙ্গে দিল্লী আসবার আগে

মিথ্যা অজুহাতে তিনি ছুটি নেন। পূর্বেই বলেছি, তাঁদের সকলের সঙ্গেই ছিলো নানারকম অস্ত্র আর বিস্ফোরক দ্রব্য।

"অষ্টতম আসামী পারচুরে নিজেকে দাবী করেছেন গোয়ালিয়রের বাসিন্দা বলে। সমর্থন যোগ্য নয় তাঁর এই দাবী। ২০শে ও ৩০শে জানুয়ারির মধ্যবর্তীকালে যখন প্রথম ও দ্বিতীয় আসামী গোয়ালিয়রে যান, ডাঃ পারচুরে তখন একটি পিস্তল সংগ্রহ করেন। গান্ধীজীকে হত্যা করা হয় ঐ পিস্তলের সাহায্যেই। প্রথম ও দ্বিতীয় আসামী তাঁর কাছ থেকে ঐ পিস্তলটি গ্রহণ করেন। পরে একসঙ্গে দিল্লীতে এসে ৩০শে জানুয়ারি হত্যা করেন গান্ধীজীকে।

"আসামী শ্রীযুত সাভারকরের নাম সুপরিচিত। তিনি এক বিশেষ মতবাদের প্রচারক। বহুকাল ধরে তিনি ছিলেন হিন্দু মহাসভার সভাপতি। এ-ও সুবিদিত যে, অহিংসা বা মুস্লিম সমাজের অনুকূল কোনো কিছুর পক্ষপাতী নন তিনি।

"সাভারকর বাস করেন বোম্বাই সহরের 'দাদারে'। প্রথম ও দ্বিতীয় আসামীর সঙ্গে তাঁর ছিলো ঘনিষ্ঠ যোগ। বোধ করি বললে অত্যুক্তি হবে না, তাঁরা তাঁকে দেখতেন গুরুর মতো। তাঁর আশীর্বাদ নিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিলো ঐ দু'জনের পরিচালিত পত্রিকা। তিনি অর্থ-সাহায্যও করেছিলেন তাঁদের। সাভারকর যে তাঁদের কতো শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন তার একটি প্রমাণ এই যে, তাঁদের সংবাদপত্রের প্রতি সংখ্যার প্রথম পৃষ্ঠাতেই মুদ্রিত থাকতো শ্রীযুত সাভারকরের প্রতিকৃতি।

"এমন প্রমাণ রয়েছে যাতে বোঝা যায়, প্রথম ও দ্বিতীয় আসামী সাভারকরের সঙ্গে প্রায়শই দেখা-সাক্ষাৎ করতেন। এমন কি ২০শে

জানুয়ারির অব্যবহিত পূর্ব্বেও তাঁরা সাভারকরের সঙ্গে দেখা করে-ছিলেন। কি ঘটবে, শুধু তাই যে তিনি জানতেন এমন নয়, তাঁর সম্মতি না থাকলে এই হত্যাকাণ্ড ঘটতে পারতো না,—এ বিষয়েও যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

"এবার আমি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসামীর প্রত্যেকের পরিচয় এবং ১০ই থেকে ৩০শে অবধি তাঁদের কার্য্যকলাপের বিবৃতি দেবো একটি।

"প্রথম আসামীর কথাই বলবো প্রথমে। ১৯৩৮ সালে হায়দ্রাবাদে "সত্যাগ্রহ" আন্দোলন হয়েছিলো। তার উদ্দেশ্য ছিলো, সেখানে লোকায়ত্ত সরকারের প্রতিষ্ঠাকল্পে হায়দ্রাবাদের শাসনকর্ত্তার কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি আদায় করা। বৃটিশ ভারত হতে বহু স্বেচ্ছাসেবক যোগ দিয়েছিলেন ঐ আন্দোলনে। প্রথম আসামীও যোগ দেন ঐ আন্দোলনে। ফলে ভোগ করেন কিছুকাল কারাদণ্ড। অতঃপর তিনি কাজ আরম্ভ করেন "রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘে"। সেই সঙ্ঘটি তখন উগ্রপন্থী ছিলো না, তবে রাজনীতির সঙ্গে তার কিছুটা সম্পর্ক ছিলো। কিছুকাল পরে তিনি যোগদান করেন "হিন্দু রাষ্ট্র দল" নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠনের কাজে। এই দলটির মতবাদ ছিলো 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘে'রই অনুরূপ। তবে তার আদর্শ ছিলো উগ্রতর। লক্ষ্য ছিলো, হিন্দু ধর্ম্মকে আরো শক্তিশালী করে তোলা, এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা। ব্যায়াম, ক্লাব-সংগঠন ও অন্যান্য অনুরূপ কার্য্য ছিলো এই প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মসূচীর অঙ্গ। প্রথম ও দ্বিতীয় আসামী পরে স্থির করেছিলেন যে, এই দলকে সর্ব্বসাধারণের নিকট

পরিচিত করতে হলে প্রচারকল্পে আরো কিছু করা দরকার।

"আন্দোলনের প্রচারকার্য্যের জন্তে কোনো পত্রিকা ছিলো না তখন। এই সময়েই, "অগ্রণী" প্রকাশ করা হবে, স্থির হয়; এবং ১৯৪৪ সালের ২৫শে মে প্রকাশিত হয় প্রথম সংখ্যা 'অগ্রণী'। সাভারকর পত্রিকার জন্তে ১৫,০০০৲ টাকা দান করেন। প্রকাশ, এই বৎসরেই একটি প্রার্থনা সভায় গান্ধীজী মন্তব্য করেন যে, মুস্লিম রাষ্ট্র গঠনের বিরোধী নন তিনি। তারপর এমন কতকগুলো আন্দোলন হয় যার ফলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্বেষ ক্রমশই বেড়ে উঠে। আপনার হয়তো স্মরণ আছে যে, এই সময়ে একটি অন্তর্বর্ত্তী সরকার গঠনের পরিকল্পনাও হয়েছিলো। বহু রাজনৈতিক নেতা, বিশেষত হিন্দু মহাসভা, তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন তার।

"১৯৪৬ সালে দাঙ্গা স্বরু হলো পূর্ব্ববঙ্গে। জনাব সুরাবর্দ্দী তখন বাঙলার প্রধান মন্ত্রী। দাঙ্গার জন্তে, সম্পূর্ণ না হোক, অংশত তাঁকেই দায়ী করা হয়েছিলো। তারপর আরম্ভ হলো গান্ধীজীর নোয়াখালি সফর। আসামী করকারেও সেখানে গিয়েছিলেন। অভিপ্রায়,—সম্ভবত অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ। সকলেই জানেন যে, গান্ধীজীর নোয়াখালি যাত্রার উদ্দেশ্য ছিলো, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রীতির প্রতিষ্ঠা। আমি আগেই বলেছি যে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসামীর মতাবলম্বীদের কাছে এরূপ প্রয়াস মনঃপূত হতে পারে না। আসামী শঙ্কর কিস্তায়ার কথা মনে করেই বলছি এ কথা। তাঁর কোনো রাজনৈতিক মতবাদ আছে বলে আমি মনে করিনা। অষ্টম আসামী কিন্তু গান্ধীজীর নীতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন।

"অবশেষে গান্ধীজী করলেন অনশন। তাঁর সঙ্কল্প ছিলো উভয় সম্প্রদায়ের ঐক্য প্রতিষ্ঠা; এবং বিশেষত অমুসলমানেরা যাতে মুসলমানদের উপর কোনোরূপ অত্যাচার না করে, সেই মনোভাবকে জাগ্রত করা। প্রথম আসামীর প্রসঙ্গেই বললাম এ কথা। কারণ, আসামীর পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি প্রবন্ধের উল্লেখ করতে ইচ্ছা করি আমি। ঐ-সব প্রবন্ধে গান্ধীজীকে গালাগালি দিয়ে তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে তাঁর মতবাদের।

"দ্বিতীয় আসামী ছিলেন আমেদনগরের একজন শিক্ষক। ১৯৪২ সালে 'রাষ্ট্র দল' সংগঠনে প্রথম আসামীর সঙ্গে যোগ দেন তিনি। ১৯৪৩ সালে কিছুদিনের জন্তে তিনি সৈন্যবাহিনীতে ছিলেন। ১৯৪৪ সালে 'অগ্রণী' প্রকাশের কার্য্যে তিনি প্রথম-আসামীর সঙ্গে যোগদান করেন। একটি বোমাবিস্ফোরণ সম্পর্কে ১৯৪৭ সালে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং অল্পকাল পরেই মুক্তিলাভ করেন।

"তৃতীয় আমাসী করকারে ছিলেন 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘে'র সদস্য। ১৯৩৮-৩৯ সালে তিনি হায়দ্রাবাদ সত্যাগ্রহে যোগদান করেন। হিন্দু মহাসভার সভ্য হন ১৯৪১ সালে। 'রাষ্ট্রদল' সম্পর্কে তিনি দ্বিতীয় ও প্রথম আসামীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন। ব্যবস্থা পরিষদের নির্ব্বাচনে শ্রীযুত যমুনাদাস মেটা নামক এক ব্যক্তিকে সাহায্য করেন। ১৯৪৬ সালের নভেম্বর মাসে তিনি নোয়াখালি যাত্রা করেন। সেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় আসামীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় নিবিড়তর হয়। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের দিকে তিনি অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য সংগ্রহ করতে সুরু করেন; এবং প্রথম ও দ্বিতীয় আসামীর

সঙ্গে যোগদান করেন ষড়যন্ত্রে। অবশ্য এতে আমি বলতে চাইছি না যে, প্রথম ও দ্বিতীয় আসামী প্রথমে ষড়যন্ত্র আরম্ভ করেন, আর তৃতীয় আসামী এসে পরে তাঁদের সঙ্গে যোগ দেন। আমার বক্তব্য এই যে, উক্ত তিনজন আসামীই প্রথম থেকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। একজন ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা করেছিলেন, এবং আর-একজন পরে তাতে যোগ দিয়েছিলেন কি না, সে-কথা আমার পক্ষে নিশ্চয় করে বলা সম্ভবপর নয়।

"১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে চতুর্থ আসামী মদনলালের সঙ্গে তৃতীয় আসামীর দেখা হয় আমেদনগরে। তৃতীয় আসামী মদনলালকে একটি ক্ষুদ্র ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে সাহায্য করেন। তৃতীয় আসামীর রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ এমনি ছিলো যে, চতুর্থ আসামী সর্ব্বোতভাবে তাঁকে সাহায্য করবেন বলে স্থির করেন।

"চতুর্থ আসামী মদনলাল ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসের দিকে বোম্বাইয়ে আসেন। সেখানে অধ্যাপক জৈন নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাঁর। অধ্যাপক জৈন পুস্তক প্রকাশের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করবার জন্যে অনুরোধ করেন আসামীকে। কিছুকাল বোম্বাইয়ে থেকে আমেদনগরে চলে যান মদনলাল। অধ্যাপক জৈনের সঙ্গে আবার তিনি সাক্ষাৎ করেন ডিসেম্বর মাসে। জানুয়ারি মাসের গোড়ার দিকে প্রথম ও দ্বিতীয় আসামীর সঙ্গে আমেদনগরে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। আশ্রয়প্রার্থীদের দু'একটি শোভাযাত্রা পরিচালিত করেন তিনি। ৫ই জানুয়ারি তারিখে আমেদনগরে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় তিনি এক উৎকট কাণ্ড করে বসেন। মঞ্চে উঠে বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করে-

ছিলেন তিনি। আর তাঁর সেই প্রয়াসের জন্তে শেষ পর্যন্ত সভার কাজ পণ্ড হয়ে যায়। সভার আলোচ্য বিষয় কি ছিলো, তা নিয়ে কোনো কথাই এখন আমি বলছি না। তবে এ কথা স্পষ্ট যে, যাঁরা ঐ সভার আয়োজন করেছিলেন তাঁরা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসামীর মতবাদ সমর্থন করতেন না।

"চতুর্থ আসামী ১০ই জানুয়ারি বোম্বাইয়ে আসেন। বারো তারিখে সাক্ষাৎ করেন অধ্যাপক জৈনের সঙ্গে। যে-উদ্দেশ্তে তিনি দিল্লী যাত্রার উদ্যোগ করেছিলেন, অধ্যাপক জৈনকে কিছু আভাষ দান করেন তার। অধ্যাপক জৈন তাঁর কথার কোনো গুরুত্ব আছে বলে মনে করেন নি। তা ছাড়া ও-রকম কাজ করতে তিনি তাঁকে বারণও করেছিলেন। তার পরেই মদনলাল যাত্রা করেন দিল্লীর দিকে।

"সপ্তম আসামী একজন ডাক্তার। কিছুদিন তিনি বাস করেছিলেন গোয়ালিয়রে। হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যোগ ছিলো তাঁর। তিনি ছিলেন এক ধরণের জননেতা, আর গড্‌সের সঙ্গে পরিচয় ছিলো তাঁর। আসামী আপ্তে ও আসামী গড্‌সে তাঁর কাছে গিয়ে যখন হত্যানুষ্ঠানের জন্যে অস্ত্র চেয়েছিলেন তিনি তখন অস্ত্র সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন তাঁদের; কিন্তু নিজের অস্ত্রটি তিনি হাতছাড়া করেন নি।

"এবার শ্রীযুক্ত সাভারকরের প্রসঙ্গে আসা যাক। পূর্বেই বলেছি, খ্যাতনামা লোক তিনি। তিনি ছিলেন হিন্দু মহাসভার সভাপতি এবং একজন রাজনৈতিক নেতা। বিশেষ বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে তিনি যে-সব মতামত ব্যক্ত করতেন, কিছু লোক করতো তার সমর্থন, আর অনেক লোকই তা পাঠ করতো আগ্রহের সঙ্গে। "হিন্দু রাষ্ট্রদল"

প্রতিষ্ঠায় ছিলো তাঁর আশীর্ব্বাদ। তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীপ্রসূত পুস্তকাবলী একশ্রেণীর বিশেষ মতবাদীদের পাঠ্যগ্রন্থের মতো ছিল। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসামী ছিলেন ঐ-সব পুস্তকের প্রকাশক। একাধিকবার তিনি বোম্বাইয়ের বাইরে গিয়েছেন এবং প্রত্যেক বারই তাঁর সঙ্গে যেতেন এবং সঙ্গেই থাকতেন প্রথম ও দ্বিতীয় আসামী। ৪ঠা জানুয়ারি প্রথম ও দ্বিতীয় আসামী তাঁর বাড়ী যান। তার চার দিন পরেই আসামী বোম্বাই ত্যাগ করেন। আসামীর বোম্বাই ত্যাগ ঘটনাটি বিশেষ ইঙ্গিত ও তাৎপর্য্যপূর্ণ। এই হত্যার ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয় ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষে, অথবা ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিকে।

"তৃতীয় ও চতুর্থ আসামী ৯ই জানুয়ারি পুণা গমন করেন এবং চতুর্থ আসামী সেখানে প্রথম ও দ্বিতীয় আসামীর সঙ্গে পরিচিত হন। তারপর তৃতীয় ও চতুর্থ আসামীকে নির্দ্দেশ দেওয়া হয় বাদগের দোকানে যেতে। বাদগের ভৃত্য শঙ্কর ছিলেন সেখানে। তাঁরা কয়েকটি হাতবোমা ও বিস্ফোরক পদার্থ সেখানে পরীক্ষা করে দেখেন। ১০ই জানুয়ারি তৃতীয় ও চতুর্থ আসামী ফিরে আসেন বোম্বাইয়ে। সেই দিনই তাঁরা শ্রীযুত সাভারকরের গৃহে যান। ঐ তারিখে তাঁরা অধ্যাপক জৈনের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন।

"১৪ই জানুয়ারি প্রথম ও দ্বিতীয় আসামী বোম্বাইয়ে ফিরে এসে 'দাদারে' শ্রীযুত সাভারকরের গৃহে যান। বোম্বাইয়ে হোটেলে ছিলেন তাঁরা। রাত্রে ছিলেন যোশী বলে এক বন্ধুর বাড়ীতে। ঐ তারিখেই বাদগে এবং শঙ্করও ছিলেন বোম্বাইয়ে। বাদগের সঙ্গে ছিলো কিছু

বিস্ফোরক পদার্থ। তা ছাড়া বিশেষ একটি জায়গায় একটি থলের ভেতরেও পাঁচটি হাতবোমা ও কিছু বিস্ফোরক পদার্থ ছিলো। উদ্দেশ্য ছিলো—পরে কোনো সময়ে এগুলো নিয়ে যাওয়া হবে। ঐদিন প্রথম আসামী তাঁর ভ্রাতৃবধূ গোপাল গড্‌সের স্ত্রীকে এক হাজার টাকার একটি জীবনবীমার "এসাইনী" মনোনীত করেন। ষষ্ঠ আসামী গোপাল গড্‌সে ছিলেন একটি মোটর ট্র্যান্সপোর্ট ডিপোর সিভিলিয়ান স্টোরকীপার। সেই তারিখে তিনি সাত দিনের জন্যে ছুটির আবেদন করেন। ১৭ই থেকে ২৩শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত ছুটি মঞ্জুর হয় তাঁর।

"১৫ই জানুয়ারি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আসামী হাতবোমা আর বিস্ফোরকভরা থলেটি আনতে যান। থলেটি খুলবার পর কি ঘটেছিলো তার প্রমাণ আপনার সুমুখেই রয়েছে। তারপর তাঁরা এখানে-সেখানে ঘুরে বেড়ান।

"চতুর্থ আসামী, শ্রীযুক্তা মোদক নাম্নী কোনো মহিলার কাছে গিয়ে জানিয়েছিলেন যে, তিনি তাঁর কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে দিল্লী যাচ্ছেন। শ্রীযুক্তা মোদক হয়তো শীগগিরই একটি বিরাট সংবাদ শুনতে পাবেন। ঐদিন তৃতীয় ও চতুর্থ আসামী পেশোয়ার-এক্সপ্রেসে বোম্বাই থেকে দিল্লী যাত্রা করেন। ১৫ই তারিখে বোম্বাই থেকে বিমান-পথে যাত্রার জন্যে দু'খানি টিকিট কেনা হয়। ১৭ই জানুয়ারি টিকিট দু'টি কেনা হয়েছিল ছদ্মনামে। বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা তখন বিভিন্ন নামের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।

"প্রথম ও দ্বিতীয় আসামী বোম্বাই ত্যাগ করে মধ্যাহ্নে দিল্লী পৌঁছেন। বাদগে এবং শঙ্করও ১৮ই তারিখে দিল্লী যাত্রা করেন। তৃতীয় ও

চতুর্থ আসামী ১৭ই তারিখে দিল্লী পৌছে একটি হোটেলে অবস্থান করেন। তৃতীয় আসামী 'ব্যাস' নামে নিজের পরিচয় দিয়েছিলেন। মদনলাল পরিচয় দিয়েছিলেন নিজের নামেই। প্রথম ও দ্বিতীয় আসামীও ঐদিনই দিল্লী পৌছে আশ্রয় নেন একটি হোটেলে। নিজেদের তাঁরা পরিচয় দেন 'এ. দেশপাণ্ডে' ও 'এস্. দেশপাণ্ডে' নামে। প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ আসামী ১৮ই তারিখে দিল্লীতে ছিলেন। বাদগে ও শঙ্কর এসে পৌছেন ১৯শে তারিখে। গোপাল গড্‌সে আসেন ১৯শে তারিখ রাত্রিতে।

"২০শে জানুয়ারি সকালে আসামী শঙ্কর ও বাদগে বিড়লা ভবন দেখে আসেন। দ্বিতীয় আসামীই তাঁদের দু'জনকে সেই স্থানটি, বিশেষ করে মহাত্মা গান্ধীর বসবার জায়গাটি, দেখিয়ে দেন।

"এই সময়ে তাঁদের সঙ্গে ছিলো দু'টি বন্দুক, পাঁচটি হাতবোমা আর দু'টি বিস্ফোরক দ্রব্য। ২০শে জানুয়ারি অপরাহ্ণে এই সব অস্ত্রশস্ত্র দলের বিভিন্ন জনের মাঝে ভাগ করে দেওয়া হয়। মদন-লালকে দেওয়া হয় একটি হাতবোমা ও একটি বিস্ফোরক, শঙ্করকে একটি হাতবোমা, আর বাদগেকে একটি বন্দুক ও একটি হাতবোমা।

"এঁদের পরিকল্পনা ছিলো এই যে, ইঙ্গিতের সঙ্গে সঙ্গেই বিস্ফোরক দ্রব্য ছোড়া হবে। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই সুরু হবে গোলযোগ, আর সেই সুযোগেই রিভলবার দিয়ে গুলী করতে হবে গান্ধীজীকে। পরিকল্পনা অনুযায়ী বিস্ফোরণ ঘটলো, কিন্তু কোন কারণে পরিকল্পনার দ্বিতীয় অংশটি কার্য্যকরী হলো না। হয়তো গোলমালটা আশানুরূপ হয় নি, কিংবা পরিবেশটিও তেমন সুবিধাজনক ছিলো না, তাই পরি-কল্পনার দ্বিতীয়াংশ সফল হতে পারে নি।

"এইরূপে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তৃতীয় ও চতুর্থ আসামী আগে বেরিয়ে পড়েন। কিছুক্ষণ পরে দ্বিতীয় ও প্রথম আসামী, শঙ্কর, বাদগে এবং গোপাল একটি ট্যাক্সি করে বেরিয়ে যান। এঁদের সবাই-যে বিড়লা ভবনে গিয়েছিলেন, এখন আমি তা ধর্ম্মাবতারের কাছে প্রমাণ করতে পারবো। নির্দ্দিষ্টসময়ে মদনলালের হাতে বিস্ফোরণ ঘটলো। মদনলালের সে-কাজ দৃষ্টিগোচর হবামাত্র তাঁকে গ্রেপ্তার করা হলো।

"২০শে তারিখের ঐ ঘটনার পর বাদগে ও শঙ্কর ঐ রাত্রেই দিল্লী ত্যাগ করেন। যাবার আগে তাঁরা একটি বোমা ও কিছু গুলীবারুদ হিন্দু মহাসভা ভবনের পেছন দিকে মাটির নীচে লুকিয়ে রেখে যান। পরে ঐগুলিকে উদ্ধার করা হয়। প্রথম ও দ্বিতীয় আসামীও অন্যপথে দিল্লী ত্যাগ করেন। তাঁরা প্রথমে যান কানপুরে, পরে কল্যাণ হয়ে বোম্বাইয়ে। বোম্বাইয়ের থানা অঞ্চলে তাঁরা সবাই মিলিত হন এক বন্ধুর গৃহে। ২৭শে তারিখে দ্বিতীয় আসামী বিমানযোগে দ্বিপ্রহরে দিল্লী পৌছেন। ঐদিনই তাঁরা গোয়ালিয়র যাত্রা করেন এবং রাত্রিতে সেখানে পৌছেন। তাঁরা ডাঃ পারচুরের গৃহে যান, এবং ২৮শে তারিখে পিস্তল সংগ্রহ করেন। সেইদিনই তাঁরা দিল্লী যাত্রা করে ২৯শে তারিখে সেখানে পৌছেন।

"ইতিমধ্যে তৃতীয় আসামী ২৮শে তারিখ দিল্লী পৌছেন। পিস্তলটিকে পরীক্ষা করে তাঁরা সেটিকে সন্তোষজনক বলেই মনে করেন। ৩০শে তারিখে সকলেই যান প্রার্থনা সভায়।

"পরবর্ত্তী ঘটনা খুব সংক্ষিপ্ত। মহাত্মা গান্ধী তাঁর কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে প্রার্থনা সভার দিকে এলে প্রথম আসামী 'নমস্তে গান্ধীজী'

বলে তাঁর কাছে এগিয়ে যান। পরক্ষণেই পিস্তল বার করে গান্ধীজীকে তিনবার গুলী করেন; পিস্তলে ছিলো সাতটি গুলী, তার ভেতর ছোড়া হয়েছিলো তিনটি। বিড়লা ভবনের জনৈক কর্ম্মচারী প্রথম আসামীর মাথায় আঘাত করেন। পরে আসামীকে হাজতে রাখা হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসামী সেখান থেকে চলে আসেন। পরে দিল্লী ত্যাগ করে ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে পৌঁছেন বোম্বাইয়ে। তাঁরা হোটেল পরিবর্ত্তন করেন। থানা অঞ্চলের সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে পুনরায় তাঁরা সাক্ষাৎ করেন। পরেও তাঁরা একবার সেখানে যান।

"দ্বিতীয় আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয় ১৪ই ফেব্রুয়ারি। ঐদিনে পরে তৃতীয় আসামীকেও গ্রেপ্তার করা হয়। ৬ই ফেব্রুয়ারি শ্রীযুত সাভারকরকে জননিরাপত্তা আইন অনুসারে এবং ৭ই ফেব্রুয়ারি ডাঃ পারচুরেকে আটক করা হয়।"

শ্রীযুত দফ্‌তরি অতঃপর কতকগুলি দলিলপত্রের উল্লেখ করেন। ১৯৪৭ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি পর্য্যন্ত 'অগ্রণী' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলির প্রতি বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং তা থেকে কোনো-কোনো লেখার উল্লেখ করে তিনি আসামীর তৎকালীন এবং গান্ধীজীর প্রতি আসামীদের বিরুদ্ধ মনোভাব প্রমাণ করবার প্রয়াস পান।

সাত

চার্জ শীট

বিচারপতি নিম্নলিখিত 'চার্জ শীট' পড়ে শোনান :

"বিষয় : মহাত্মা গান্ধী-হত্যার মামলা।

"আসামী : নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে এবং আরও আটজন।

"দিল্লীর লালকেল্লায় বিশেষ আদালতের বিচারপতি আমি, আত্মাচরণ, আই-সি-এস্, এতদ্বারা নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে (৩৭), নারায়ণ দত্তাত্রেয় আপ্তে (৩৪), বিষ্ণু রামচন্দ্র করকারে (৩৭), মদনলাল পাওয়া (২০), শঙ্কর কিস্তায়া (২০), গোপাল বিনায়ক গড্‌সে (২৭), বিনায়ক দামোদর সাভারকর (৬৫) ও দত্তাত্রেয় পারচুরে (৪৯),—আপনাদের নিম্নোক্তরূপ অভিযোগে অভিযুক্ত করছি :—

"প্রথমত—নাথুরাম গড্‌সে, নারায়ণ আপ্তে, বিষ্ণু করকারে, মদনলাল পাওয়া, শঙ্কর কিস্তায়া, গোপাল গড্‌সে, বিনায়ক দামোদর সাভারকর ও দত্তাত্রেয় পারচুরে,—আপনারা ১৯৪৭ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারির মধ্যে পুণা, বোম্বাই, দিল্লী এবং অন্যান্য স্থানে নিজেরা এবং দিগম্বর বাদগে (ইনি রাজানুগ্রহ লাভ করেছেন), গঙ্গাধর দণ্ডবতে, গঙ্গাধর যাদব, সূর্য্যদেব শর্ম্মা এবং অন্যান্য অপরিচিত ফেরার লোকদের সঙ্গে এক হয়ে একটি বেআইনী কাজ, অর্থাৎ মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীকে,—যিনি বিশেষভাবে মহাত্মা গান্ধী নামেই জনগণের মধ্যে পরিচিত,—হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করেছেন। আপনাদের একমত ও ষড়যন্ত্র অনুযায়ী ঐ কার্য্য, অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর হত্যা, ১৯৪৮

সালের ৩০শে জানুয়ারি দিল্লীতে সংঘটিত হয়। অতএব আপনারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সঙ্গে পঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০ (বি) ধারা অনুসারে অপরাধ করেছেন, আর তা এই আদালতের বিচারক্ষমতার আওতায় পড়ে।

"দ্বিতীয়ত ১৯৪৮ সালের ১০ই জানুয়ারি থেকে ২০শে জানুয়ারির মধ্যে উক্ত ষড়যন্ত্র অনুসারে নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে, নারায়ণ আপ্তে, বিষ্ণু করকারে, মদনলাল পাওয়া, শঙ্কর কিস্তায়া এবং গোপাল গড্‌সে, আপনারা দিগম্বর বাদগের সঙ্গে—

"ক (১) ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১০ ধারার বিধান অমান্য করে বিনা লাইসেন্সে অস্ত্র ও গুলীবারুদ, অর্থাৎ কার্তুজসহ দু'টি রিভলবার দিল্লীতে পাঠিয়ে ভারতীয় আইনের ১৯ (ডি) ধারা অনুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে.

"(২) উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানে আপনারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯ ও ১১৪ ধারার পাঠসহ অস্ত্র আইনের ১৯-ডি ধারা অনুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে;

"খ (১) ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৪ ও ১৫ ধারার বিধান অমান্য করে দিল্লীতে বিনা লাইসেন্সে আপনাদের অধিকারে ও নিয়ন্ত্রণে অস্ত্র ও গুলীবারুদ, অর্থাৎ কার্তুজসহ দু'টি রিভলবার, রেখে ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারা অনুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে:

"(২) আপনারা দিল্লীতে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৪ ধারার পাঠ সহ ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারা অনুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে।

"তৃতীয়ত ১৯৪৮ সালের ১০ই জানুয়ারি থেকে ২০শে জানুয়ারির মধ্যে উক্ত ষড়যন্ত্র অনুসারে, নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে, নারায়ণ আপ্তে, বিষ্ণু করকারে, মদনলাল পাওয়া, শঙ্কর কিস্তায়া ও গোপাল গড্‌সে,— আপনারা দিগম্বর বাদগের সঙ্গে দিল্লীতে

"ক (১) কারো জীবন বিপন্ন করবার উদ্দেশ্যে, অথবা অন্য কেউ যাতে কারো জীবন বিপন্ন করতে পারে সেই উদ্দেশ্যে বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, অর্থাৎ দুটি 'গান-কটন' টুকরা ও অগ্নি-সংযোগের পলিতা সহ পাঁচটি হাতবোমা, আপনাদের অধিকারে ও নিয়ন্ত্রণাধীন রেখে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৪ (বি) ধারা অনুসাবে যে-দণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে,

"(২) উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যতা করে আপনারা বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৬ ধারার পাঠসহ ৪ (বি) ধারা অনুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে;

খ (১) বিস্ফোরক দ্রব্য, অর্থাৎ দু'টি 'গান-কটনের' টুকরা এবং অগ্নি-সংযোগের পলিতাসহ পাঁচটি হাতবোমা, এমনভাবে আপনাদের অধিকারে রেখেছিলেন যাতে এ-সন্দেহ স্বভাবতই মনে উদ্রেক হতে

৪

পারে যে, আপনারা আইনসঙ্গত উদ্দেশ্যে সেগুলি আপনাদের কাছে রাখেন নি; এবং তার জন্যেই বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৫ ধারা অনুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ আপনারা করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে;

"(২) উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানে আপনারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৬ ধারার পাঠসহ ৫ ধারা অনুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে।

"চতুর্থত উক্ত ষড়যন্ত্র অনুসারে ১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারি দিল্লীর বিড়লা ভবনে—

"ক (১) আপনি মদনলাল পাওয়া বেআইনীভাবে ও বিদ্বেষবশে একটি বিস্ফোরক দ্রব্য, অর্থাৎ একটি বোমা, বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন, এবং উক্ত বিস্ফোরণের ফলে জীবন বিপন্ন ও সম্পত্তির গুরুতর ক্ষতির সম্ভাবনা ছিলো। এইভাবে আপনি বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩ ধারানুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে;

"(২) নাথুরাম গড্‌সে, নারায়ণ আপ্তে, বিষ্ণু করকারে, শঙ্কর কিস্তায়া ও গোপাল গড্‌সে,—আপনারা দিগম্বর বাদগের সঙ্গে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানে মদনলাল পাওয়াকে সাহায্য করে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৬ ধারার পাঠসহ ৩ ধারা অনুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে।

"পঞ্চমত উক্ত ষড়যন্ত্র অনুসারে ১৯৪৮ সালের ২৫শে জানুয়ারি নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে, নারায়ণ আপ্তে, বিষ্ণু করকারে, মদনলাল পাওয়া, শঙ্কর কিস্তায়া, গোপাল গড্‌সে ও বিনায়ক দামোদর সাভারকর,

—আপনারা দিগম্বর বাড়গের সঙ্গে একটি অপরাধ অনুষ্ঠানে, অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীর হত্যা ব্যাপারে, পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে (ঐ অপরাধের দণ্ড—মৃত্যু অথবা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর; এবং ঐ অপরাধ পারস্পরিক সাহায্যের স্বীকৃতি অনুসারে অনুষ্ঠিত) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারাসহ ১১৫ ধারা অনুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে।

"বর্তত ১৯৪৮ সালের ২৮শে জানুয়ারি থেকে ৩০শে জানুয়ারির মধ্যে উক্ত ষড়যন্ত্রের ফলে—

"ক (১) নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে ও নারায়ণ আপ্তে,—আপনারা ভারতীয় অস্ত্র-আইনের ৬ ধারার বিধান অমান্য করে বিনা লাইসেন্সে গোয়ালিয়র থেকে দিল্লীতে অস্ত্রশস্ত্র ও গুলীবারুদ, অর্থাৎ কার্তুজসহ ৬০৬৮২৪ নং একটি অটোমেটিক পিস্তল, এনে ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (সি) ধারা অনুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে;

"(২) নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে, নারায়ণ দত্তাত্রেয় আপ্তে ও দত্তাত্রেয় সদাশিব পারচুরে,—আপনারা উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৪ ধারার পাঠসহ ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (সি) ধারা অনুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে;

"খ (১) নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে,—আপনি ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৪ ও ১৫ ধারার বিধান অমান্য করে দিল্লীতে আপনার অধিকারে ও নিয়ন্ত্রণাধীনে অস্ত্র ও গুলীবারুদ, অর্থাৎ কার্তুজসহ ৬০৬৮২৪ নং একটি

অটোমেটিক পিস্তল, রেখে ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারা অনুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে ;

"(২) নারায়ণ আপ্তে ও বিষ্ণু করকারে,—আপনারা দিল্লীতে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানে পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৪ ধারার পাঠসহ ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারা অনুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে।

"সপ্তমত উক্ত ষড়যন্ত্র অনুসারে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি দিল্লীর বিড়লা ভবনে—

"(১) নাথুরাম বিনায়ক গড্‌সে,—আপনি ইচ্ছাপূর্ব্বক এবং জেনে-শুনেই মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু ঘটিয়ে যে-হত্যাপরাধ করেছেন এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে ;

"(২) নারায়ণ আপ্তে ও বিষ্ণু করকারে,—আপনারা উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানে নাথুরাম গড্‌সেকে সাহায্য করেছেন, এবং ঐ অপরাধ আপনাদের সমক্ষেই অনুষ্ঠিত হয়েছে ; তার ফলে আপনারা ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৪ ধারার পাঠসহ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে ;

"(৩) মদনলাল পাওয়া, শঙ্কর কিস্তায়া, গোপাল গড্‌সে, দামোদর বিনায়ক সাভারকর ও দত্তাত্রেয় সদাশিব পারচুরে,—আপনারা দিগম্বর বাদগের সঙ্গে উক্ত অপরাধ অনুষ্ঠানে নাথুরাম গড্‌সেকে সাহায্য করে ভারতীয় দণ্ডবিধির ১০৯ ধারার সঙ্গে পঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২

ধারা অনুসারে যে-দণ্ডনীয় অপরাধ করেছেন তা এই আদালতের আওতায় পড়ে।"

আট

"বিচার চাই"

চার্জ শীটের ভাষা ছিলো ইংরেজি। করকারে ও শঙ্কর তা বুঝতে পারবেন না বলে দোভাষীর সাহায্যে ইংরেজির অনুবাদ করে শোনানো হয় তাঁদের। করকারেকে মারাঠি ভাষায় আর শঙ্করকে তেলেগু ভাষায়। প্রসঙ্গত বলে রাখি, তেলেগু দোভাষী হচ্ছেন একজন মহিলা।

অতঃপর প্রত্যেক আসামীকেই বিচারপতি জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁবা অভিযোগের পক্ষে অপরাধ স্বীকার করবেন, না বিচার চান তাঁরা।

প্রথমেই উত্তর দিলেন নাথুরাম, "আমি বিচার চাই।"

তারপর বাকি সাত তারে একই ঝঙ্কার উঠলো, "আমি নির্দোষ, আমি বিচার চাই।"

শ্রীযুত সাভারকর শুধু সংক্ষেপে বললেন, "আমি নির্দোষ।"

দোষ করলেও সেটা যদি লোকচক্ষুর অন্তরালে সংঘটিত হয়ে থাকে তবে অপরাধী সাধারণত সে-দোষ স্বীকার করে না। কিন্তু নাথুরাম

যে গান্ধীজীকে গুলী করে মেরেছিলেন এ-ব্যাপার লোকেও যেমন দেখেছে, নাথুরামও তেমনি জানেন। এক্ষেত্রে তাঁর পক্ষে বিচার চাওয়াটা বিস্ময়ের বলেই মনে হওয়া স্বাভাবিক। এতো লোকের সমক্ষে প্রকাশ্য দিবালোকে যে-লোকটা সজ্ঞানে এমন নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটালে তার আবার বিচার কি? কিন্তু নাথুরাম নিরক্ষর নন, বুদ্ধিহীনও নন। তাঁর কথার ওজন অপরজনে না বুঝলেও তিনি বুঝেন। জ্ঞানকৃত হত্যাপরাধের শাস্তি যে কি, তা জানেন তিনি। আর এ-ও জানেন, অন্য সকলে রেহাই পেলেও কোনো দোহাইয়েও তাঁর মুক্তি নেই। অতএব যুক্তিটা কি হতে পারে তাঁর উক্তির? তিনি কি ভেবেছেন যে, বহু অযুক্তকে যুক্ত করে তিনি করবেন এক অপার বিস্ময়ের সৃষ্টি, বিচার না হলে যা অসম্ভব? কিংবা মনে করেছেন—

কিন্তু মনের জটিল রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করবে কার সাধ্য? ঈশ্বরের মতোই তা অজ্ঞেয়। দর্শন কেঁদে মরছে অদর্শনের ব্যাকুলতায়, আর মনঃসমীক্ষণের বীক্ষণও ঘুরে মরছে গোলকধাঁধায়। অতএব তাঁর মনের কথা এখন তাঁর মনেই থাক। ক্ষণ এলে হতেও পারে তার প্রকাশ।

কিন্তু মনের কথা যাই হোক, মনে রাখার কথা ভোলেন না মদনলাল। প্রথম দিনেই তিনি দিতে চেয়েছিলেন এক বিবৃতি। বিচারক বলেছিলেন, সে-অনুমতি তিনি পাবেন মামলার প্রথম শুনানির দিন। এইদিনে মদনলাল বিবৃতি দিলেন: "আমার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হয়েছে আমি তার একটিও স্বীকার করি না। মহাত্মাকে হত্যা করবার জন্যে কোনোরূপ ষড়যন্ত্র হয়েছিলো, একথাও

অস্বীকার করি আমি। মহাত্মা গান্ধীর অবলম্বিত তৎকালীন নীতি ও কংগ্রেসী নীতির বিরুদ্ধে দেশব্যাপী অসন্তোষের প্রকাশ অভিব্যক্ত করাই ছিলো আমার একমাত্র উদ্দেশ্য। ২০শে জানুয়ারির ঘটনার সঙ্গে একমাত্র আমিই জড়িত ছিলাম, আর কেউ নয়।"

সেদিন মধ্যাহ্নভোজের পর, শ্রীযুত দফ্‌তরি, বিড়লা ভবনে গান্ধীজীর হত্যাস্থল ও ২০শে জানুয়ারির বোমাবিস্ফোরণের স্থান দেখবার জন্যে, আদালতকে অনুরোধ করেন। আদালত তাতে সম্মত হন; এবং আসামীগণও সেখানে যেতে চান কি না, জানতে চান।

আসামীরা সেখানে গেলে তাঁর কাজের ক্ষতি হতে পারে, এই যুক্তিতে শ্রীযুত দফ্‌তরি এক আপত্তি উত্থাপন করেন। আপ্তের পক্ষের কৌঁসুলি শ্রীযুত মঙ্গলে আসামীদের বিড়লা ভবনে নিয়ে যাবার স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। আদালত তখন প্রত্যেক আসামীকেই আলাদাভাবে জিজ্ঞাসা করেন, তাঁরা সেখানে যেতে চান কি না। আপ্তে, করকারে, গোপাল গড্‌সে ও মদনলাল,—এই চারজনই কেবল সেখানে যেতে রাজী হন। অতঃপর স্থির হয়, প্রয়োজনীয় বিশেষ পুলিশ ব্যবস্থা করে ২৪শে জুন সকাল দশটায় বিড়লা ভবনে যাওয়া হবে। সাংবাদিক বা দর্শকের প্রবেশ সে-সময়ের জন্যে নিষিদ্ধ থাকবে সেখানে।

দর্শকদের কথায় মনে পড়লো, প্রথম শুনানির দিন বহু দর্শক আদালতে উপস্থিত হয়েছিলেন। যাক, কৌতূহলপ্রবৃত্তি যে তাঁদের যায় নি, এইটেই প্রমাণিত হলো। কারণটাও যে সরকারি হতে পারে বলে কল্পনা করেছিলাম, তা-ও দেখেছি মিথ্যে নয়। কারণ, এইদিনেই

দর্শকগণ প্রথম লাভ করেন আদালতে প্রবেশাধিকার।

আসামীদের পক্ষে যে-সকল কৌসুলি এইদিন আদালতে উপস্থিত ছিলেন তাঁদের নাম :—

নাথুরাম গড্সের পক্ষে—শ্রীযুত ভি. ভি. ওক। আপ্তের পক্ষে—শ্রীযুত মজলে। করকারের পক্ষে—শ্রীযুত এন. ডি. ডাঙ্গে। মদনলালের পক্ষে—শ্রীযুত বি. ব্যানার্জি। শঙ্করের পক্ষে—শ্রীযুত এইচ. এন. হংসরাজ মেহ্তা। গোপাল গড্সের পক্ষে—শ্রীযুত মোহনলাল মনিয়ার। ডাঃ পারচুরের পক্ষে—শ্রীযুত পি. এল. ইনামদার। সাভারকরের পক্ষে—শ্রীযুত এল. বি. ভোপৎকার, শ্রীযুত কে. এল ভোপৎকার, শ্রীযুত যমুনাদাস মেহ্তা ও শ্রীযুক্তগণপৎ রায়।

পূর্ব্বে নাটকের যে-উপমার কথা বলেছিলাম, স্মরণ হলো সেই কথা। নাটকের প্রত্যেক অঙ্কে থাকে ক্লাইমেক্স্; সঙ্গে চিত্তচমৎকার উত্তেজনা আর বিস্ময়,—এ-ই নাটকের নিয়ম। কিন্তু এই নাটকে দেখা গেল তার ব্যতিক্রম। এর প্রথম দৃশ্যেই এক পরম বিস্ময়। অন্যতম আসামী শ্রীযুত দিগম্বর রামচন্দ্র বাদগে হয়ে দাঁড়ালেন রাজসাক্ষী, পেলেন রাজানুগ্রহ। একেই বলে দুর্গ্রহ, অবশ্য আসামীদের পক্ষে। দিগম্বর যে এমনিভাবে সহসা দিগম্বর হয়ে পড়বেন, আগে থেকে কেউ ভাবেন নি এ-কথা। কিন্তু বাদগে যখন সত্যি সত্যিই বাদ সাধলেন, আসামীরা তখন স্বাভাবিক ঘৃণায় যা উচ্চারণ করলেন তা-ও ঐ একজনেরই নাম,—"রামচন্দ্র! রামচন্দ্র!" হা রাম! হারায় করে সব দিক থেকেই কেড়ে নিলে এঁদের আরাম?

কিন্তু রামচন্দ্রের চেয়ে এঁর বিভীষণ নাম হওয়া ছিলো অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। বিভীষণ স্বপক্ষ ত্যাগ করে যোগ দিয়েছিলেন বিপক্ষে। কিন্তু তা অন্যায়ের পক্ষে নয়, ন্যায়ের পক্ষে। ইনিও যোগ দিলেন ধর্ম্মপক্ষেই। কাজটা ভালো কি মন্দ, সাহসের কি কাপুরুষতার,— এ প্রশ্ন আজকের দিনে অবান্তর। বিভীষণের যুগ ছিলো বিশ্বাসের যুগ। বিশ্বাসই ছিলো সেকালের ধর্ম্ম। বিশ্বাসভঙ্গের জন্যেই ধর্ম্মপক্ষে যোগ দিয়েও বিভীষণের দুর্নাম আজো ঘুচলো না। বিশ্বাসভঙ্গের জন্যেই ভগবান রামচন্দ্রকেও স্পর্শ করলে বালি-বধের দুরপনেয় কলঙ্ক। কিন্তু বর্ত্তমানে বিশ্বাস-অবিশ্বাস গেছে একাকার হয়ে। এ-যুগের স্থায়ী আদর্শ নেই কিছু।

যাই হোক, নিজপুত্র থেকে আরম্ভ করে বহু স্বজনের মৃত্যু-রহস্যের সন্ধান দিয়েছিলেন বিভীষণ। নিজ ভৃত্য থেকে বহু সহকর্ম্মীর কোন্ রহস্যের সন্ধান দেবেন এই রামচন্দ্ররূপী বিভীষণ, জানবার জন্যে আজ থেকে সবাই রইল উদ্‌গ্রীব হয়ে।

নয়

শেরিফ হিন্দু হোটেলে

২৪শে জুন বেলা দশটার সময় বিচারপতি শ্রীযুত আত্মাচরণ, সরকারপক্ষের প্রধান কৌঁসুলি শ্রীযুত দফ্‌তরি ও আসামী পক্ষের

প্রধান কৌঁসুলি শ্রীযুত এল্. বি. ভোপৎকার সহ,—বিড়লা ভবনের যেখানে ২০শে জানুয়ারি বোমাবিস্ফোরণ ঘটেছিলো, যে-স্থানে মহাত্মা গান্ধী গুলীবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছিলেন এবং যে-কক্ষ থেকে মহাত্মা প্রার্থনা সভায় এসেছিলেন সেই তিনটি স্থান পরিদর্শন করেন। আপ্তে করকারে, মদনলাল ও গোপাল গড্‌সে—এই চারজন আসামীকেও সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। সঙ্গে ছিলো কড়া পুলিশ পাহারা।

যে-স্থানে মহাত্মার পবিত্র শোণিতপাত হয়েছিলো সে-স্থানে নির্ম্মিত হয়েছে একটি সিমেন্টের বেদী। তার উপর হিন্দীতে খোদিত হয়েছে গুলীবিদ্ধ মহাত্মার কণ্ঠোচ্চারিত শেষ দুটি কথা—"হা রাম!" আর রয়েছে দুর্ঘটনার কাল ও তারিখ,— "অপরাহ্ন ৫-১৭ মিনিট, ৩০শে জানুয়ারি, ১৯৪৮ সাল।"

মধ্যাহ্নের পর আদালতে আবার শুনানি আরম্ভ হলো। সরকার পক্ষের হয়ে প্রথম সাক্ষী দিতে এলেন গোয়ালিয়র রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক হেড্ কনেস্টবল, নাম শ্রীঈশ্বরদত্ত মুলচাঁদ।

তাঁর জবানবন্দীতে তিনি বললেন যে, গঙ্গাধর দণ্ডবতে, গঙ্গাধর যাদব ও সূর্যদেব শর্ম্মা নামে যে-তিনজন আসামী এখনো ফেরার আছেন তাঁদের তিনি জানেন। তাঁরা সবাই গোয়ালিয়র-আগত বটে, কিন্তু গত ২রা ফেব্রুয়ারি থেকে কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না তাঁদের। গোয়ালিয়র জননিরাপত্তা আদেশ অনুযায়ী একটি মামলা

সম্পর্কে তাঁর উর্দ্ধতন কর্মকর্তার নির্দেশ অনুসারে তিনি নিজেই খোঁজ করেছিলেন তাঁদের, কিন্তু কারো কোনো অনুসন্ধানই পাওয়া যায় নি। গান্ধীজীর হত্যার মামলা সম্পর্কে দিল্লী, পুণা ও বোম্বাইয়ের পুলিশও যে তাঁদের সন্ধান করে ফিরছেন, এ-সংবাদ তিনি জানেন।

আসামী পারচুরের পক্ষের কৌঁসুলি শ্রীযুত ইনামদারের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, গত পাঁচ'ছয় বছর ধরে তিনি ডাঃ পারচুরেকে জানেন। বিগত ছয়-সাত বছর ডাঃ পারচুরে বাস করছেন গোয়ালিয়রেই। তিনি সেখানকার একজন চিকিৎসা ব্যবসায়ী। গোয়ালিয়রে তাঁর কোনো সম্পত্তি আছে কি না, সাক্ষী তা জানেন না।

সরকারপক্ষের দ্বিতীয় সাক্ষীর নাম শ্রীরামলাল দত্ত। তিনি দিল্লীর শেরিফ হিন্দু হোটেলের ম্যানেজার।

গত ১৭ই জানুয়ারি তিনজন লোক এসে তাঁর হোটেলে নাম রেজিস্টারি করেন। হোটেলের দিনপঞ্জীতে তাঁরা নাম লিখিয়েছিলেন, বি. এম. ব্যাস, মদনলাল ও আমছেকর।

তিনজনের কাউকে তিনি সনাক্ত করতে পারেন কি না, জিজ্ঞাসা করা হলে সাক্ষী আসামীদের কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে যান এবং করকারে ও মদনলাল পাওয়াকে উক্ত তিন ব্যক্তির দু'জন বলে চিনতে পারেন। করকারেকে দেখিয়ে সাক্ষী বলেন যে, তিনিই হোটেল-রেজিস্টারিতে তাঁর নাম লিখিয়েছিলেন, 'ব্যাস'।

শ্রীযুত দফ্তরি তখন আমছেকরকে আদালতে উপস্থিত করে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, ঐ দুই ব্যক্তির সঙ্গে যে-তৃতীয় লোকটি ছিলেন, এই ব্যক্তিকেই সেই লোক বলে তিনি চিনতে পারেন কি না। উত্তরে সাক্ষী বলেন, হ্যাঁ। তিনি আরো বললেন যে, ঐ তিনজনই ১৭ই থেকে ২০শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত তাঁর হোটেলে ছিলেন। ঐ তিনজন যখন হোটেলে ছিলেন তখন তাঁদের সন্ধানে আরো এক ব্যক্তি গিয়েছিলেন সেখানে।

তিনি আবার কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে গোপাল গডসেকে সনাক্ত করে বলেন যে, ঐ ব্যক্তিই ব্যাস ও মদনলালের খোঁজে সেখানে গিয়েছিলেন।

পরের দিন, অর্থাৎ ২৫শে জুন, আবার আদালত বসলে, শ্রীরামলাল দত্ত তাঁর সাক্ষ্যের পূর্ব্বানুবৃত্তি করে বলেন, মদনলাল পাওয়া ও ব্যাস (করকারে), ১৭ই, ১৮ই ও ১৯শে,—এই তিন দিন ছিলেন তাঁর হোটেলে। সে সময়ে হোটেলের ভৃত্য ছিলো সাত জন। রামসিং নামে হোটেলের এক ভৃত্যের উপর ব্যাস (করকারে) তাঁর কাপড়-চোপড় ধৌত করবার ভার দিয়েছিলেন। হোটেল ত্যাগের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত ঐ আসামীদের তিনি আর একবার মাত্র বোম্বাইয়ে দেখেছিলেন। সেখানে একটি সনাক্তকরণ প্যারেডে পুলিশ নিয়ে লাগিয়েছিলেন তাঁকে।

করকারের কৌঁসুলি শ্রীযুত ডাঙ্গের জেরাপ্রসঙ্গে সাক্ষী বলেন যে,

এক সময়ে পাকিস্তানে একটি তুলার কারখানার ম্যানেজার ছিলেন তিনি। বর্ত্তমানে তিনি যে-হোটেলের অংশীদার সেটি এখন ক্রমোন্নতির পথে। বহু লোক প্রত্যহ সেখানে আসা-যাওয়া করেন। কোনো বিশেষ দিনে কতোজন লোক হোটেলে এসেছিলেন তা নিশ্চয় করে তিনি বলতে পারেন না। তবে যাঁরা সেখানে থেকেছেন তাঁদের সনাক্ত করতে পারেন তিনি। হোটেলে থাকবার সময় করকারে কি-পোষাক পরেছিলেন তা তাঁর স্মরণ নেই। সনাক্তকরণ প্যারেড উপলক্ষে আরো জন কুড়ি লোকের সঙ্গে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বোম্বাইয়ে। সেখানে তিনি ছিলেন চার-পাঁচদিন। সে-কদিনের মধ্যে বোম্বাই পুলিশের সংস্পর্শে তিনি আসেন নি। দিল্লী-পুলিশই তাঁকে নিয়ে যান প্যারেডে, আর সেখানেই তিনি সনাক্ত করেন আসামীদের।

মদনলাল পাওয়ার কৌঁসুলি শ্রীযুত ব্যানার্জির প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, মদনলাল তাঁকে বলেছিলেন যে, তিনিও এসেছেন পাকিস্তান থেকে। নিজের বিয়ের ব্যাপারে তিনি দিল্লী এসেছেন, এমন কথা মদনলাল তাঁকে বলেন নি। হোটেলে আগন্তুকদের নাম-রেজিস্টারি খাতা দু'তিন দিন পর পরই পুলিশ কর্ম্মচারী এসে পরীক্ষা করে থাকেন।

গোপাল গড্‌সের পক্ষের কৌঁসুলি শ্রীযুত মোহনলাল মমিয়ারের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী জানান যে, ১৭শে জানুয়ারি তারিখে আসামী গোপাল গড্‌সে হোটেলে মদনলালের সঙ্গে যখন দেখা করতে এসে-ছিলেন তখন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর। সাক্ষী হোটেলের একজন ভৃত্যকে তাঁর সঙ্গে দিয়ে মদনলালের ঘর দেখিয়ে দেবার নির্দ্দেশ দেন। শ্রীযুত

মজিয়ার যে বলেছেন, সাক্ষীর হোটেলে গোপাল গড্‌সের আসবার কথা মিথ্যা,—এ কথা সাক্ষী অস্বীকার করেন।

পরবর্তী সাক্ষীর নাম শ্রীশান্তিপ্রকাশ। তিনি শেরিফ হিন্দু হোটেলের অংশীদার।

আসামীর কাঠগড়ায় দণ্ডায়মান করকারেকে সনাক্ত করে তিনি বলেন যে, ঐ লোকই হোটেলে বি. এম. ব্যাস বলে নিজের নাম সই করেছিলেন। করকারেকে দেখিয়ে বলেন যে, ব্যাস (করকারে) যখন হোটেলের বিল সম্পর্কিত বিশেষ বিবরণ জানবার জন্যে হোটেলের আপিসে আসেন, ঐ ব্যক্তি তখন তাঁর সঙ্গে এসেছিলেন। ঐ দু'জনকেই তিনি প্রথম দেখেছিলেন তাঁর হোটেলে। পরে বোম্বাইয়ে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সনাক্ত করেছিলেন এঁদের।

শ্রীযুত ডাঙ্গে জেরাপ্রসঙ্গে শান্তিপ্রকাশকে জিজ্ঞাসা করেন যে, 'ব্যাস' বলে যে-করকারেকে তিনি আজ সনাক্ত করলেন তিনি কি সাক্ষীকে নিজের নাম বলেছিলেন 'ব্যাস'?

শান্তিপ্রকাশ নেতিবাচক উত্তর দিয়ে বললেন যে, ব্যাস হিন্দীতে স্বাক্ষর করবার পর যে-আলোচনা চলেছিলো তা থেকেই তিনি ঐরূপ নাম ধরে নিয়েছিলেন।

আসামী 'ব্যাস' যেদিন হোটেলে আসেন সেদিন তিনি তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রায় আধঘণ্টাকাল। আসামী হোটেলের আগন্তুকদের খাতায়

"কে. এম. ব্যাস বলে, হিন্দীতে সই করেছিলেন নিজের নাম। সাক্ষী চেয়েছিলেন যাতে তারা উর্দু বা ইংরেজিতে নাম স্বাক্ষর করেন। পরে মদনলাল ঐরূপ স্বাক্ষর করেছিলেন বটে। আসামী তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিলেন ভাঙা হিন্দুস্থানীতে।

শ্রীযুত মনিয়ারের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, ১৯শে জানুয়ারি অপর দুই আসামীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে গোপাল গড্‌সে হোটেলে আসেন। সাক্ষী তখন হোটেলেই ছিলেন। গোপাল গড্‌সেকে তিনিই ব্যাস ও মদনলালের কাছে নিয়ে যান।

পরবর্ত্তী সাক্ষী শেরিফ হিন্দু হোটেলেব ভৃত্য রাম সিং। আসামী করকারে ও মদনলালকে সনাক্ত করে সে বলে যে, এই বৎসরের প্রথম দিকেই এঁরা হোটেলে ছিলেন। শান্তারাম আত্মারাম আমছেকর নামে এক ব্যক্তিকেও সনাক্ত করে সাক্ষী বলে যে, হোটেলের যে-ঘরে পূর্ব্বোক্ত আসামী দু'জন ছিলেন, ইনিও সেখানেই থাকতেন।

হোটেলে যাঁরা ছিলেন তাঁদের সকলকেই সাক্ষীর স্মরণ আছে কি না এবং সে তাঁদের সনাক্ত করতে পারে কি না, আসামী পক্ষের কৌঁসুলির এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, আরো কিছুদিন তাঁরা হোটেলে থাকলে সে তা করতে পারতো।

পরবর্তী সাক্ষী হলেন শান্তারাম আত্মারাম আমছেকর।

১৭ই জানুয়ারি থেকে ১৯শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত শেরিফ হিন্দ হোটেলে ব্যাস (করকারে) ও মদনলালের সঙ্গে যে-তৃতীয় ব্যক্তি বাস করেছিলেন সে ইনিই। গতকাল হোটেলের ম্যানেজার শ্রীরামলাল দত্ত সনাক্ত করেছিলেন এঁকেই।

সাক্ষ্যদানকালে আমছেকর বললেন যে, তিনি সিন্ধু হতে আগত একজন আশ্রয়প্রার্থী। ১২ই জানুয়ারি তিনি বোম্বাইয়ে পৌছেন। ১৫ই জানুয়ারি পেশোয়ার-এক্সপ্রেসে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী হয়ে তিনি যাত্রা করেন দিল্লী। করকারে ও মদনলালকে সনাক্ত করে তিনি বলেন যে, বোম্বাই থেকে ঐ দু'জনও ট্রেনে তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। গাড়িতেই করকাবেব সঙ্গে হয় তাঁর পরিচয়। করকারে তাঁকে বলেন যে, তিনি হিন্দু মহাসভার কর্ম্মী, এবং হিন্দু মহাসভার কাজেই যাচ্ছেন দিল্লী। দিল্লী পৌছে করকারে যখন মদনলালকে ডাকলেন, কেবলমাত্র তখনই তিনি প্রথম বুঝতে পারলেন যে, মদনলালও করকারের সঙ্গী। মদনলালও বোম্বাই থেকে দিল্লী আসছিলেন একই কামরাতেই। স্টেশন থেকে টাঙ্গা করে করকারে ও মদনলালের সঙ্গে তিনি প্রথমে যান হিন্দু মহাসভা ভবন ও পরে বিড়লা মন্দিরে, কিন্তু থাকবার জায়গা পান নি কোথাও। তারপর তারা চাঁদানি চকে গিয়ে শেরিফ হিন্দু হোটেলে নাম রেজিস্টারি করেন। সেদিন তারিখ ছিলো ১৭ই জানুয়ারি।

দিল্লী ত্যাগ করেন তিনি ১৯শে তারিখ। আগের দিন ছিলো রবিবার। করকারে বলেছিলেন যে, সেদিন সন্ধ্যায় কে একজন দিল্লী

আসবেন। অতএব তাঁরা সবাই রেলস্টেশনে যাবেন স্থির করেছিলেন। পরের দিন সোমবার তিনি ট্র্যান্সফার ব্যুরোতে গিয়ে তাঁর নিজের কাজ সেরে অপরাহ্ণেই দিল্লী ত্যাগ করেন।

আমছেকরের সাক্ষ্য শেষ না হতেই আদালতের কাজ সোমবার ২৮শে জুন পর্য্যন্ত মুলতুবী রাখা হয়।

দশ

মদনলালের ক'নে দেখা

২৮শে জুনের শুনানির দিন গান্ধীজীর পৌত্র শ্রীযুত কানু গান্ধী আদালতে উপস্থিত ছিলেন। মহাত্মার পরিবারস্থ কারো এই মামলার সম্পর্কে আদালতে উপস্থিতি এই প্রথম।

শ্রীযুত দফ্‌তরির প্রশ্নের উত্তরে শান্তারাম আজ বলেন যে, ১৯শে তারিখে ট্র্যান্সফার ব্যুরো থেকে হোটেলে প্রত্যাবর্ত্তন করে সাক্ষী দেখতে পান যে, করকারে ও মদনলালের সঙ্গে যে-ঘরে তিনি থাকতেন সেই ঘরেই রয়েছেন অপর এক ব্যক্তি।

করকারে না কি সাক্ষীকে বলেছিলেন যে, তাঁরা শীগগীরই ঘর ছেড়ে দেবেন, কারণ মদনলালের বিবাহ সম্পর্কে উভয়েই চলে যাবেন জলন্ধরে। তবে মধ্যবর্ত্তীকালে তাঁরা বাস করবেন 'মহারাষ্ট্র নিবাসে'।

সাক্ষী তাঁদের বলেছিলেন যে, তাঁর কাজ তিনি শেষ করেছেন, এবং ঐদিন বিকেলেই তিনি চলে যাবেন বোম্বাই। করকারের নিকট তিনি তাঁর (করকারের) বোম্বাইয়ের স্থায়ী ঠিকানা চেয়েছিলেন, কিন্তু করকারে তা দেন নি।

করকারে ও মদনলাল ছাড়া যে-তৃতীয় ব্যক্তি ঘরে উপস্থিত ছিলেন তাঁকে তিনি চিনতে পারেন কি না, শ্রীযুত দফ্‌তরির এই প্রশ্নের উত্তরে শাস্তারাম কাঠগড়াস্থ আসামী গোপাল গড্‌সের প্রতি অঙ্গুলি-সঙ্কেত করেন।

এই তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষী কোনো কথা বলেন নি। সাক্ষী যখন হোটেল ছেড়ে রেল-স্টেশনের দিকে যাত্রা করেন তখন বিকেল প্রায় পাঁচটা। ঐ তিনজন লোক তখনো হোটেলের সেই কক্ষে ছিলেন। হোটেলের বিলগুলি ছিলো করকারের কাছে। বিলের দরুণ সাক্ষী তাঁকে তাঁর অংশের ২০৲ টাকা দিয়ে দেন।

শ্রীযুত দফ্‌তরি তখন বলেন: আপনি যে-দিন এসে পৌছেন সেই প্রথম দিন, অর্থাৎ ১৭ই জানুয়ারি তারিখের কথা এখন আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি। আপনি বলেছেন যে, আপনি ট্রেন থেকে নাববার পর মদনলাল একটি টাঙ্গা ডেকে এনেছিলেন। আপনার রেলওয়ে টিকিটের কি হলো?

উত্তরে শান্তারাম বললেন যে, ট্রেন থেকে নামবার পর করকারে তাঁর কাছ থেকে টিকিট চেয়ে নেন। পরে তিনি করকারের সঙ্গে রেলওয়ে-ফটক পার হয়ে যান। কিন্তু টিকিট-সংগ্রহকর্ত্তার কাছে করকারে টিকিট জমা দেন নি।

পরদিন, অর্থাৎ ১৮ই তারিখ, সকালে মদনলালের সঙ্গে তিনি যান সব্জীমণ্ডীতে। সেখানে মদনলাল সাক্ষীকে একটি বাড়ী দেখান, কিন্তু কোনো বাড়ীতেই মদনলাল প্রবেশ করেন নি। পরে তাঁরা ফিরে আসেন হোটেলে। কিন্তু আবার যান, সব্জীমণ্ডীতে। কারণ, মদনলাল তাঁকে বলেছিলেন যে, বিবাহযোগ্যা একটি পাত্রী দেখবার জন্যে সেখানে এক আত্মীয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন তিনি। সন্ধ্যাবেলা যখন তাঁরা সব্জীমণ্ডীতে গিয়েছিলেন তখন মদনলাল প্রাতে-প্রদর্শিত বাড়ীর বিপরীত দিকে কোণে-অবস্থিত একটি বাড়ীতে প্রবেশ করেন। মদনলাল জানিয়েছিলেন যে, ক'নে সেই বাড়ীতেই থাকে। সাক্ষী ও মদনলাল দু'জনেই সেই বাড়ীতে ছিলেন প্রায় ঘণ্টাখানেক।

সাক্ষী সেদিন সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময় মদনলালের সঙ্গে জনৈক শরণাগত ভদ্রলোককে আসতে দেখেছিলেন। হোটেলে রাত্রে মদনলালের সঙ্গেই সাক্ষী আহার করেছিলেন। করকারে তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। শুতে যাবার আগেও করকারেকে দেখতে পান নি তিনি। রাত্রেও করকারে হোটেলে ফেরেন নি। এমন কি পরদিন প্রাতে ঘুম ভেঙে উঠেও তিনি দেখতে পান নি তাঁকে। ১৯শে তারিখ ট্র্যাফিক ব্যুরো থেকে হোটেলে ফিরে এসে আবার তিনি তাঁকে দেখতে পান।

করকারে, মদনলাল ও গোপাল গড্সে, এই তিনজনকে তারপর আবার তিনি দেখেছিলেন বোম্বাইয়ের চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে। সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে পুলিশ তাঁকে তাঁর গ্রাম থেকে নিয়ে গিয়েছিলো সেখানে। পূর্ব্ব হতেই এঁদের তিনি চিনতেন না।

সরকারপক্ষের কৌঁসুলি কর্ত্তৃক সাক্ষীর জবানবন্দী এখানেই শেষ হলো। তখন আরম্ভ হলো বিপক্ষ-কৌঁসুলির জেরা।

কিন্তু তার আগে, আদালতে সাক্ষীদের দ্বারা সনাক্তকরণ ব্যাপারে, আদালতের কাছে আপত্তি জানালেন আসামী নাথুরাম। তিনি বললেন, আসামীদের ফটো প্রকাশিত হয়েছে সর্ব্বত্র। বিচারের ফিল্মও দেখানো হয়েছে। অতএব আদালতে কোনো আসামীকে সনাক্ত করা কঠিন নয় কারো পক্ষে।

বিচারক মন্তব্য করেন যে, তাঁর সন্তুষ্টির জন্যে ও বিচারসম্পর্কীয় নথিপত্র হিসাবে প্রয়োজন আছে তার।

আসামী নাথুরাম বলেন যে, দিল্লীতে ও বোম্বাইয়ে সনাক্তকরণ প্যারেড হয়েছে দু'বার। তৃতীয়বার সনাক্তকরণ হলো এই আদালতে। কিন্তু ইতিপূর্ব্বে প্রত্যেকেই দেখে নিয়েছে তাঁদের ফটোগ্রাফ।

আদালত জানান যে, ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে সনাক্তকরণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আসামীদের রাখা হয়েছিলো পর্দ্দার অন্তরালেই। তারই পরে তাঁদের আনা হয়েছে প্রকাশ্যে। বরং এক্ষেত্রে আসামীদের সুবিধা এই যে, তাঁরা সংখ্যায় আটজন, আর সাক্ষীকে সনাক্ত করতে হচ্ছে তাঁদের ভেতর থেকে একজনকে।

এইবার জেরার কথা আসামীপক্ষের কৌঁসুলি শ্রীযুক্ত ডাঙ্গের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, করাচিতে জল-সরবরাহ-বিভাগে যোগ দেবার আগে তিনি ছিলেন 'প্রাফরীডার'। বেতন পেতেন মাসিক ৪০৲ টাকা। সরকারি চাকরিতে মাইনে পাচ্ছিলেন মাসে ১৭৫৲ টাকা। ঊর্দ্ধতন কর্ম্মকর্ত্তার অনুমতি না নিয়েই তিনি করাচি পরিত্যাগ করেছিলেন।

বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্ত্তনের পর সাক্ষী ভেবেছিলেন যে, তিনি সরকারি চাকরিই করবেন, এবং এই কারণেই তিনি দিল্লী গিয়েছিলেন ট্র্যান্সফার ব্যুরোতে 'ফর্ম' পূরণ করতে। দিল্লী যাত্রার পথেই করকারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় ট্রেনে। ১৬ই জানুয়ারি প্রথমে তিনি লক্ষ্য করেন, করকারে কথা বলছেন মারাঠি ভাষায়।

সাক্ষী তারপর বলেন, তিনি রাজনীতিক নন। রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহও নেই। হিন্দু মহাসভার যে কি-বিশদ নীতি, তা তিনি জানেন না। করাচি থেকে আসবার পর তিনি জানতেন না, করকারে শরণাগতদের সেবাকার্য্য করতেন কি না। আমেদনগরে ও থালকভারে-যে করকারের নিজের কোনো হোটেল আছে, সে-কথাও জানতেন না তিনি। করকারে তাঁকে শুধু বলেছিলেন, বোম্বাইয়ে হোটেল আছে তাঁর।

শ্রীযুত ডাঙ্গে তখন প্রশ্ন করলেন: ট্রেনে আপনি বহু জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু বলতে পারেন, এইবারের দিল্লী যাত্রার এতো বিশদ বিবরণ কেন আপনার স্মরণে রইলো?

উত্তরে সাক্ষী বললেন যে, এই তাঁর প্রথম দিল্লী যাত্রা, কাজেই তখনকার সব কিছুই স্মরণে আছে তাঁর।

শ্রীযুত ব্যানার্জির জেরার উত্তরে আমছেকর বলেন যে, দিল্লী স্টেশনে পৌছবার পর মদনলাল তাঁদের সবাইকেই তাঁর (মদনলালের) মামার বাড়ীতে থাকতে বলেছিলেন। ১৮ই জানুয়ারি, সাক্ষী, মদনলালের মামার বাড়ী যান। মদনলালের মামা আলাপ করেন সাক্ষীর সঙ্গে।

১৮ই জানুয়ারি তিনি ও মদনলাল একটি সভায় যান। সভায় প্রথমে বক্তৃতা করেন শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ, এবং পরে পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্রু। শ্রীযুত জয়প্রকাশ যখন বক্তৃতা করছিলেন মদনলাল তখন এই বলে চেঁচিয়ে উঠেন যে, বোম্বাইয়ে যখন তাঁকে বক্তৃতা করতে দেওয়া হয় নি, এইখানেই বা তবে দেওয়া হচ্ছে কেন? মদনলাল হয়তো পুলিশ কিংবা জনসাধারণের হাতে উত্তম-মধ্যম পেতে পারেন, এই আশঙ্কায় সাক্ষী তখন মদনলালের কাছ থেকে সরে পড়েন।

এগারো

এস্. দেশপাণ্ডে,—না এন্. ভি. জি?

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর আবার আদালতের কাজ আরম্ভ হলো। জনৈক সাক্ষী কর্ত্তৃক সনাক্তকরণের প্রয়োজনে মার্জ্জনাপ্রাপ্ত রাজসাক্ষী দিগম্বর বাদগেকে আদালতে হাজির করবার জন্যে শ্রীযুত দফ্‌তরি বিচারকের অনুমতি প্রার্থনা করেন। জেল থেকে বাদগেকে আনবার জন্যে আদালত তখন কর্ত্তব্যরত ইন্সপেক্টরকে নির্দ্দেশ দেন।

অতঃপর ডাকা হলো সরকারপেক্ষর ষষ্ঠ সাক্ষী শ্রীহীরানন্দনীকে।

সাক্ষী বললেন, সিন্ধুপ্রদেশেবাসী স্বরাষ্ট্র দপ্তরের ট্রান্সফার ব্যুরোতে কেরাণীর কাজ করতেন তিনি। যে-সব আশ্রয়প্রার্থী ভারতীয় ডোমিনিয়নে তাঁদের চাকরি বদল করতে চাইতেন, সাক্ষীর আপিসে তাঁদের আবেদনপত্র গৃহীত হতো। সাক্ষীকে একটি আবেদনপত্র দেখানো হলে তিনি বললেন যে, আবেদনপত্রটি নিশ্চয়ই তাঁর হাতে দেওয়া হয়েছিলো, ডাকে পাঠানো হয় নি। আবেদনপত্র পূরণ করা হলে তাতে নাম সই করতে হতো তাঁর। ৫২৮৬ নম্বরযুক্ত আবেদনটি শ্রীশান্তারাম আত্মারাম আমছেকর নামক কোনো ব্যক্তি কর্ত্তৃক পূরণ করা হয়েছিলো। এই উদ্দেশ্যে রক্ষিত রেজিস্টারিতেও একই নম্বর রয়েছে।

এই সাক্ষীকে আর জেরা করা হয় নি।

সপ্তম সাক্ষীর নাম শ্রীরামচন্দ্র। তিনি জাতিতে রাজপুত। তাঁর বয়স ২৩ বৎসর। নয়াদিল্লীর "ম্যারিনা হোটেলে"র জনৈক কেরাণী তিনি।

তিনি বলেন যে, গত ১৭ই জানুয়ারি দু'জন লোক হোটেলে এসে আগন্তুকদের রেজিস্টারি খাতায় নিজেদের নাম লেখেন 'এস. দেশপাণ্ডে' ও 'এম্. দেশপাণ্ডে'। নাথুরাম ও আপ্তেকে উক্ত আগন্তুকদ্বয় বলে সনাক্ত করেন তিনি। এস. দেশপাণ্ডেই রেজিস্টারিতে নামগুলি লিখেছিলেন। ৪০নম্বর ঘরে থাকতে দেওয়া হয় তাঁদের। আগন্তুকদের জন্যে বিভিন্ন রেজিস্টারি রাখা হয়। রেজিস্টারিতে ব্যয়ের বিস্তৃত বিবরণ লেখা হয়, এবং তা থেকেই সমস্ত খরচের একটি চূড়ান্ত 'বিল' প্রস্তুত হয়। হোটেলের অন্যতম কেরাণী মিঃ মার্টিন ফিওডাস এই চূড়ান্ত 'বিল' প্রস্তুত করেন এবং তাতে স্বাক্ষর করেন।

হোটেলবাসী কারো যদি মদ ইত্যাদির প্রয়োজন হয় তবে তাঁকে একটি চিরকুটে সই করে দিতে হয়। কখনো কখনো চিরকূটের অংশ থাকে দু'টি, কখনো বা একটি। ১৭ই জানুয়ারি তারিখের একটি এবং ১৮ই জানুয়ারি দু'টি—এই রকম তিনটি চিরকুটেই যে-স্বাক্ষর রয়েছে তা এস. দেশপাণ্ডের।

২০শে জানুয়ারি রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় পুলিশ একটি লোককে ম্যারিনা হোটেলে নিয়ে আসে। সাক্ষী তখন সেখানে নিজ কর্তব্যে রত ছিলেন বটে, কিন্তু লোকটিকে দেখতে পান নি তিনি। কারণ, কম্বলের মতো দেখতে, এমন কিছু দ্বারা লোকটির সর্বাঙ্গ আবৃত ছিলো।

পুলিশ ও সেই-লোকটির সঙ্গে হোটেলের ম্যানেজার মিঃ পাচ্ছেকো উপরে চলে যান। পরে উপরের ৪০নম্বর ঘরে সাক্ষীরও ডাক পড়ে। সেই ঘর তল্লাসী করে পুলিশ কতকগুলি টাইপ-করা কাগজপত্র হস্তগত করেছিলো। সাক্ষী কাগজপত্রগুলি আদালতে সনাক্ত করেন। পরে বলেন যে, ৪০নম্বর ঘরের বেয়ারা কালীরাম কতকগুলি কাপড়চোপড় সম্পর্কে পুলিশকে বলে যে, ঐ-ঘরে যাঁরা থাকতেন ওগুলো তাঁদেরই, তখন পুলিশ সেই কাপড়-চোপড়গুলিও নিয়ে যায়।

ফরিয়াদীপক্ষের কৌসুলি আট দফা কাপড় আদালতে দাখিল করেন। ঐগুলির মধ্যে একটি তোয়ালের উপর মার্কা রয়েছে—"এন্. ভি. জি।"

শ্রীযুত ভি. ভি. ওকের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, গত ১৭ই জানুয়ারির পূর্ব্বে ঐ দুই ব্যক্তিকে তিনি দেখেন নি। হোটেলে থাকার সময়ে যখন তাঁরা ঘরের চাবি জমা দিতেন বা ফেরৎ নিতেন কেবল তখনই দিনে একবার কি দু'বার তাঁদের সঙ্গে সাক্ষীর দেখা হতো। দু'টি বিভিন্ন তারিখে দিল্লী ডিস্ট্রিক্ট জেলে উক্ত দুই ব্যক্তিকে সাক্ষী সনাক্ত করেছিলেন। ২০শে জানুয়ারি পুলিশ ম্যারিনা হোটেলের রেজিস্টারি খাতা পরীক্ষা করতে এসেছিলো। খাতা পরীক্ষার পর তাতে সই করে তারা চলে যায়। ৫ই ফেব্রুয়ারি রেজিস্টারি খাতা এবং অন্য বইপত্রও নিয়ে যাওয়া হয়।

শ্রীযুত মঙ্গলে সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন, হোটেলের অভ্যর্থনা কেরাণীর (Receptionist Clerk) ঠিক-ঠিক কাজ কি? উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তাঁর কাজ ছিলো আগন্তুকদের অভ্যর্থনা করা, রেজিস্টারি খাতায়

তাঁদের নাম-ধাম লেখা এবং হোটেল ত্যাগের সময় 'বিল' প্রস্তুত করা।

শ্রীযুত মঙ্গলে: শুধু এই-ই আপনার কাজ? উল্লিখিত কাজ ছাড়া আর কিছু করতে হতো না আপনাকে, এই কথাই আপনি বলতে চান?

সাক্ষী: হ্যাঁ।

অতঃপর হোটেলের প্রধান বেয়ারা নারায়ণ সিংয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। আসামী-করকারে ও শঙ্করকে দেখিয়ে সে বলে যে, ৪০নম্বর ঘরে সে তাঁদের চা পান করতে দেখেছিলো। এর আগে বোম্বাইয়েও সে ঐ দু'জনকে সনাক্ত করেছিলো।

শঙ্করের পক্ষের কৌঁসুলি শ্রীযুত মেহ্‌তার প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে যে, ঐদিন ৪০নম্বর ঘরে, প্রায় পনেরো মিনিটকাল শঙ্কর ও করকারেকে সে দেখেছিলো। ম্যারিনা হোটেলে তার আগেও দু'-একবার সে দেখেছে তাঁদের।

সাক্ষীর জেরা শেষ হলে বিচারপতি এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দান করেন যে, রাজসাক্ষী বাদগেকে আগামী কাল হাজির করতে হবে আদালতে।

পরের দিন, অর্থাৎ ২৯শে জুন, রাজসাক্ষী বাদগেকে কয়েক মিনিটের জন্যে আদালতে আনা হলো। রাজানুকম্পালাভ করবার পর আদালতে এই-ই তাঁর প্রথম আবির্ভাব।

সরকারপক্ষের নবম সাক্ষী হলেন দিল্লীর কেন্দ্রীয় পূর্ত্ত বিভাগের জনৈক বনরক্ষী। তাঁর নাম শ্রীমেহের সিং। মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় বোমাবিস্ফোরণের দিনে প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে তিনি তাঁর সহকর্ম্মী পিয়ারেলাল ও কাপ্তেনের সঙ্গে যখন পাঁচকুঁই 'বীটে'র সীমানার মধ্যে টহল দিচ্ছিলেন তখন চারজন লোকের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষী তাঁদের ওখানে ঘোরাফেরা করবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরে তাঁরা বলেন যে, তাঁরা পর্য্যটক, ভ্রমণে বেরিয়েছেন। সাক্ষীর এরূপ প্রশ্ন করবার হেতু জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তর করেন যে, তাঁদের ঘোরাফেরা করতে দেখে তাঁর সন্দেহ জেগেছিলো।

ঐ চারজন লোককে সাক্ষী সনাক্ত করতে পারেন কি না, এই প্রশ্নের পর শ্রীযুত দফ্‌তরি, বাদগেকে আদালতে আনবার জন্যে, বিচারপতিকে অনুরোধ করেন। আপ্তের পক্ষের কৌঁসুলি শ্রীযুত মঙ্গলে তাতে আপত্তি জানান এবং তার অনুরোধে সাক্ষীকে আদালত-কক্ষ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় একটি দেওয়ালের পেছনে। পরে বাদগে এসে আটজন আসামীর মাঝখানেই বসেন।

তখন সাক্ষীকে আবার আদালতে আনা হয়। আসামীর কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে শঙ্কর, গোপাল গড্‌সে, আপ্তে ও বাদগেকে উক্ত চার ব্যক্তি বলে সনাক্ত করেন তিনি।

শ্রীযুত মঙ্গলের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, ঐ ঘটনার প্রায় দেড়মাস পরে পুলিশ তাঁর কাছে গিয়েছিলেন। পুলিশের জনৈক দারোগা এসে তাঁকে তোঘলক রোড থানায় নিয়ে যান। তারা

একমাস পরে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় বোম্বাইয়ে। সেখানে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে ঐ চারজনকে সাক্ষী সনাক্ত করেছিলেন। যখন তাঁকে তোঘলক রোড থানায় নিয়ে যাওয়া হয় তখন আপ্তে ও করকারেকে তিনি সেখানে দেখেন নি।

শ্রীযুত মঙ্গলে: বোম্বাইয়ে যখন আপনাকে ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা হয়, আপ্তে কি তখন ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই বলে অভিযোগ করেন নি যে, তোঘলক রোড থানায় আপ্তেকে পুলিশ আপনার নিকট দেখিয়েছিলো?

সাক্ষী উত্তর দেন যে, আপ্তে বোম্বাইয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এই অভি-যোগ করেছিলেন যে, তাঁকে গ্রেফ্‌তার করবার সময় অনেকেই তাঁকে দেখেছিলো।

শ্রীযুত মঙ্গলে: আপ্তে অভিযোগ করেছিলেন যে, পুলিশ যে-সব লোকসমক্ষে তাঁকে দেখিয়েছিলো আপনি তাঁদের মধ্যে একজন।

সাক্ষী আবার একই উত্তর দেন, আপ্তের অভিযোগ ছিলো যে, তাঁর গ্রেফ্‌তারের সময় অনেকেই তাঁকে দেখেছিলো।

শ্রীযুত মেহ্‌তা: বে-আইনী প্রবেশের সমস্ত সংবাদই কি আপনি উর্দ্ধতন কর্ম্মকর্ত্তাকে জানান?

সাক্ষী: যখন কেউ কোনো ক্ষতি করবার চেষ্টা করে কেবল তখনই জানাই।

সাক্ষী আরো বলেন যে, এই চারজন লোকের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবার তেমন কোনো কারণ ছিলো না বলেই তিনি কোনো অভিযোগ করেন নি।

গোপাল গড্‌সের কৌঁসুলি শ্রীযুত মনিয়ারের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, চার বছর ধরে তিনি বনরক্ষীর কাজ করছেন। গোপাল গড্‌সেকে সনাক্ত করে তিনি বলেন যে, উক্ত চারজনের মধ্যে ঐ-ব্যক্তিও একজন। এবং শুধু তাই নয়, সেদিন সাক্ষীর প্রশ্নের সব উত্তরই দিয়েছিলেন এই সনাক্তকৃত ব্যক্তি।

বারো

ম্যারিনা হোটেলের ৪০ নম্বরে

মামলার দশম সাক্ষী ম্যারিনা হোটেলের বেয়ারা, নাম কালীরাম।

সাক্ষ্য দিতে এসে সে বললে যে, বিড়লা ভবনে যেদিন বোমা-বিস্ফোরণ ঘটে সে-দিনটি তার বেশ মনে আছে। হোটেলের ৪০, ৪১, ৪২ ও ৪৫ নম্বর ঘরের লোকদের ফাইফরমাশ খাটতো সে। সে-সময়ে ৪০ নম্বর ঘরে যে-সকল লোক ছিলেন তাঁদেরকেও স্মরণ আছে তার। সে নিজে তাঁদের ফরমাশ খেটেছিলো। নাথুরাম গড্‌সে ও নারায়ণ আপ্তেকে সনাক্ত করে সাক্ষী বলে যে, ঐ দু'জনই তখন ছিলেন ৪০ নম্বর ঘরে। রাত ৯টায় প্রথম সে তাঁদের দেখতে পায় সেই ঘরে; বিড়লা ভবনে বোমা ফাটবার তিন দিন আগের ব্যাপার

সেটি। চতুর্থ দিনে ঐ ছু'জনেই হোটেল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। ছু'জন লোকই মারাঠি ভাষায় কথা কইতেন বলে সাক্ষী ধরে নিয়েছিলো যে, তাঁরা বোম্বাইয়ের অধিবাসী। সাক্ষী কিছুদিন কাজ করেছিলো বোম্বাইয়ে, মারাঠি ভাষা তাই সে বুঝতে পারে; তবে মারাঠিতে কথা কইতে পারে না। ধোবার জন্যে নাথুরাম গড্‌সে তাকে কিছু কাপড়চোপড় দিয়েছিলেন। কিন্তু ধোপার বাড়ী থেকে সেগুলো কেচে আসবার আগেই ঐ ছু'জন চলে গিয়েছিলেন হোটেল ছেড়ে।

কাপড়গুলোকে সনাক্ত করলে কালীরাম। পরে বললে যে, দিল্লী ডিস্ট্রিক্ট জেলেও সনাক্তকরণ প্যারেডে সে ঐ ছু'জনকে আর-একবার সনাক্ত করেছিলো।

নাথুরামের পক্ষের কৌঁসুলি শ্রীযুত ওকের জেরার উত্তরে সাক্ষী বললে যে, হোটেলে দিনে ছু'চারবার করে ঐ ছু'জনের সঙ্গে দেখা হতো তার। তিন-চার দিন তাঁরা ঐ হোটেলে ছিলেন বলেই তাঁদেরকে সাক্ষীর মনে আছে।

অতঃপর ম্যারিনা হোটেলের ম্যানেজার মিঃ পাছেকো-কে সাক্ষ্য দিতে ডাকা হয়। মিঃ পাছেকো ক্রিশ্চান। আদালতে তখন কোনো বাইবেল ছিলো না বলে শপথ গ্রহণে বাধা পড়ে তাঁর।

এই সময়ে নাথুরাম গড্‌সে বলেন যে, জেলে তিনি যে-ঘরে থাকেন সে-ঘরে বাইবেল আছে একটি। জনৈক পুলিশ কর্ম্মচারীকে সেটি আনতে পাঠানো হয়।

ইতিমধ্যে অপর একজন সাক্ষীকে ডাকা হয়। সে ম্যারিনা হোটেলেরই আর-একজন বেয়ারা, নাম গোবিন্দরাম।

সে বলে যে, বিড়লা ভবনে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় যেদিন বোমাবিস্ফোরণ ঘটে সে-দিনটি তার স্মরণে আছে। নাথুরাম গড্‌সে, করকারে, গোপাল গড্‌সে ও বাদগেকে সনাক্ত করে সে বলে যে, ঘটনার তিন দিন আগে ৪০ নম্বর ঘরে তাঁদের সে দেখেছিলো। মদ্য পরিবেষণই তার কাজ। ঐ ঘরে প্রথম দিনে এক পেগ ও দ্বিতীয় দিনে দু' পেগ হুইস্কি সে পরিবেষণ করেছিলো। করকারেকে দেখিয়ে সে বলে যে, দু'দিনই ঐ লোকটি মদ্যপান করেছিলেন।

মিঃ পাছেকো এই মামলার দ্বাদশ সাক্ষী।

তিনি সাক্ষ্য দিতে এলেন মধ্যাহ্ন-ভোজের পর। বলাবাহুল্য আদালতে ততোক্ষণে বাইবেল আনা হয়েছিলো।

মিঃ পাছেকো তাঁর সাক্ষ্যে বললেন যে, ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে যে-দু'জন লোক তাঁর হোটেলে থাকতে এসেছিলেন সে-দুজনকে তাঁর মনে আছে। তাঁরা তাঁদের নাম লিখেছিলেন 'দেশপাণ্ডে'। ১৭ই জানুয়ারি তাঁরা হোটেলে এসেছিলেন; এবং ২০শে জানুয়ারি অবধি সেখানে ছিলেন। তাঁরা যখন প্রথম এলেন, সাক্ষী তখন হোটেলে ছিলেন না। গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় যে-বোমাবিস্ফোরণ

হয় তাও মনে আছে তাঁর। সেদিন ছিলো ২০শে জানুয়ারি। সেই দিনই পুলিশ এসেছিলো হোটেলে। তখন রাত্ত প্রায় এগারোটা। পুলিশ দলের সঙ্গে আরো একজন লোক ছিলেন, তাঁর হাতে ছিলো হাতকড়া। ৩২নম্বর ঘরে কে থাকেন, দলের পুলিশ-কর্ম্মকর্ত্তা সাক্ষীকে প্রশ্ন করেছিলেন। সাক্ষী উত্তর দিয়েছিলেন যে,সে-ঘরে রয়েছেন একজন 'বৃটিশ অফিসার'। পুলিশ-কর্ম্মকর্ত্তার নির্দ্দেশে তখন সেই হাতকড়া-পরা লোকটিকে আনানো হয়।

মিঃ পাছেকো :এই প্রথম সেই লোকটির মুখ আমি দেখলাম। হোটেলে যখন তিনি প্রথম এসেছিলেন তখন তাঁর মুখ ছিলো ঢাকা। পুলিশ-কর্ম্মকর্ত্তাটি তাঁকে ডাকবার পর দেখলাম তাঁর মুখের সে-আবরণ অপসৃত হয়েছে। যে-ঘরে তাঁর বন্ধুরা ছিলেন এবং বিকেলে তিনি নিজেও ছিলেন, সেই ঘরটি দেখাবার জন্যে তাঁকে নির্দ্দেশ দেওয়া হলো। তিনি আমাদের নিয়ে গেলেন ৪০নম্বর ঘরে।

সাক্ষী তারপর মদলালকে সনাক্ত করে বললেন যে, ঐ লোকটিকেই সেদিন হাতকড়া পরিয়ে হোটেলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

যে-দুই 'দেশপাণ্ডে' সেই হোটেলে ছিলেন তাঁদের তিনি সনাক্ত করতে পারেন কি না, জিজ্ঞাসা করা হলে সাক্ষী, নাথুরাম ও আপ্তেকে

দেখিয়ে দেন। আগে একবার তিনি এক সনাক্তকরণ প্যারেডে নাথুরামকে সনাক্ত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্ত্তী এক প্যারেডে তিনি তাঁকে সনাক্ত করতে পারেন নি।

পুলিশে তিনি কোনো বিবৃতি দিয়েছেন কি না, শ্রীযুত ওক-এর এই প্রশ্নের উত্তরে মিঃ পাছেকো বললেন যে, পুলিশের কাছে তিনি এক মৌখিক বিবৃতি দিয়েছিলেন মাত্র ; তা ছাড়া আর কোনো বিবৃতি দেন নি। প্রার্থনা সভায় বোমাবিস্ফোরণের প্রায় পক্ষকাল পরে অনুষ্ঠিত হয়েছিলো প্রথম সনাক্তকরণ প্যারেড। ইতিমধ্যে মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। সংবাদপত্রে তিনি পাঠ করেছিলেন আততায়ীর কথা। প্রার্থনা সভায় সমবেত জনতার কেউ-কেউ হত্যাকারীকে প্রহার করেছিলেন, এ-সংবাদও পড়েছিলেন তিনি।

প্রথম প্যারেডের দিনে নাথুরাম গড্‌সে কি-পোষাকে ছিলেন, শ্রীযুত ওকের এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তাঁর যতো দূর স্মরণ আছে নাথুরাম ধুতি ও সার্ট পরে ছিলেন। তাঁর সম্বন্ধে আর কিছুই সাক্ষীর মনে নেই। প্রায় চৌদ্দ-পনেরোজন লোকের মাঝে তাঁকে সনাক্ত করতে হয়েছিলো। তাঁদের সকলেরই মাথায় ছিলো কাপড়-বাঁধা। যে লোকটিকে (নাথুরাম গড্‌সে) সনাক্ত করেছিলেন তাঁর মাথায় কাপড় বাঁধা ছিলো কি না, বলতে পারেন না তিনি। আরো বলতে পারেন না, তাঁর মাথায় ব্যাণ্ডেজ ছিলো কি না।

শ্রীযুত মঙ্গলের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, যে-আপ্তেকে আজ তিনি সনাক্ত করলেন, দ্বিতীয় সনাক্তকরণ প্যারেডে তিনি তাঁর পরিবর্ত্তে সনাক্ত করেছিলেন অন্য একজনকে।

হোটেলবাসী কাউকে কোনো ঘরে মদ্য পরিবেষণের পর হোটেলের বেয়ারাদের সেই ঘরেই থাকতে হয় কি না, শ্রীযুত ডাঙ্গের এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, মদ্য পরিবেষণের পর তাঁর (হোটেলবাসীর) সই

নিয়েই বেয়ারাকে ঘর থেকে চলে আসতে হয়। সাক্ষী আরো বলেন যে, যাঁরা হোটেলে বাস করেন কেবল তাঁদেরকেই উগ্র মদ্য পরিবেষণ করা হয়ে থাকে।

পরবর্তী সাক্ষী হলেন মার্টিন থেড্ডিয়াস। তিনি ম্যারিনা হোটেলের একজন অভ্যর্থনা-কেরাণী। ১৭ই জানুয়ারি থেকে ২০শে জানুয়ারি অবধি ৪০ নম্বর ঘর সম্পর্কিত একটি 'বিলের' প্রতিলিপি পরীক্ষা করে তিনি বলেন যে, ঐ বিলে স্বাক্ষর তিনিই করেছিলেন। নাথুরাম গড্‌সেকে দেখিয়ে সাক্ষী বলেন, ২০শে জানুয়ারি সন্ধ্যা প্রায় ছ'টার সময় ঐ ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে তাঁকে 'বিল' প্রস্তুত করতে বলেছিলেন। করকারেকে দেখিয়ে সাক্ষী বলেন যে, ঐ-লোকই নাথুরাম গড্‌সের খোঁজে হোটেলে এসেছিলেন।

শ্রীযুত ওক-এর জেরাপ্রসঙ্গে থেড্ডিয়াস বলেন যে, ২০শে জানুয়ারির দু'-একদিন পরে পুলিশ তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন। মহাত্মা গান্ধী নিহত হয়েছেন, এ-সংবাদ তিনি সংবাদপত্রে পড়েছিলেন। প্রথম সনাক্তকরণ প্যারেডে নাথুরাম গড্‌সেকে তিনি সনাক্ত করেছিলেন দেশপাণ্ডে বলে।

শ্রীযুত ওক: জেলে যখন তাঁকে সনাক্ত করেছিলেন তখন লোকটির মধ্যে কিছু পার্থক্য ছিলো কি?

উত্তর: হ্যাঁ, একটি পার্থক্য ছিলো।

আদালত: আপনি সোজাসুজি প্রশ্ন করছেন না কেন?

লোকটির মাথায় কোনো আঘাতের চিহ্ন ছিলো কি না, বিচারপতি এই প্রশ্ন করলেন সাক্ষীকে। সাক্ষী উত্তর করলেন যে, তাঁর মাথায় একটি ব্যাণ্ডেজ ছিলো।

শ্রীযুত ডাঙ্গের জেরার উত্তরে সাক্ষী বললেন, বোমাবিস্ফোরণের উনিশ-কুড়ি দিন পরে করকারেকে সনাক্ত করেছিলেন তিনি।

সনাক্তকরণের জন্যে বোম্বাইয়ে নিয়ে যাওয়া হয় নি তাঁকে।

প্রশ্ন : হোটেলের 'বিল' কে পরিশোধ করেছিলেন?

নাথুরাম গড্‌সেকে দেখিয়ে সাক্ষী বললেন যে, ঐ ব্যক্তিই 'বিল'এর টাকা চুকিয়ে দিয়েছিলেন।

আর-একটি প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, করকারে যে কি-উদ্দেশ্যে হোটেলে এসেছিলেন তা তিনি বলতে পারবেন না। করকারেকে মদ্য পরিবেষণ করা হয়েছিলো কি না; তাও জানেন না তিনি।

তেরো

"গাড়ি ছাড়ো—গাড়ি ছাড়ো"

৩০শে জুন মামলার শুনানি আরম্ভ হবার আগে, যে-ট্যাক্সিতে চড়ে আসামীদের কয়েকজন ২০শে জানুয়ারি তারিখে বোমাবিস্ফোরণের স্থল বিড়লা ভবনে গিয়েছিলেন, কয়েকজন আসামী, সরকার ও আসামীপক্ষের কৌঁসুলি এবং বিচারপতি সেই ট্যাক্সিটি পরিদর্শন করেন। নাথুরাম, সাভারকর ও পারচুরে, আসামীদের মধ্যে এই তিনজন গাড়ি দেখতে যান নি, তাঁরা কাঠগড়াতেই ছিলেন।

তারপর সেই ট্যাক্সিচালক সুরজিৎ সিংয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

সাক্ষ্যে সে বলে যে, ২০শে জানুয়ারি তারিখে বিড়লা ভবনে বিস্ফোরণ হয়েছিলো, এ-কথা তার স্মরণ আছে। সেইদিন বিকেল প্রায় ৪টা কি ৪—১৫ মিনিটের সময় রিগ্যাল সিনেমা ট্যাক্সি-স্ট্যাণ্ডের নিকট চারজন যাত্রী উঠেছিলেন তার গাড়িতে। আরোহীদের নিয়ে সাক্ষী প্রথমে যায় বিড়লা মন্দিরে। সেখান থেকে বিড়লা ভবনে, অবশেষে কনট প্লেসে

("রিগ্যালসে হাম বিড়লা মন্দির গয়ে। বিড়লা মন্দিরসে হাম বিড়লা হাউস গয়ে।")। আসামী আপ্তেকে দেখিয়ে সাক্ষী বলে যে, ঐ ব্যক্তিই তার সঙ্গে ভাড়া ও অন্যান্য বিষয় ঠিক করেছিলেন। গাড়ি ভাড়া স্থির হয়েছিলো ১২৲ টাকা।

তিনজন আরোহী বসেছিলেন পেছনের আসনে, আর-একজন দাড়িওয়ালা আরোহী বসেছিলেন সাক্ষীর পাশে সুমুখের আসনে। রাজসাক্ষী বাদগেকে সনাক্ত করে সাক্ষী বলে যে, ঐ দাড়িওয়ালা লোকটিই বসেছিলেন তার পাশে। আর গোপাল গড্‌সে, আপ্তে ও শঙ্করকে দেখিয়ে বলে যে, ঐ তিনজন বসেছিলেন পেছনের আসনে। পেছনের আসনের তৃতীয় ব্যক্তিকে সনাক্ত করবার সময় শঙ্কর কিস্তায়াকে দেখিয়ে সাক্ষী বললে, "ইনিই পেছনের আসনের তৃতীয় ব্যক্তি।"

তাঁদের নিয়ে সে প্রথমে যায় বিড়লা মন্দিরে। গাড়ি থেকে নেমে আরোহীরা কোথাও গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু সে ঐ বিড়লা মন্দিরে না অন্য কোথাও, সাক্ষী তা বলতে পারে না। প্রায় পনেরো-বিশ মিনিট তাঁরা অনুপস্থিত ছিলেন। পরে তাঁদের সে নিয়ে যায় বিড়লা ভবনে।

গাড়িখানি দাঁড় করিয়েছিলো সে বিড়লা ভবনের পেছন দিকে। কারণ, নিজে সে রাস্তা চিনতো না, গাড়ির আরোহীরা পথ দেখিয়ে তাকে নিয়ে গিয়েছিলো সেখানে। আপ্তেকে দেখিয়ে সে বললে যে, ঐ লোকটিই পথনির্দ্দেশ করেছিলেন।

বিড়লা ভবনে উপস্থিত হবার পর তাঁরা গাড়ি থেকে নেমে ভৃত্যদের প্রবেশ-পথ দিয়ে ভেতরে চলে যান। পথে আরো দু'তিন জন লোকের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়, কথাবার্ত্তাও হয় তাঁদের সঙ্গে। তারপর সাক্ষী আর তাঁদের দেখে নি। কারণ, সে নিজেও তখন গিয়েছিলো প্রার্থনা সভায়। লাউডস্পীকার খারাপ ছিলো, এবং

কোনো কিছুই শুনতে পাচ্ছিলো না বলে সাক্ষী তার গাড়িতে ফিরে আসে।

তার কিছুক্ষণ পরেই আরোহীরাও ফিরে আসেন গাড়িতে। দাড়িওয়ালা যে-লোকটি সুমুখের আসনে বসেছিলেন তিনি আর ফিরে আসেন নি। তাঁর পরিবর্ত্তে এসেছিলেন অন্য কেউ। সাক্ষী, নাথুরাম গড্‌সেকে, সেই নবাগত ব্যক্তি বলে সনাক্ত করে।

আরোহীরা ফিরে আসবার পর-মুহূর্ত্তেই সে গাড়ি ছেড়ে দেয়। সাক্ষী মনে করে যে, সে গাড়িতে ফিরে আসবার পাঁচ মিনিট পরেই আরোহীরাও ফিরে এসেছিলেন সেখানে। ফিরে এসেই তাঁরা বললেন, "গাড়ি ছাড়ো, গাড়ি ছাড়ো।"

সাক্ষী বলে যে, বিস্ফোরণের শব্দ সে শুনেছিলো বটে, কিন্তু তা গাড়ি ছাড়বার আগে কি পরে, ঠিক স্মরণ করতে পারছে না।

গাড়িতে ফিরবার সময় আরোহীরা হেঁটে এসেছিলেন কি দৌড়ে এসেছিলেন, এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে, "আমি তা লক্ষ্য করি নি।"

যে-পথ দিয়ে এসেছিলেন সে-পথ দিয়েই তাঁরা বিড়লা ভবন ছেড়ে, গেলেন কনট প্লেসে। ঐখানেই ভাড়া নিয়ে আরোহীদের সে নামিয়ে দেয়।

মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর একদিন পুলিশের কাজেই সে তার গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলো তোঘলক রোড থানায়। সেখানে দু'জন শিখ পুলিশ-অফিসার তাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ২০শে জানুয়ারি তারিখে সে গাড়ি নিয়ে বিড়লা ভবনে গিয়েছিলো কি না। সাক্ষী পুলিশে একটি বিবৃতি দিয়েছিলো।

যে-সব লোককে সে পূর্ব্বে দিল্লী ডিস্ট্রিক্ট জেলে ও বোম্বাইয়ে সনাক্ত করেছিলো সে-সব লোকদের আবার যখন তাকে দেখাতে বলা হলো তখন বাদগে আসামীর কাঠগড়ায় ছিলেন না। নাথুরাম গড্‌সে, আপ্তে

ও গোপাল গড্‌সেকে দেখাবার পর একটু থেমে সে বললে, "সেই দাড়িওয়ালা লোকটি তো এখানে নেই।" তারপর বাদগেকে আদালতে আনা হলে সাক্ষী তাঁকে সনাক্ত করে।

শ্রীযুত ওক-এর জেরার উত্তরে সাক্ষী বলে যে, বোমাবিস্ফোরণের দিনে বিড়লা ভবন থেকে ফিরতি যাত্রার সময় নাথুরাম গড্‌সে যখন এসে তার গাড়িতে উঠেন তখনই সে তাঁকে প্রথম দেখে। তোঘলক রোড থানায় তাঁকে সে দেখে নি।

প্রশ্ন : থানায় তুমি এমন কাউকে দেখেছিলে যাঁর মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিলো ?

সাক্ষী : না, আমি এমন কাউকে দেখি নি।

দিল্লী ডিস্ট্রিক্ট জেলে যাঁকে সে সনাক্ত করেছিলো তাঁর মাথায়ও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিলো না। তবে তাঁর মাথার চারদিক তোয়ালে-ঢাকা ছিলো। সনাক্তকরণ-কালে সেখানে লোক ছিলো দশ-বারোজন।

শ্রীযুত মঙ্গলের প্রশ্নের উত্তরে সুরজিৎ সিং বলে যে, যে-গাড়িতে করে আসামীদের সে বিড়লা মন্দির ও বিড়লা ভবনে নিয়ে গিয়েছিলো সেই গাড়িটিই সে লাহোরে থাকবার সময় ট্যাক্সি হিসাবে ভাড়া খাটাতো। দিল্লীতে এসেও প্রায় দু'মাস কাল সেটিকে ট্যাক্সি হিসাবেই চালিয়েছিলো। কেবল গত ক'মাস ধরে ট্যাক্সিটিকে সে নিজের কাজেই ব্যবহার করছিলো।

২০শে জানুয়ারি তারিখে যে-ব্যক্তি ট্যাক্সির ভাড়া ঠিক করেছিলেন তাঁর পরণে ছিলো কালো পাজামা, গায়ে কালো কোট, আর ছিলো একটি মাফলার।

বিড়লা ভবনে গাড়ি থেকে নেমে আসামীরা প্রার্থনা-মঞ্চের দিকেই গিয়েছিলেন ("প্রার্থনা স্থান কী তরফ চলে গয়ে।"),—পুলিশে আগে এরূপ বিবৃতি দিয়েছে বলে সুরজিৎ সিং অস্বীকার করে। বিড়লা ভবনে সেদিনই প্রথম গিয়েছিলো বলে সে-স্থানটি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সে

দেখে নিয়েছিলো। চাকর-বাকরেরা কোথায় থাকে, সে-সম্বন্ধে কোনো খোঁজ করে নি সে।

প্রশ্ন : সেগুলো যে ভৃত্যদের আবাসগৃহ, কেমন করে জানলে ?

উত্তর : পরে সেখানে আমি আরো কয়েকবার গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : সেখানে তোমার কয়েকবার যাতায়াতের কারণ কি ?

উত্তর : বোম্বাইয়ে গিয়ে কয়েকজন লোকের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হয়েছিলো। তাদের সঙ্গে দেখা করবার জন্যেই বিড়লা ভবনে গিয়েছিলাম।

কৌঁসুলি শ্রীযুত মেহ্‌তার প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে যে, সে একেবারেই নিরক্ষর। ১৯৪০ সাল থেকে সে লাহোরে ট্যাক্সি-চালকের কাজ করছে।

শ্রীযুত মেহ তা : বোমাবিস্ফোরণের তারিখ তোমার মনে রইলো কি করে ?

উত্তর : ঐ ঘটনার পর প্রবল চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিলো,—তাই তারিখটি মনে আছে।

প্রশ্ন : সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় লাহোরে শানশি গেটে পরীমহলে যে-বিরাট অগ্নিকাণ্ড হয়েছিলো, তার তারিখ কি তোমার মনে আছে ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : অগ্নিকাণ্ড কোন মাসে হয়েছিলো স্মরণ করতে পারো ?

উত্তর : সম্ভবত বছরের শেষ মাসে।

প্রশ্ন : এটি কি একটি বড়ো ঘটনা নয় ?

উত্তর : মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় বোমাবিস্ফোরণের মতো বড়ো ঘটনা নয়।

আরো কিছু জেরার পর আদালতের কাজ শেষ হয়।

তার আগে আসামী মদনলাল আদালতকে জানান যে, মধ্যাহ্ন-ভোজের সময় যখন আদালতের কাজ বন্ধ ছিলো তখন রাজসাক্ষী বাদগেকে সরকারপক্ষের কৌসুলির কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে কয়েকজন পুলিশ-কর্ম্মচারী তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। এ ব্যাপার আপত্তিকর।

এ-সম্পর্কে দৃষ্টি দেবেন বলে আদালত প্রতিশ্রুতি দেন।

চোদ্দ

প্রত্যক্ষদর্শিনী

১লা জুলাই তারিখের শুনানির প্রথম সাক্ষী হলেন জনৈকা মহিলা, নাম সুলোচনা দেবী। নানকচাঁদের পত্নী তিনি। বাস করেন বিড়লা ভবনের কাছেই ৯ নম্বর আলবুকার্ক রোডে।

বিড়লা ভবনে প্রার্থনা সভায় বোমাবিস্ফোরণের দিনটি তাঁর মনে আছে। তিনি বলেন: যে-স্থানে বোমা ফেটেছিলো সে-স্থান আমি চিনি। আমার বাড়ী থেকে সে-জায়গা প্রায় দেড়শো পা দূরে। যখন বোমাবিস্ফোরণ ঘটে, আমি তখন সেখান থেকে তেরো-চোদ্দ পা দূরে ছিলাম।

কেন তিনি সেখানে গিয়েছিলেন, তার উত্তরে তিনি বলেন যে, বিড়লা ভবনের ভৃত্যদের আবাসগৃহের পশ্চাতে যে-বৃত্তাকার স্থানটি আছে, তাঁর শিশুপুত্র মহেন্দ্র সেখানে খেলা করতে গিয়েছিলো, এবং তিনি তাকে আনতে গিয়েছিলেন।

বৃত্তাকার স্থানটিতে পৌছামাত্র একটি ফিকে সবুজ রংয়ের গাড়ি সেখানে আসে। বিড়লা ভবনের পাশ দিয়ে যে-রাস্তা গিয়েছে সেই

রাস্তা ধরেই গাড়িটি এসেছিলো। ভৃত্যদের আবাসগৃহের বিপরীত দিকে এসে গাড়িটি থামে। গাড়িতে জন কয় আরোহী ছিলেন, সাক্ষী তাঁদের গাড়ি থেকে নামতে দেখেন। তাঁর ধারণা, আরোহীরা সংখ্যায় ছিলেন চারজন। গাড়ি থেকে নামবার পর আরো দু'তিন জন লোকের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়। তারপর তাঁরা বিড়লা ভবনের দ্বার-পথে প্রবেশ করেন।

বিড়লা ভবনের ভৃত্যদের আবাসগৃহে যে-সকল ভৃত্য আছে তাদের কাউকে তিনি চেনেন কি না, জিজ্ঞাসা করলে সুলোচনা দেবী বলেন, তিনি ছোটুরাম ও ফুল সিংকে চেনেন। আরোহীদের একজন গাড়ি থেকে নেমে ছোটুরামের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সাক্ষী ছিলেন তখন তাঁর ছেলের কাছেই।

যেখানে কিছুক্ষণ পরেই বোমাবিস্ফোরণ হয়েছিলো সেই দিকেই একটি লোককে তিনি যেতে দেখেন। তাঁর ধারণা ছিলো যে, লোকটি গাড়ি থেকেই নেমে এসেছিলো কিন্তু সে-কথা নিশ্চয় করে তিনি বলতে পারেন না। তিনি দেখলেন, লোকটি সেখানে একটি বোমা রাখলে। পরে দেশলাই জ্বালিয়ে বোমায় আগুন ধরিয়ে দিলে। তারপর সে সাক্ষীর বাসভবনের দিকে চলে গেলো। সেই মুহূর্তেই তিনি জোর করে ছেলেকে টেনে নিয়ে বোমার কাছ থেকে তেরো-চৌদ্দ পা দূরে সরে যান। বোমার সঙ্গে একটি দড়ি বা তার লাগানো ছিলো। তিনি দেখলেন, বোমা থেকে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হচ্ছে। যখন বোমা-বিস্ফোরণ ঘটেছিলো, যে-লোকটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে বোমায় আগুন ধরিয়েছিলো সে তখন তাঁর কাছ থেকে পাঁচ-ছ' পা দূরে দাঁড়িয়েছিলো।

বোমাবিস্ফোরণ হবামাত্র প্রার্থনা সভা থেকে বহু লোক সেখানে ছুটে আসেন। তিনজন লোক আসে দেয়াল ডিঙিয়ে। তাদের

একজন ভূর সিং, একজন রাইফেলধারী সিপাই, আর-একজন সৈন্য-বাহিনীর লোক। তারা এসেই সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করে যে, কি হয়েছে। ঐ তিনজনেই সেখানে সর্ব্বপ্রথম এসেছিলো। সাক্ষী তাদের বলেন যে, তাঁর পিছনে যে-লোকটি দাঁড়িয়ে আছে সে-ই সেখানে বোমা রেখে বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। তৎক্ষণাৎ ধরে ফেলা হয় তাকে।

যে-লোকটি বোমা রেখেছিলো ও তাতে আগুন ধরিয়েছিলো, সাক্ষী তাকে সনাক্ত করতে পারেন কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী আসামীর কাঠগড়ার দিকে এগিয়ে গিয়ে মদনলালকে দেখিয়ে বলেন, *ঐ ব্যক্তিই বোমায় আগুন দিয়েছিলো।*

রাজসাক্ষী বাদগে, নাথুরাম গড্‌সে, ও আপ্তেকে সনাক্ত করে সাক্ষী বলেন, ঐ তিনজনই গাড়ি করে বিড়লা ভবনে এসেছিলেন এবং মদনলালের সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

দিল্লী ডিস্ট্রিক্ট জেলে নাথুরাম ও আপ্তেকে এবং বোম্বাইয়ে বাদগেকে সনাক্ত করেছিলেন তিনি। আদালত-প্রাঙ্গণে একটি গাড়িকেও তিনি সনাক্ত করেন এই বলে যে, বিস্ফোরোণের দিনে ঐ গাড়িটিকে দেখেছিলেন তিনি।

সাক্ষী কথা কইছিলেন পাঞ্জাবীতে। তাঁর উত্তর যথারীতি ভাষান্তরকরণে কিছু অসুবিধা হচ্ছিলো।

এর মাঝে একটি কাণ্ড হলো। শ্রীযুত দফ্‌তরি যখন সুলোচনা দেবীর জবানবন্দী গ্রহণ করছিলেন, মদনলাল তখন তাঁর আসন থেকে উঠে বিচারপতিকে বললেন: পুলিশ আমাকে আপনার সঙ্গে কথা বলতে দিচ্ছে না।

আসামীদের-চতুর্দ্দিকে-উপবিষ্ট পুলিশ-কর্ম্মচারীদের দিকে তাকিয়ে বিচারপতি বলেন: উনি যখন আমার কাছে কিছু বলতে চান, ওঁকে বাধা দেবেন না।

সাক্ষীর জবানবন্দী শেষ হলে মদনলালের পক্ষের কৌঁসুলি শ্রীযুত ব্যানার্জি আদালতকে জানালেন: মদনলাল যখন বলেছিলেন যে, দোভাষী ঠিকমতো তাঁর কাজ করছেন না, জনৈক পুলিশ-কর্ম্মকর্ত্তা তাঁকে তখন ভয় দেখিয়ে ধমক দেন, "চুপ করো, নতুবা তোমার শাস্তির ব্যবস্থা করবো।"

বিচারপতি: এ-কথা যে আপনি আমাকে জানিয়েছেন সেজন্যে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এ-সম্পর্কে যথোচিত ব্যবস্থা করবো আমি।

আসামী নাথুরামের পক্ষের কৌঁসুলি শ্রীযুত ওক-এর জেরার উত্তরে সুলোচনা দেবী বলেন যে, বিড়লা ভবনের পশ্চাতে যেখানে বোমা-বিস্ফোরণ ঘটে সেখানে বেশি লোকের যাতায়াত নেই, সামান্য কয়েকজনই সেদিক দিয়ে যাওয়া-আসা করে। সাধারণত কোনো গাড়িই সেখানে দাঁড়ায় না, তাই গাড়িখানা তাঁর চোখে পড়েছিলো। বোমা-বিস্ফোরণের অত্যল্পকালমধ্যে সেইদিনই পুলিশ তাঁর বিবৃতি গ্রহণ করে। এক ব্যক্তিকে একটি দড়ি বা তারে আগুন লাগাতে তিনি দেখেছিলেন বটে কিন্তু তা বোমার সঙ্গে যুক্ত ছিলো কি না, তিনি জানেন না। তা ছাড়া, পদার্থটি যে বোমা, তাও তখন তিনি বুঝেন নি।

১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারির আগে নাথুরাম গড্‌সেকে সাক্ষী দেখেন নি। তাঁকে সনাক্ত করবার সময় প্যারেডে সর্ব্বশুদ্ধ লোক ছিলো প্রায় পনেরো জন। নাথুরাম ছিলেন সাধারণ পোষাকে।

আসামীর মাথায় কোনো ব্যাণ্ডেজ তিনি দেখেছিলেন কি না, জিজ্ঞাসা করলে সাক্ষী বলেন যে, কোনো ব্যাণ্ডেজ তিনি দেখেন নি। তবে তাঁর মাথায় একটি তোয়ালে জড়ানো ছিলো।

শ্রীযুত মঙ্গলে সাক্ষীকে জেরাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন: আপনি যখন আপনার ছেলেকে আনতে গিয়েছিলেন তখন সে বলেছিলো, 'মা, আমি যাবো না',—এ কথা কি ঠিক?

সাক্ষী : না, আমার ছেলে ও-কথা বলেনি। কারণ সে আজো কথা কইতেই শেখে নি।

সাক্ষী বলেন, প্রায় বিশ-পঁচিশ মিনিট ধরে তিনি গাড়িখানা দেখেছিলেন। গাড়ি থেকে আরোহীদের নেমে আসতে প্রায় পাঁচ মিনিট লেগেছিলো। তাঁদের পোষাক সম্বন্ধে তিনি কিছু বলতে পারেন না।

শ্রীযুত ব্যানার্জির প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, ঐ স্থানে বহু ভৃত্য বাস করে বটে, কিন্তু সেই বিশেষ সময়ে শুধু ছোটুরাম ও ফুলসিং এই দু'জনেই তাদের আবাসগৃহের বাইরে বসেছিলো। লোকগুলি গাড়ি থেকে নেমে আরো দু'-তিনজন লোকের সঙ্গে কথা বলেছিলো, পুলিশের কাছে এ-কথা তিনি বলেছিলেন কি না, তা তাঁর মনে নেই। জনৈক শিখ-দারোগা তাঁর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। বোমাবিস্ফোরণকালে তিনি দৌড়ে পালিয়ে যান নি।

শ্রীযুত ব্যানার্জি : বোমাবিস্ফোরণ দেখে আপনি ভীতা হন নি, এই বা কেমন কথা?

সাক্ষী : বোমাবিস্ফোরণের আগে তো আমি জানতাম না যে, ঐ পদার্থটিই বোমা। আর বোমাবিস্ফোরণ যখন হয়েই গেলো, বিপদের কারণ আর রইলো না কিছুই।

সাক্ষী আরো বলেন যে, বিস্ফোরণের পর মদনলাল সরে যান নি। এমন কি ফুল সিং ও কনেস্টবল ঘটনাস্থলে আসবার পরেও তিনি পালান নি।

আসামী শঙ্কর কিস্তায়ার কৌঁসুলি শ্রীযুত মেহ্‌তার জেরার উত্তরে সুলোচনা দেবী বলেন, এর আগে জীবনে তিনি কখনো 'বোমা' দেখেন নি। ২০শে জানুয়ারি তারিখে যে-বস্তুটিতে আগুন লাগানো হয় সেটির আকার ছিলো একটি ইটের মতো, আয়তন ৯'' × ৪'' × ২'' এবং রং ছিলো শাদা। বিস্ফোরণের পর গাড়ির আরোহীদের আর তিনি

দেখতে পান নি। নিরক্ষর বলে গাড়ির নম্বর পড়তে পারেন নি তিনি। তবে গাড়ির রং দেখে এবং উপকার মালবাহী "ক্যারিয়ার" দেখে তিনি সেটিকে সনাক্ত করেছেন। গাড়ির উপরে এরূপ মালবাহী "ক্যারিয়ার" দিল্লীর আর অন্য-কোনো গাড়িতে নেই।

সাক্ষীর জেরা শেষ হলে শ্রীযুত দফ্‌তরি আদালতকে বলেন, জেরার সময় বলা হয়েছে যে, ঐ বিস্ফোরক পদার্থটি হয়তো একটি হাতবোমা (cracker), নয়তো এমন একটা কিছু যা মোটেই ক্ষতিকর নয়। বিস্ফোরণের ফলে তাই ক্ষতি হয় নি কিছু। বিস্ফোরণের ফলে কোনো ক্ষতি হয়েছে কি না, সাক্ষীকে সে-কথা তিনি জিজ্ঞাসা করতে চান।

বিচারপতি বলেন যে, তিনি নিজেই তা সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করবেন।

আদালতের প্রশ্নের উত্তরে সুলোচনা দেবী জানান যে, বিস্ফোরণের ফলে দেয়ালে একটি গর্ত হয়ে যায় এবং দেয়াল থেকে কয়েকখানা ইট খসে পড়ে।

পনেরো

ফটোর জন্যে ঘুষ

এ পর্যন্ত এই মামলায় সরকারপক্ষে সাক্ষ্য দিয়েছেন পনেরো জন। ষোড়শ সাক্ষীর নাম ছোটুরাম। বিড়লা ভবনের মোটর-চালক সে। বিড়লা ভবনের পশ্চাতে ভৃত্যাবাসেই সে থাকে।

ছোটুরাম তার সাক্ষ্যে বলে যে, বোমাবিস্ফোরণের অল্প কিছুক্ষণ আগে ভৃত্যাবাসের বাইরে একটু দূরে একখানি তক্তার উপর সে বসেছিলো। তার নিকটেই দাঁড়িয়েছিলো চৌকিদার ভূর সিং।

বিড়লা ভবনের পশ্চাদ্দিকে যে-প্রকাণ্ড খোলা জায়গা রয়েছে, সাক্ষী দেখে, কয়েকজন লোক একটি গাড়িতে চড়ে সেইদিকে আসছে। রাস্তার বাঁপাশে এসে গাড়িখানি দাঁড়ায়। চারজন লোক সে-গাড়ি থেকে নামেন। তখন আরো তিন-চারজনের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। সেখান থেকে তাঁরা তার বাসগৃহের দিকে অগ্রসর হন। তিনজন বাড়ির ফটকে দাঁড়িয়ে থাকেন এবং একজন তার দিকে এগিয়ে এসে তার সঙ্গে কথা বলতে সুরু করেন। মহাত্মা গান্ধীর একটি ফটো লওয়া যায় কি না, লোকটি তাকে সেই কথা জিজ্ঞাসা করেন। সাক্ষী তাঁকে প্রার্থনা সভায় গিয়ে সেখান থেকে ফটো নিতে বলে। লোকটি তখন বলেন যে, তিনি জাফরির ফাঁক দিয়ে ফটো তুলতে চান; এবং তাঁকে (লোকটিকে) সেই সুযোগ দেওয়ার জন্যে সাক্ষীকে তিনি কিছু টাকাও দিতে চান। সাক্ষী তাঁকে বলে যে, টাকার প্রয়োজন নেই তার।

লোকটির সঙ্গে কোনো ক্যামেরা না দেখে ছোটুরাম তাঁকে জিজ্ঞাসা করে যে, তাঁর ক্যামেরা কোথায়? তাঁর সঙ্গে শুধু একটি খাকি কাপড়ের ব্যাগ ছিলো। মনে হচ্ছিলো, তার ভেতর ভারী একটা কিছু আছে। লোকটি সাক্ষীকে বলেন যে, গাড়ির ভেতর থেকে ক্যামেরা নিয়ে আসবেন তিনি। তারপর, তিনজন লোক যে-গেটে দাঁড়িয়েছিলেন লোকটি সেদিকে চলে যান। যেখানে বোমাবিস্ফোরণ হয়েছিলো একজন চলে যান সেইদিকে। তার তিন-চার মিনিট পরেই সাক্ষী শুনতে পায় বিস্ফোরণের আওয়াজ।

চৌকিদার ভূর সিং, একজন কনেস্টবল ও একজন সৈন্যবাহিনীর লোক দেওয়াল ডিঙিয়ে বোমাবিস্ফোরণের স্থানে লাফিয়ে পড়ে। সাক্ষীও ছুটে যায় সেখানে। যে-ক'জন লোক ফটকের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা দ্রুতগতিতে গাড়ির দিকে চলে যান।

সুলোচনা দেবী নাম্নী জনৈকা মহিলা একজন লোককে দেখিয়ে বলেন যে, ঐ ব্যক্তিই একটা কিছু রেখে তাতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। ভূর সিং ঐ লোকটিকে ধরে বিড়লা ভবনের দিকে পুলিশ-তাঁবুতে নিয়ে যায়। সাক্ষীও গিয়েছিলো সেখানে। জনৈক দারোগা ধৃত ব্যক্তির দেহ তল্লাস করেন, ফলে তাঁর কাছে পাওয়া যায় একটি তাজা বোমা।

মদনলাল পাওয়াকে দেখিয়ে সাক্ষী তারপর বললে যে, ঐ লোকটিকেই সুলোচনা দেবী বোমাবিস্ফোরণকারী বলে তাকে দেখিয়েছিলেন। করকারেকেও দেখিয়ে সাক্ষী বলে যে, ঐ ব্যক্তিই তার কাছে মহাত্মা গান্ধীর ফটো নেবার কথা বলেছিলেন। নাথুরাম গড্‌সে ও নারায়ণ আপ্তেকে দেখিয়ে সে বলে যে, অন্যান্যের সঙ্গে ঐ দু'জনকেও ভৃত্যাবাসের দিকে যেতে দেখেছিলো সে।

বোমাবিস্ফোরণের ফলে কোনো ক্ষতি হয়েছিলো কি না জিজ্ঞাসা করা হলে সাক্ষী উত্তর করে যে, বিস্ফোরণের ফলে দেয়ালের কয়েকখানা ইট টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে খসে পড়েছিলো।

শ্রীযুত ডাঙ্গের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে যে, মাঝে মাঝে সে মহাত্মার প্রার্থনা সভায় যোগদান করতো। সেখানে বহু লোক আসতেন গান্ধীজীকে দর্শন করতে। কেউ-কেউ তাঁর ফটো নিতেও আসতেন।

ভৃত্যাবাসের কাছে মোটর-গ্যারেজ আছে তিনটি। বিস্ফোরণের দিন গ্যারেজের আশেপাশে কোনো মেরামতি কাজ হয় নি। শুধু অতিথি-ভবনের পেছন দিকে কিছু মেরামতি কাজ হচ্ছিলো। গ্যারেজের ভেতর 'ইলেক্‌ট্রিক্ ফিটিং' ছিলো, কিন্তু বিস্ফোরণের দিনে সেই ফিটিং খারাপ হয়ে গিয়েছিলো। একজন মিস্ত্রি দশ-পনেরো মিনিট ধরে লাউড স্পীকার ঠিক করতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি।

সাক্ষী বলে, সে যে-স্থানে তক্তার উপর বসেছিলো সেখান থেকে গাড়িতে-উপবিষ্ট লোকদের মুখ সে দেখতে পাচ্ছিলো না। যে-লোকটি

মহাত্মার ফটো নেবার কথা সেদিন তাকে বলেছিলেন তাঁর পরিধানে কি-পোষাক ছিলো, তা সে বলতে পারে না। ঐ ব্যক্তি সাক্ষীকে পাঁচ-দশ টাকা ঘুষ দিতে চেয়েছিলেন।

প্রশ্ন : টাকা দিতে চাওয়ায় তোমার মনে নিশ্চয়ই সন্দেহ জেগেছিলো?

উত্তর : ঐ লোকটি টাকা দিতে চেয়েছিলেন বলে আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়।

প্রশ্ন : তোমার মনে সন্দেহের উদ্রেক হওয়া সত্ত্বেও কেন তুমি তাঁদের তাড়িয়ে দাও নি?

উত্তর : তাঁদের তাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা আমার ছিলো না।

প্রশ্ন : যোগ্য-স্থানে বিষয়টি তুমি জানিয়েছিলে কি?

উত্তর : জানাবার সময় আমি পাই নি, কারণ তার অব্যবহিত পরেই বিস্ফোরণ হয়।

প্রশ্ন : বিস্ফোরণের পর বিস্ফোরণ-স্থানে কতো লোক জমায়েৎ হয়েছিলো?

উত্তর : পনেরো-কুড়িজন।

প্রশ্ন : তুমি যেখানে বসেছিলে সেখান থেকে সেদিন প্রার্থনা শুনতে পাচ্ছিলে কি?

উত্তর : আমি 'রামধুন' শুনতে পাচ্ছিলাম। যে-সমস্ত মহিলা সাধারণত গান্ধীজীর সঙ্গে থাকতেন তাঁরাই গাইছিলেন।

প্রশ্ন : তুমি যেখানে বসেছিলে সেখান থেকে প্রার্থনা-স্থান কতো দূরে?

উত্তর : একশো-দেড়শো পা।

প্রশ্ন : বোমাবিস্ফোরণের পরে তুমি আবাসস্থানেই ছিলে?

উত্তর : যেখানে বোমা ফাটে সেখানেই আমি গিয়েছিলাম; ঘরে ফিরি নি।

প্রশ্ন : ৩০শে জানুয়ারি প্রার্থনা সভায় যাবার আগে তুমি কোথায় ছিলে।

উত্তর: শাকশব্জী কিনতে বাজারে গিয়েছিলাম। ফিরে এসেই শুনলাম, গান্ধীজী নিহত। তখন আমি প্রার্থনা সভায় যাই।

তারপর শ্রীযুত ব্যানার্জির জেরার উত্তরে সাক্ষী বলে, প্রার্থনা সভার কাজ সাধারণত বিকেল পাঁচটায় আরম্ভ হয়ে সাড়ে পাঁচটায় শেষ হতো। তখন ছিলো শীতকাল, কাজেই ৫—১৫ মিনিটে অন্ধকার হয়ে যেতো। বিড়লা ভবনের পেছন দিকের সার্ভিস রোডে কোনোরূপ আলোর ব্যবস্থা ছিলো না।

শ্রীযুত ব্যানার্জি: যখন তুমি গাড়িখানি দেখেছিলে তখন গীতাপাঠ এবং সমবেত সঙ্গীত শেষ হয়ে গিয়েছিলো?

সাক্ষী: না।

প্রশ্ন: মহাত্মা গান্ধী, প্রার্থনা আরম্ভ হবার বিশ মিনিটের মধ্যেই 'রামধুন' সমাপ্ত করতেন, তুমি জানো?

উত্তর: আমার নিকট ঘড়ি ছিলো না। কিন্তু প্রার্থনা সাধারণত আধ ঘণ্টার মধ্যেই শেষ হতো।

প্রশ্ন: তুমি কি বলতে চাও যে, তুমি যখন গাড়িখানি দেখেছিলে তখন 'রামধুন' আরম্ভ হয়ে গেছে?

এই সময়ে শ্রীযুত ব্যানার্জিকে লক্ষ্য করে আদালত বলেন 'রামধুন' শেষ হয়েছিলো কি না, ইহাই আপনার প্রশ্ন। তার উত্তর— 'রামধুন' সমাপ্ত হয় নি। তার অর্থ এই নয় যে, 'রামধুন' তখন আরম্ভ হয়েছে। আপনি আমার কথা বুঝতে পেরেছেন কি?

শ্রীযুত ব্যানার্জি: হ্যাঁ।

অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলে যে, বোম্বাইয়ে সে তিনজন লোককে সনাক্ত করেছিলো, তাঁদের মধ্যে একজনের দাড়ি ছিলো।

রাজসাক্ষী বাদগেকে তখন আদালতে আনা হলো। শ্রীযুত ব্যানার্জির একটি প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বললে, বোম্বাইয়ে যে-দাড়িওয়ালা

ব্যক্তিকে সে সনাক্ত করেছিলো এই ব্যক্তিই ঠিক সেই ব্যক্তি কি না, তা সে নিশ্চয় করে বলতে পারে না।

বিচারপতি তখন তাকে আসামীদের কাঠগড়ার দিকে গিয়ে উক্ত লোকটিকে আর-একবার দেখতে বলেন। লোকটিকে পুনরায় দেখে সাক্ষী উত্তর করলো, বোম্বাইয়ে যাঁকে সে সনাক্ত করেছিলো শ্রীযুত বাদগেকে তাঁরই মতো দেখাচ্ছে বটে, কিন্তু বাদগেই সেই সনাক্তকৃত ব্যক্তি নন।

শঙ্কর কিস্তায়ার পক্ষের কৌঁসুলি শ্রীযুত মেহ্‌তার জেরার উত্তরে সাক্ষী বলে, শঙ্কর গাড়িতে করে বিড়লা ভবনে এসেছিলেন কি না, তা সে বলতে পারে না। ভৃত্যাবাসের সুমুখে শঙ্করকে সে ঘোরাফেরা করতে দেখেছিলো।

এর পরের সাক্ষীর নাম ভূর সিং। বিড়লা ভবনের চৌকিদার সে। সে বলে, বোমাবিস্ফোরণের দিন প্রার্থনা আরম্ভ হবার আগে সে ভৃত্যাবাসের সুমুখে দাঁড়িয়েছিলো। ছোটুরাম তার কাছেই তিন-চার পা দূরে তার ঘরের সামনে একটি তক্তার উপর বসেছিলো। প্রাঙ্গণ-প্রাচীরের বাইরের দিকে খোলা জায়গায় একটি সবুজ রংয়ের মোটর গাড়িকে সে দাঁড়াতে দেখে। সেই গাড়ির মাথায় মালবহনের 'ক্যারিয়ার' ছিলো। গাড়িটি হয়তো ফটক দিয়ে প্রাঙ্গণের ভেতর প্রবেশ করবে, এই ভেবে সে গাড়িকে থামতে বলবে বলে স্থির করলে। গাড়িটি তখন বাঁদিকে ঘুরে ২২ নম্বর বাড়ির দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেলো। বোধ করি, জন তিন-চার লোক গাড়ি থেকে নাবলো। দু'তিনজন লোক খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলো। তার সুমুখ দিয়ে লোকগুলি চলে গেলো প্রার্থনা সভার দিকে। প্রায় পাঁচ মিনিট পরে তাদের মধ্যে তিন-চারজন ফিরে এলো। তিনজন লোক গেলো ফটকের দিকে, আর একজন ছোটুরামের কাছে।

যে-লোকটি ছোট্টুরামের কাছে এসেছিলো সে এসে জিজ্ঞাসা করলে, ছোট্টুরামের ঘরের ভেতর থেকে মহাত্মা গান্ধীর কোনো ফটো নেওয়া যেতে পারে কি না। তার প্রস্তাবে ছোট্টুরাম রাজী হয় নি। সেই লোকটি তারপর চলে যায়। তার হাতে ছিলো একটি ব্যাগ।

তারপরেই সাক্ষী 'ইউনিফর্ম' পরবার জন্যে নিজের ঘরে চলে যায়। কারণ, সন্ধ্যা ছ'টা থেকে 'ডিউটি' ছিলো তার। কয়েক মিনিট পর সে যায় প্রার্থনা সভায়।

বোমাবিস্ফোরণের শব্দ শুনে সে ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। সেখানে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে সুলোচনা দেবী সাক্ষীকে বলেন যে, সেই লোকটিই বোমায় আগুন দিয়েছে। সাক্ষী ও পুলিশ-কনেস্টবল তখন সেই লোকটিকে গ্রেফ্‌তার করে। তারপর সেই লোকটির দেহ তল্লাস করে একটি হাতবোমা পাওয়া যায়।

মদনলালকে দেখিয়ে সাক্ষী বলে যে, ঐ লোকটিকেই সেদিন সে ধরেছিলো। বাদগে, নাথুরাম, মদনলাল, আপ্তে ও করকারেকে দেখিয়ে সে বলে যে, ঐ লোকগুলিই বোমাবিস্ফোরণের দিন একসঙ্গে ঘোরাফেরা করেছিলো।

বোমাবিস্ফোরণের পর সে ছুটিতে ছিলো। মহাত্মা গান্ধী নিহত হবার দু'-তিন দিন পরে সে গিয়েছিলো জয়পুর রাজ্যে—নিজের বাড়ীতে। দশদিন বাদে সে ফিরে আসে।

১৫ই জুলাই তারিখে ভূর সিংয়ের বাকি জেরা শেষ হয়।

সেদিন শ্রীযুত ব্যানার্জির জেরার উত্তরে সাক্ষী বলে যে, বিস্ফোরণের দিন তার 'ডিউটি' ছিলো সকাল ছ'টা থেকে বেলা বারোটা ও পরে সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত বারোটা পর্য্যন্ত। সেদিন সে প্রার্থনা সভায় গিয়েছিলো —১০ মিনিটের সময়। বিস্ফোরণের পরেও প্রার্থনা সভার কাজ চলছিলো। ভৃত্যাবাসের সুমুখে যাদের সে ঘোরাফেরা করতে

দেখেছিলো তাদের বিরুদ্ধে পুলিশে কোনো রিপোর্ট সে করে নি; কারণ তাদের উপর কোনো সন্দেহ হয় নি তার।

গ্রেফ্‌তারের সময় মদনলাল কোনোরূপ বাধা দেয় নি। সে শুধু বলে যে, বোমাটি সে ওখানে রাখে নি।

ষোলো

পিস্তল-পরীক্ষা

ভূর সিংয়ের পরবর্ত্তী সাক্ষী হলেন শ্রীযুত কে. এন. সাহনী। একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট তিনি।

কৌঁসুলি শ্রীযুত দফ্‌তরির প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত সাহনী বললেন: ১০ই জানুয়ারি তারিখে এক সাঙ্ঘাতিক মোটর দুর্ঘটনায় আমার স্ত্রী মারা যান, আমিও আহত হই ভীষণভাবে। মহাত্মা গান্ধী আমাকে এক সান্ত্বনা-বাণী পাঠান এবং আমাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বলেন। এই জন্যেই ২০শে জানুয়ারি বিকেল পাঁচটায় আমি বিড়লা ভবনে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন: তিনি বলেন যে, প্রথমেই তিনি যান প্রার্থনা সভায়। কারণ তিনি ভেবেছিলেন যে, প্রার্থনা শেষ হবার পরেই তিনি দেখা করবেন মহাত্মার সঙ্গে। তখন সবেমাত্র প্রার্থনা আরম্ভ হয়েছে। সভামঞ্চের ডান দিকের সিঁড়ির নিকট মহাত্মার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি।

গান্ধীজী তাঁর বক্তৃতা আরম্ভ করবার একটু পরেই তিনি শুনতে পান এক ভীষণ বিস্ফোরণের শব্দ। লাউডস্পীকারগুলি সেদিন ভালো কাজ করছিলো না। মনে হলো, সীমা-প্রাচীরের ডানদিক থেকেই যেন

ভেসে এলো আওয়াজটা। সেইদিকে ছুটে গেলেন তিনি। দেখলেন, ভৃত্যাবাস ও সীমা-প্রাচীরের কোণের দিক থেকে ধোঁয়া বেরোচ্ছে। দেয়ালের একটা স্থান ভেঙে গেছে।

শ্রীযুত মঙ্গলের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারির মধ্যে তিনি বার চার-পাঁচ বিড়লা ভবনে গিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : কেন আপনি বিড়লা ভবনে যেতেন, জানতে পারি?

উত্তর : শরণাগতদের জন্যে সাহায্য চাইতেই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতাম।

প্রশ্ন : আচ্ছা, ঐ চার-পাঁচবারই কি আপনি মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়েছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

প্রকাশ্যভাবে কোরাণপাঠসম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে কোনো আন্দোলন চলছিলো বলে সাক্ষী জানেন কি না, শ্রীযুত ডাঙ্গে এই প্রশ্ন করেন। সাক্ষী উত্তরে বললেন যে, জনসাধারণের মধ্যে আন্দোলন চলছিলো কি না, তিনি বলতে পারেন না। সম্ভবত ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসের এক সভায় উপস্থিত ছিলেন তিনি। সে-সভায় পাঁচ-ছ'জন লোক আপত্তি জানিয়েছিলো কোরাণ পাঠে। কিন্তু সমবেত অন্যান্য লোকেরা চীৎকার করে থামিয়ে দিয়েছিলো তাদের।

শ্রীযুত ডাঙ্গে : আপনি 'রিফিউজি' শব্দের অর্থ জানেন?

শ্রীযুত সাহনী : আমি কুরুক্ষেত্র-আশ্রয়প্রার্থী-শিবিরের কম্যাণ্ডাণ্ট ছিলাম।

প্রশ্ন : আশ্রয়প্রার্থীরাই কোরাণ পাঠে আপত্তি করেছিলো, আপনি জানেন?

উত্তর : আমি নিজে তা মনে করি না।

প্রশ্ন : মহাত্মা গান্ধীকে আপনি কতোদিন ধরে জানতেন ?

উত্তর : এক বছরেরও বেশি।

প্রশ্ন : মহাত্মা গান্ধী কোরাণ ও বাইবেল পাঠ পছন্দ করতেন ?

উত্তর : তাঁর বক্তৃতা ও প্রবন্ধ থেকে তো তাই মনে হয়।

প্রশ্ন : মহাত্মা গান্ধী ভারত-বিভাগের বিরোধী ছিলেন ?

উত্তর : মহাত্মা গান্ধী প্রথমে ভারত-বিভাগের বিরোধী ছিলেন। পরে তিনি তা সমর্থন করেছিলেন কি না, আমি জানি না। ব্যক্তি-গতভাবে আমি ভারত-বিভাগের বিরোধী।

প্রশ্ন : মহাত্মা গান্ধী 'করিম' ও 'রহিম'কে হিন্দু-দেবদেবীর সঙ্গে মেলাতে চেয়েছিলেন, আপনি জানেন ?

শ্রীযুত দফ্‌তরি : 'করিম' ও 'রহিম' ভগবানের গুণ মাত্র।

সাক্ষী : হিন্দু-দেবদেবীর সঙ্গে 'করিম' ও 'রহিম'কে মিলিয়ে প্রার্থনা সভায় গীত হতে কয়েকবার আমি শুনেছি।

প্রশ্ন : হিন্দুদের এতে তীব্র আপত্তি ছিলো, আপনি জানতেন ?

উত্তর : এতে কেউ আপত্তি করে নি।

শ্রীযুত সাহনী আরো বলেন যে, প্রার্থনা সভার পর ছ'টা থেকে সাড়ে ছ'টা পর্য্যন্ত তিনি মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গেই ছিলেন। বোমাবিস্ফোরণ নিয়ে মহাত্মার সঙ্গে তিনি কোনো আলোচনা করেন নি। মহাত্মা গান্ধী মদনলালকে দেখবার কোনো ইচ্ছাও প্রকাশ করেন নি। বোমা-বিস্ফোরণের পর জনতার মধ্যে কিছু উত্তেজনা দেখা দেয়। তা ছাড়া সব কিছুই ছিলো শান্ত। প্রার্থনার কাজও চলছিলো। বিস্ফোরণের ফলে কেউ আহত হন নি।

শ্রীযুত ব্যানার্জির জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন, প্রার্থনা সভার কাজ শেষ হতে সাধারণত আধ ঘণ্টা লাগতো। বিড়লা ভবনের ফটকে আলো আছে। ফটকের নিকট রাস্তায় আলো আছে কি না, তিনি বলতে পারেন না।

শ্রীযুত ব্যানার্জি: গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্যে যখন আপনি বিড়লা ভবনে প্রবেশ করেন তখন কোনো আলো জ্বলছিলো দেখেছিলেন কি?

উত্তর: গৃহাভ্যন্তরে তখন কোনো আলো ছিলো কি না, বলতে পারি না।

৫ই জুলাইয়ের শুনানি স্থরু হবার আগে শ্রীযুত ব্যানার্জি আদালতে একটি আবেদনপত্র দাখিল করেন। তাতে তিনি বলেন যে, গত সপ্তাহে স্থলোচনা দেবী সাক্ষ্য দিয়েছিলেন; তাঁকে আরো সাক্ষ্য দেবার জন্যে আবার ডাকা হোক। স্থলোচনা দেবীর এই-আদালতের সাক্ষ্য ও পূর্ব্ববর্ত্তী সনাক্তকরণ প্যারেডের বিবৃতির মধ্যে কিছু বিরুদ্ধ-উক্তি রয়েছে, এই জন্যেই পুনরায় এই আদালতের স্থমুখে তাঁর উপস্থিতির প্রয়োজন। তাঁর এই আবেদনপত্র মঞ্জুর করতে পারবেন না বলেই আদালত তাঁকে জানিয়ে দেন।

৬ই জুলাই তারিখে প্রথমে সাক্ষ্য দেন শ্রীযুত রামপ্রকাশ,—দিল্লীর ফ্রন্টিয়ার হিন্দু হোটেলের ম্যানেজার।

বিষ্ণু করকারে ও গোপাল গড্সেকে দেখিয়ে তিনি বলেন যে, ১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারি তারিখে ঐ দুই ব্যক্তিই জি. এম. যোশী ও গোপালম্ নামে তাঁর হোটেলে বাস করেছিলেন।

হোটেলে যাঁরা এসে বাস করেন তাঁদের জন্যে একটি রেজিস্টারি বই রক্ষিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারি তারিখে গোপালম্ নামে এক ব্যক্তি ঐ হোটেলে ছিলেন। রেজিস্টারি বইয়ের প্রথম কয়েক স্তম্ভ সাক্ষীর নিজের হাতের লেখা। শেষ স্তম্ভে যে-স্বাক্ষর রয়েছে সেটি, যিনি হোটেলে ছিলেন, তাঁরই হাতের লেখা। আগন্তুকেরা যে-সংবাদ দেন তদনুযায়ী স্তম্ভ পূরণ করা হয় রেজিস্টারি বইয়ের।

ঐদিনই জি. এম. যোশী নামে আরো-এক ব্যক্তি তাঁর হোটেলের ২ নম্বর ঘরে ছিলেন।

শ্রীযুত দফ্‌তরি সাক্ষীকে যখন জিজ্ঞাসা করেন যে, রেজিস্টারি বইয়ে উপস্থিতির যে-সময় লেখা হয়েছে তা ঘড়ি ধরে লেখা, না আন্দাজ করে লেখা, তখন শ্রীযুত ডাঙ্গে তাঁর সেই প্রশ্নে আপত্তি জানান।

আদালত বলেন যে, ঐ দু'জনের নাম কখন রেজিস্টারি বইয়ে লেখা হয়েছিলো, সরকারপক্ষের কৌঁসুলি তা জিজ্ঞাসা করেন নি। রেজিস্টারিতে উপস্থিতির সঠিক-সময় না কাছাকাছি-সময় লেখা হয়েছে, তাই তাঁর জিজ্ঞাস্য।

যাই হোক, সাক্ষী বলেন যে, রেজিস্টারিতে কাছাকাছি-সময়ই লেখা হয়েছে। হোটেল-ত্যাগের সময়-লেখবার বেলায় কিন্তু যথাযথ সময়ই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

শ্রীযুত মনিয়ারের জেরার উত্তরে তিনি বলেন যে, গোপাল গড্‌সে যখন হোটেল ত্যাগ করেন তখন তিনি হোটেলে উপস্থিত ছিলেন না।

সেদিনকার দ্বিতীয় সাক্ষীর নাম শ্রীযুত চমনলাল গ্রোভার। লোদি কলোনির একটি রেস্তোরাঁর মালিক তিনি।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পুলিশ এসে তাঁকে তোঘলক রোড থানায় নিয়ে যায়। সেখানে হাজত হতে এক ব্যক্তিকে তাঁর সুমুখে আনা হয়। সেই লোকটি বলে যে, হিন্দু মহাসভা ভবনের পেছন দিকে যেখানে কিছু বোমা, কার্তুজ ইত্যাদি মাটির তলায় পোঁতা আছে সেই জায়গাটি সে দেখিয়ে দেবে। পুলিশ তারপর তাঁদের দু'টি গাড়িতে করে রিডিং রোডে হিন্দু মহাসভা ভবনে নিয়ে যায়। বেলা ন'টার পর সাক্ষীকে থানায় ডাকা হয়েছিলো।

শঙ্কর কিস্তায়াকে দেখিয়ে সাক্ষী বলেন যে, হিন্দু মহাসভা ভবনে এই লোকটিকেই গাড়িতে করে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। শঙ্কর তাঁদের নিয়ে

গিয়েছিলেন হিন্দু মহাসভা ভবনের পিছন দিকে। সেখানে ভৃত্যাবাসের নিকটে প্রাচীরের পশ্চাতে একটি স্থান দেখিয়ে বলেন যে, এখানেই কার্ত্তুজ ইত্যাদি লুকানো রয়েছে।

পুলিশ-কর্ম্মকর্ত্তা তাঁকে জায়গাটি খুঁড়তে বলেন। শঙ্কর সেই স্থানটি খুঁড়ে একটি হাতবোমা বের করেন। প্রাপ্ত দ্রব্যগুলি পুলিশ বিভিন্ন বাণ্ডিলে "সীল" করে রেখেছিলেন। যে-পাঁচটি কার্ত্তুজ ও অন্যান্য দ্রব্য উদ্ধার করা হয়েছিলো আদালতে সেগুলো প্রদর্শিত হয়।

সাক্ষী আরো বলেন যে, পরে শঙ্করকে অন্য হাতবোমা দু'টির কথা জিজ্ঞাসা করা হয়। শঙ্কর তখন তাঁদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ গজ দূরে নিয়ে যান। একটি পাথরের নীচে দু'টি হাতবোমা লুকানো ছিলো সেখানে। পাথর সরিয়ে শঙ্কর নিজেই হাতবোমা দু'টি বের করে আনেন।

প্রাপ্ত দ্রব্যগুলির সম্পর্কে যে দু'টি স্মারকলিপি (memo) তৈরি করা হয়েছিলো, আদালতে সেগুলো প্রদর্শিত হয়; সাক্ষীও সেগুলোকে সনাক্ত করেন। যে-স্থানে জিনিষগুলি পাওয়া গিয়েছিলো, জিনিষগুলি পাবার সময়েই সেই স্থানের একটি খড়সা নক্‌সা করা হয়েছিলো, সাক্ষী সেই নক্‌সাটিও সনাক্ত করেন।

উক্ত ঘটনার পরে আর-একদিন বেলা দু'টোর সময় তোঘলক রোড থানায় আবার তাঁর ডাক পড়ে। সেদিন হাজত থেকে দু'জন লোককে আনা হয়। করকারেকে ও আপ্তেকে দেখিয়ে তিনি বলেন যে, ঐ দু'জনকেই সেদিন 'সেল' থেকে আনা হয়েছিলো। আপ্তে তাঁদের বলেছিলেন যে, এক জায়গায় একটি গাছে গুলী ছুড়ে একটি পিস্তল পরীক্ষা করা হয়েছিলো, তিনি তাঁদের সেই জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন।

তাঁরা হিন্দু মহাসভা ভবনের প্রাঙ্গণ পার হয়ে গাড়ি থেকে নেমে পড়েন। আপ্তে তাঁদের একটি শুষ্ক নালা পার হতে বলেন। তারপর অনেকটা পথ দূরে একটি জঙ্গলের মধ্যে নিয়ে যান তাঁদের। সেখানে গিয়ে পূর্ব্বোক্ত গাছটি দেখিয়ে দেন।

গাছটি দু'টি শাখায় বিভক্ত। সাক্ষী গাছের উপর চারটি বুলেটের চিহ্ন দেখেছিলেন। গাছের যে-অংশে বুলেটের চিহ্ন ছিলো, পুলিশ থেকে তা কেটে নেওয়া হয়েছিলো। সর্ব্বশুদ্ধ তিনটি খণ্ড কেটে নেওয়া হয়েছিলো।

শ্রীযুত মঙ্গলের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, গত বারো বছর তিনি দিল্লীতে বাস করছেন। মাত্র গত বছর তিনি রেস্তোরাঁ খুলেছেন। তার আগে তিনি ছিলেন ওয়াই. এম্. সি. এ-র অ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার।

শ্রীযুত মঙ্গলে: সে-চাকরি আপনি ছাড়লেন কেন?

সাক্ষী: ভারতের প্রধান বিচারপতিও (তিনি ওয়াই. এম্. সি. এর সভাপতি ছিলেন) আমাকে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন। আমি তাঁকে বলেছিলাম, 'অনুগ্রহ করে আমাকে এ-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন না।'

শ্রীযুত মঙ্গলে তখন আদালতে বলেন, তাঁর মক্কেলের স্বার্থের জন্যে এই প্রশ্নের উত্তর পাবার প্রয়োজন আছে তাঁর।

আদালত: আপনি যাতে উত্তর পান তার ব্যবস্থা আমি করছি।

বিচারপতি তখন সাক্ষীকে বলেন যে, সাক্ষী কেন ঐ প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করলেন, শ্রীযুত মঙ্গলে সে-কথাই জানতে চান।

সাক্ষী: আমি হিন্দু বলে সেখানে বিশেষ সুবিধা-সুযোগ পাই নি, এই জন্যেই ঐ প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করেছি।

৭ই জুলাই তারিখে আগ্রা নর্থ সার্কেলের বিস্ফোরক-বিশেষজ্ঞ শ্রীযুত সুধীরকুমার রায়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

তিনি তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, পুলিশ কর্তৃক প্রেরিত বিভিন্ন প্রকারের বিস্ফোরকদ্রব্য পরীক্ষা কা্র সে-সম্বন্ধে অভিমত জানানো তাঁর কর্ত্তব্যের একটি অঙ্গ। যে ন্যারি মাসের গোড়ার দিকে তিনি ভারতের মুখ্য বিস্ফোরক-পরিদর্শকের (Chief Inspector of Explosives in India) মারফত দিল্লীর বিশেষ গোয়েন্দা পুলিশের নিকট থেকে দু'টি পার্সেল পান। ওগুলোর একটাতে হাতবোমা ছিলো একটি। বোমার 'স্ট্রাইকার' ও 'স্প্রিং' ছিলো না। 'লিভার' থেকে দু'টোকেই আলাদা করে রাখা হয়েছিলো। সব ক'টিকে সংযুক্ত করবার পর তিনি দেখেন যে, কলকব্জা সব ঠিকই আছে। পরে তিনি বিস্ফোরক ভরতি-করবার ছিপিটি খুলে ভেতরের জিনিষগুলি বের করে দেখলেন যে, তার মধ্যে রয়েছে 'বেরিয়াম নাইট্রেট' ও 'ট্রাইনাইট্রোটোলিন' (T. N. T.)। এই দুই পদার্থের রাসায়নিক মিশ্রণকে বলে 'ব্যারাটল'। এই ব্যারাটল সাধারণত U. K.-তে প্রস্তুত হাতবোমাতেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ব্যারাটল এক প্রকার ভীষণ বিস্ফোরক।

মিশ্রণ পরীক্ষিত হবার পর তিনি তা নষ্ট করে ফেলেন। পরীক্ষার জন্যে প্রেরিত সমস্ত বিস্ফোরক ও দাহ্য পদার্থ নষ্ট করে ফেলবার নির্দ্দেশ পেয়েছিলেন তিনি। তারপর তিনি বিস্ফোরক-শূন্য-হাতবোমা বিশেষ গোয়েন্দা পুলিশের কাছে পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে তাঁর রিপোর্টও পাঠান। এইরূপ হাতবোমা সাধারণত মানুষ মারবার জন্যে সৈন্য বিভাগের লোকেরা ব্যবহার করে থাকে। সম্পত্তি ধ্বংসের উদ্দেশ্যেও এর ব্যবহার চলতে পারে। এই হাতবোমা, হাতেও ছোড়া যেতে পারে, কিংবা বিশেষ ধরণের রাইফেলের সাহায্যেও নিক্ষিপ্ত হতে পারে।

ঐ ধরণের হাতবোমার জন্যেই ব্যবহার করা যেতে পারে এমন একটি 'প্রজ্বালক সেট্' ছিলো অন্য পার্সেলটিতে। প্রজ্বালক সেটটি

ছিলো তাজা, সেটিকেও নষ্ট করে ফেলেন তিনি। 'সেট' পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, সেটিকে সংযুক্ত করা হয়েছিলো 'কিরকি ফ্যাক্টরি'তে।

এরও পরে তিনি আরো চারটি পার্সেল পেয়েছিলেন গোয়েন্দা পুলিশের কাছ থেকেই। প্রথমটিতে ছিলো তিনটি হাতবোমা। ইতিপূর্ব্বে যেরূপ হাতবোমা পরীক্ষা করেছিলেন, তিনটির মধ্যে দু'টি বোমাই ছিলো তার অনুরূপ। তৃতীয় বোমাটি প্রস্তুত হয়েছিলো কিরকির অস্ত্র তৈরি করবার কারখানায়। এই তিনটিকেও তিনি পরীক্ষা করেছিলেন। এগুলিতে ব্যারিয়াম ও টি-এন্-টির মিশ্রণ ছিলো। বিস্ফোরক-শূন্য করে হাতবোমা তিনটি তিনি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দিল্লীর গোয়েন্দা বিভাগের এস. পি-র নিকট।

দ্বিতীয় পার্সেলটিতে ছিলো তিনটি 'প্রজ্জ্বালক সেট' (igniter set)। তৃতীয়টিতে ছিলো একটি তাজা ডেটোনেটার (detonator), সঙ্গে যুক্ত ছিলো খানিকটা 'সেফটি ফিউজ' (safety fuse)। ডেটোনেটার নিজেই বিস্ফোরক পদার্থ, সাধারণত অন্যান্য মারাত্মক বিস্ফোরক দ্রব্যের বিস্ফোরণের নিমিত্ত হয়ে থাকে এর ব্যবহার। চতুর্থ পার্সেলে ছিলো একখণ্ড 'গানকটন্' (guncotton),—ভয়ানক রকমের বিস্ফোরক। এই ভেজা গানকটন খণ্ডটির ওজন ছিলো ১ পাউণ্ড। তার সঙ্গে সংযুক্ত ছিলো ১ আউন্স ওজনের একটি শুকনো "গানকটন প্রাইমার" (primer)। বিভিন্ন ধ্বংসকার্য্যের জন্যে ব্রিটিশ সৈন্য বিভাগে এই অস্ত্র ব্যবহৃত হয়ে থাকে। তিনি গোয়েন্দা বিভাগের 'এস্-পি'র নিকট সবগুলো জিনিষের সম্বন্ধেই রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন।

সাক্ষীর কাছে প্রেরিত বিভিন্ন পার্সেলগুলির বহিরাবরণ ও 'সীল' তিনি সনাক্ত করেন। যে-টিনে করে তিনি হাতবোমাগুলি পুলিশে ফেরৎ পাঠিয়েছিলেন এবং তখন যে-সীল তাতে তিনি ব্যবহার করেছিলেন সেগুলিও সনাক্ত করেন তিনি।

শ্রীযুত মঙ্গলের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, গানকটন খণ্ডগুলির প্রত্যেকটির ওজন ছিলো ১ পাউণ্ড।

প্রশ্ন: আপনি কি রিভলবার ও পিস্তল পরীক্ষায়ও বিশেষজ্ঞ?

উত্তর: অস্ত্র-শস্ত্র পরীক্ষা ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ নই আমি।

শ্রীযুত ডাঙ্গের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন, গানকটন বিস্ফোরণের ফলে বাত্যার সৃষ্টি হয়ে থাকে। যে-জিনিষের উপর তা বিস্ফোরিত হবে সে জিনিষের ধ্বংস অনিবার্য্য। দেয়ালের উপরেও এর ক্রিয়া ক্ষতিকারক।

শ্রীযুত ব্যানার্জির জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, রেলওয়ে লাইন, ভারসাম্যরক্ষী ইস্পাতবন্ধনী (steel girder), অট্টালিকা প্রভৃতির ধ্বংসকার্য্যে সৈন্য বিভাগে গানকটনের ব্যবহার হয়ে থাকে। রেলওয়ে লাইন ধ্বংস করতে হলে গানকটনখণ্ড বিস্ফোরিত করতে হবে লাইনের উপরে, নীচে নয়। দু'টি প্রাচীরের কোণে যদি গানকটনের বিস্ফোরণ ঘটে তবে উভয় প্রাচীরেরই ক্ষতি হবে।

পরবর্ত্তী সাক্ষীর নাম কুঁয়ার সিং। পুলিশ-ফটোচিত্রকার তিনি।

সেদিনকার তৃতীয় সাক্ষীর নাম শ্রীযুত পি. আর. কৈলাশ। তিনি নয়া দিল্লীর টেলিফোন রেভিন্যু আপিসের "অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ অফিসার।"

বোম্বাইয়ের একটি 'ট্রাঙ্ক কল' সম্বন্ধে বিবৃতি দেন তিনি। তিনি বলেন, 'কল'টি করা হয়েছিলো দিল্লীর হিন্দু মহাসভার আপিস-সেক্রেটারির ৮০২৪ নম্বর ফোন থেকে, ১৯শে জানুয়ারি বেলা ৯-২০ মিনিটের সময়। বোম্বাইয়ে যে-নম্বরে টেলিফোন করা হয়েছিলো সে-নম্বরটি এই মামলার আসামীপক্ষের কৌসুলি শ্রীযুত ভোপৎকারের। বোম্বাইয়ে কার কাছে ফোন করা হয়েছিলো, সাক্ষী তা বলতে পারেন না। বোম্বাইয়ে 'কল' 'বুক' করা হয়েছিলো, ৬০২০১ নম্বর ফোনে, কিন্তু 'বিলে' নম্বর লেখা হয়েছে ৬০২১০।

চতুর্থ সাক্ষী দিল্লী রেলওয়ে স্টেশনের 'বুকিং' কেরাণী শ্রীযুত লালা বদ্রীনাথন তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে ২০শে জানুয়ারি বিকেল চারটে থেকে মধ্যরাত্রি পর্য্যন্ত তিনি ডিউটিতে ছিলেন। সেই সময়ের মধ্যে তিনি কানপুরের তিনখানি প্রথম শ্রেণীর টিকিট বিক্রি করেছিলেন। টিকিটগুলির নম্বর ছিলো ৬১৩ এ, ৬১৫-বি ও ৬১৫-এ। প্রথম দু'খানি টিকিট একসঙ্গে বিক্রি করেছিলেন কি না, বলতে পারেন না তিনি। হাওড়া-এক্সপ্রেস দিল্লী থেকে ছেড়েছিলো রাত ন'টার সময়। এই ট্রেনটি কানপুর হয়ে গন্তব্য পথে যায়।

পঞ্চম সাক্ষী নক্সাকার শ্রীযুত এন্. এন. কাপুর সাক্ষ্য দিতে এসে বলেন যে, তিনি বিড়লা ভবনের পশ্চাদ্দিকের দু'টি নক্সা তৈরি করেছেন। নক্সাটিকে সনাক্ত করে তিনি বলেন যে, নক্সাটি নিখুঁত অঙ্কিত হয়েছে।

সতেরো

দিল্লী স্টেশনের বিশ্রাম-কক্ষে

৮ই জুলাই তারিখে প্রথম সাক্ষ্য দিতে এলেন দিল্লী জংশন রেলওয়ে স্টেশনের জনৈক বুকিং কেরাণী, নাম শ্রীযুত সুন্দরলাল।

তিনি বল্লেন, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট বিক্রি করার দায়িত্ব তাঁর উপর অর্পিত। স্টেশনের বিশ্রামকক্ষ রিজার্ভ সম্পর্কিত কর্ত্তব্যভারও তাঁর ওপর ন্যস্ত। দিল্লী জংসন স্টেশনে সর্ব্বশুদ্ধ বিশ্রাম-কক্ষ রয়েছে সাতটি। প্রয়োজন হলে এই কক্ষে যাত্রীগণ পূর্ণ একদিনের জন্যে বিশ্রাম করতে পারেন।

বিশ্রাম-কক্ষ রিজার্ভকরণ সম্পর্কিত একটি রসিদ বই সাক্ষীকে দেখানো হলে তিনি ২৯শে জানুয়ারি তারিখের একখানি রসিদ সনাক্ত করেন। সেই রসিদ থেকে জানা যায় যে, ঐদিন এন.বিনায়ক. রাও নামে এক ব্যক্তি ৬ নম্বর বিশ্রাম-কক্ষটি রিজার্ভ করেছিলেন। বিনায়ক রাও-এর সঙ্গে ছিলো দু'খানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট,—একখানা পুণা থেকে দিল্লীর এবং অপরখানা গোয়ালিয়র থেকে দিল্লীর। রাও-এর একজন সঙ্গী ছিলেন।

শ্রীযুত দফ্‌তরি : আপনি বিনায়ক রাওকে সনাক্ত করতে পারেন?

নাথুরাম গড্‌সেকে দেখিয়ে সাক্ষী উত্তর করেন যে, ঐ লোকটিই বিনায়ক রাও নামে বিশ্রাম-কক্ষ রিজার্ভ করেছিলেন। নারায়ণ আপ্তেকে দেখিয়েও তিনি বলেন যে, ঐ ভদ্রলোকই বিনায়ক রাও-এর সঙ্গে ছিলেন সেদিন।

পরদিন, অর্থাৎ ৩০শে জানুয়ারি, বিনায়ক রাও পুনরায় সাক্ষীর নিকট এসে রিজার্ভকরণের মেয়াদ বাড়াতে চান। সঙ্গীটিও সে-সময়ে তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সাক্ষী তাঁকে বলেন যে, স্টেশন-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুমতি ভিন্ন মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে না। ঘরটি খালি করে দেওয়া হয়েছে কি না, তাই দেখবার জন্যে সাক্ষী বেলা একটার সময় সেখানে যান। গিয়ে বিনায়ক রাও, তাঁর সঙ্গী ও অপর এক তৃতীয় ব্যক্তিকে ঘরে দেখতে পান। বিনায়ক রাওকে তিনি বলেন যে, মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ঘরটি তাঁকে ছেড়ে দিতে হবে। বিনায়ক রাও তখন একজন সঙ্গীকে বিছানা বাঁধতে বলেন। সত্যি সত্যি ঘর খালি করে দেওয়া হলো কি না, দেখবার জন্যে সাক্ষী সেখানে প্রায় পনেরো মিনিট দাঁড়িয়েছিলেন। বিছানাপত্তর সরিয়ে নেওয়া হলে তিনি চলে যান তাঁর আপিসে।

শ্রীযুত দফ্‌তরি : যখন আপনি বিশ্রাম-কক্ষে গিয়েছিলেন তখন কি ঐ তিনজনকে পরস্পর কথা কইতে শুনেছিলেন?

সাক্ষী : হ্যাঁ, তাঁরা মারাঠি ভাষায় কথা কইছিলেন।

করকারকে, সাক্ষী, তৃতীয় ব্যক্তি বলে সনাক্ত করেন।

শ্রীযুত ভি. ভি. ওকের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, মাঝে মাঝে তিনি সংবাদপত্র পড়ে থাকেন।

প্রশ্ন : আপনি ২৮শে মে-র সংবাদপত্র পাঠ করেছেন ?

আদালত : (শ্রীযুত ওককে) আপনি কি জানতে চান ?

শ্রীযুত ওক : সাক্ষী সংবাদপত্রে প্রকাশিত আসামীদের ফটো দেখেছিলেন কি না, জানতে চাই।

সাক্ষী : ২৮শে মে-র সংবাদপত্র পড়েছিলাম কি না, স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : আপনি নাথুরাম গড্‌সেকে সনাক্ত করেছেন ?

উত্তর : হ্যাঁ, আমি প্রথমে এই আসামী ও পরে তাঁর সঙ্গীকে সনাক্ত করি। বাইরে আসবার সময়ে তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখি। তখন ডি-এস-পি-কে বলি যে, তৃতীয় ব্যক্তিকেও সনাক্ত করতে পারি,—একথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম আমি।

সব কথাই শ্রীযুত ওক আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করছিলেন। আদালত তাতে প্রশ্ন করেন, এরূপ আনুপূর্ব্বিক জিজ্ঞাসা করবার প্রয়োজন আছে কি না।

শ্রীযুত ওক : আমি জানতে পেরেছি, সাক্ষী প্রথমে নাথুরামকে সনাক্ত করতে পারেন নি। পুলিশ-অফিসারের কাছ তিনি এ-ব্যাপারে সাহায্য পেয়েছেন। একথা আমি স্বীকার করিয়ে নিতে চাই।

সাক্ষী : আমি সঙ্গে-সঙ্গেই নাথুরাম গড্‌সেকে সনাক্ত করতে পারি নি। সনাক্তকরণে আমার দশ-পনেরো মিনিট সময় লেগেছিলো।

তারপর শ্রীযুত ডাঙ্গে সাক্ষীকে জেরা করেন।

শ্রীযুত ডাঙ্গে : বিশ্রাম-কক্ষে যাঁরা আসেন তাঁদের উপর লক্ষ্য রাখা কি আপনার ডিউটির মধ্যে পড়ে ?

সাক্ষী : না।

প্রশ্ন : আপনি বলেছেন, বিশ্রাম-কক্ষে আপনি দশ-পনেরো মিনিট ছিলেন। আপনি কি সন্দেহ করেছিলেন যে, এঁরা কক্ষ ত্যাগ করবেন না?

উত্তর : অনেক সময় যাত্রীরা বলে যে, তারা ঘর ছেড়ে চলে যাবে, কিন্তু তা না করে তারা ঘরে তালা দিয়ে বাইরে যায়।

শ্রীযুত ব্যানার্জি জেরা করেন : যখন দু'জন লোক কোনো ঘরে থাকেন তখন তাঁদের দু'জনের দু'খানা টিকিটের নম্বরই কি আপনি রসিদে লিখে রাখেন?

সাক্ষী : সাধারণত একখানা টিকিটের নম্বরই লিখে রাখা হয়।

তখন রসিদ বইটি পরীক্ষা করা হয়। শ্রীযুত ব্যানার্জি দু'-এক জায়গা নির্দেশ করে দেখিয়ে দেন যে, কোনো-কোনো স্থলে দু'খানা টিকিটের নম্বরই লিখে রাখা হয়েছে।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর দিল্লী জংশন রেলওয়ে স্টেশনের বিশ্রাম-কক্ষের বেয়ারা হরিকিষণের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

সে বলে যে, তিনজন যাত্রী ২৯শে ও ৩০শে জানুয়ারি তারিখে ৬ নম্বর ঘরে ছিলেন। নাথুরাম গড্‌সেকে দেখিয়ে সে বলে যে, তন্মধ্যে একজন ইনি। এই ব্যক্তি সাক্ষীর মারফত কিছু কাপড় ধৌত করিয়ে নেন। এই ব্যক্তি যখন ৬ নম্বর ঘর দখল করতে আসেন সাক্ষী তখন উপস্থিত ছিলো সেখানে। এই ব্যক্তির সঙ্গে আরো দু'জন লোক ছিলেন। ৩০শে জানুয়ারি বেলা প্রায় দেড়টার সময় এঁরা ঘর খালি করে দেন। সাক্ষী, করকারেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে সনাক্ত করে, কিন্তু বলে যে, যে-তৃতীয় ব্যক্তি তাঁদের সঙ্গে ছিলেন তিনি কাঠগড়ায় নেই।

আদালত : তৃতীয় ব্যক্তিকে সাক্ষী বোম্বাইয়ে সনাক্ত করেছিলো কি?

শ্রীযুত দফ্‌তরি ও শ্রীযুত মঙ্গলে : না।

আদালত : সনাক্তকরণের সময়ে কি আপ্তে ছিলেন ?

শ্রীযুত দফ্তরি : হ্যাঁ। কিন্তু সাক্ষী তাঁকে সনাক্ত করতে পারে নি।

তারপর সাক্ষ্য দিতে আসে জম্মু মুচি। নাথুরাম গড্‌সে, দিল্লী জংশন রেলওয়ে স্টেশনে একে দিয়েই জুতো পালিশ করিয়ে নিয়েছিলেন।

জম্মু প্রথমে আপ্তেকে সনাক্ত করে। করকারের চোখে চশমা ছিলো, সাক্ষী তাঁকেও সনাক্ত করে।

সাক্ষ্যে সে বলে যে, দিল্লী রেলওয়ে স্টেশনে জুতা পালিশের কাজ করে সে। গান্ধীজীকে যেদিন হত্যা করা হয় তার আগের দিন ৬ নম্বর ঘরে যাঁরা ছিলেন তাঁদের একজনের জুতা সে পালিশ করেছিলো।

সনাক্তকরণের জন্যে সাক্ষীকে কাঠগড়ার নিকট নিয়ে যাওয়া হলে সে আসামী নাথুরামের কাছে দাঁড়িয়ে জোড়হস্তে বলে, "এই বাবু।"

সেদিনকার চতুর্থ সাক্ষী কনেস্টবল দেবকীনন্দনের জবানবন্দীর পর তাকে আর জেরা করা হয় নি। তার সাক্ষ্য সম্পর্কে জেরা করবার কিছু ছিলোও না।

আঠারো

প্রত্যক্ষদর্শীকে জেরায় অনিচ্ছা

৯ই জুলাই, শুক্রবার ১৯৪৮ সাল।

এইদিন সরকারপক্ষে যে-ক'জন সাক্ষ্য দেন তাঁদের মধ্যে তিনজন, মহাত্মা গান্ধী যখন গুলীবিদ্ধ হন তখন, ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন। এক কথায় তাঁদের বলা যায় প্রত্যক্ষদর্শী।

এইদিনকার প্রথম সাক্ষী ভারতীয় বিমান বাহিনীর (RIAF) সার্জেন্ট শ্রীযুত রামচন্দ্র। আসামী মদনলালকে সনাক্ত করে তিনি বলেন, বিড়লা ভবনে বোমাবিস্ফোরণের দিন ঐ লোকটিকেই তিনি ধরেছিলেন। প্রায়ই

তিনি মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় যোগদান করতেন, বোমাবিস্ফোরণের দিনেও করেছিলেন। বিস্ফোরণকালে তিনি মহাত্মার আসনের কাছ থেকে পাঁচ গজ দূরত্বের মধ্যে দাঁড়িয়েছিলেন। বিস্ফোরণের শব্দ শুনেই তিনি সেদিকে দৌড়ে যান। তিনি দেখেন, সেদিক থেকে গাঢ় সবুজ ধোঁয়া উঠছে। ধোঁয়ার ভেতর দিয়েই তিনি সীমা-প্রচীরের দিকে এগিয়ে যান। তার পেছনে দাঁড়িয়েছিলো একজন রাইফেলধারী কনেস্টবল। সাক্ষী লাফিয়ে দেয়াল পার হন, কিন্তু সঙ্গে রাইফেল থাকায় কনেস্টবলটি লাফাতে পারে না। তখন তিনি প্রাচীর-আরোহণে সাহায্য করবার জন্যে কনেস্টবলের কাছ থেকে রাইফেলটি গ্রহণ করেন।

দেয়াল পেরিয়েই তিনি দেখেন, কাছেই দু'টি শিশু ও একজন স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে। স্ত্রীলোকটিকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কে বোমা ছুড়েছে। তাতে সেই স্ত্রীলোকটি পাচ-ছ' গজ দূরে দণ্ডায়মান এক ব্যক্তিকে দেখিয়ে দেন। লোকটি সেখান থেকে চলে যেতে চেষ্টা করেছিলো। কিন্তু সাক্ষী সেই মুহূর্তে দৌড়ে গিয়ে তার হাত চেপে ধরেন। নিজেকে মুক্ত করবার জন্যে লোকটি ধস্তাধস্তি করেছিলো, কিন্তু যে-কনেস্টবলটি সাক্ষীর অনুগমন করেছিলো সে তার দিকে বন্দুক লক্ষ্য করে বলে, পালাতে চেষ্টা করো না।

তারপর সাক্ষী সেই লোকটিকে বিড়লা ভবনের বড়ো ফটকের নিকটবর্ত্তী পুলিশ-শিবিরে নিয়ে যান। লোকটির দেহ তল্লাস করে তার কোটের ডান দিককার ভিতরের পকেটে একটি হাতবোমা পাওয়া যায়। বোমাটিকে নিরাপদ করবার জন্যে সাক্ষীর হাতে সেটি দেওয়া হয়। সাক্ষী তখন তার প্রজ্জ্বালক সেটটি খুলে নেন, এবং অধিকতর নিরাপদ হবার জন্যে পিন খুলে ফেলেন, সেই সঙ্গে স্ট্রাইকারটিও বের করে নেন।

জনৈক পুলিশ-দারোগা মদনলালের দেহ তল্লাস করেছিলেন। সে

সময়ে সাক্ষীও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। মদনলালের দেহ তল্লাসীর পূর্ব্বে দারোগার দেহও তল্লাস করা হয়েছিলো।

শ্রীযুত ওক এবং শ্রীযুত ডাঙ্গে সাক্ষীকে জেরা করেন।

শ্রীযুত ডাঙ্গের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, অস্ত্রশস্ত্র এবং বিস্ফোরক দ্রব্যাদি সম্পর্কে তিনি বিশেষজ্ঞ নন। রাইফেল ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্র প্রয়োগে অভিজ্ঞতা নেই তাঁর।

শ্রীযুত ব্যানার্জির জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন, তাজা বোমার স্ট্রাইকিং পিন সর্ব্বদাই বিস্ফোরণোপযোগী অবস্থায় থাকে।

শ্রীযুত ব্যানার্জি: আপনাকে যে-স্ত্রীলোকটি মদলালকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি কি আপনাকে বলেছিলেন যে, আরো তিনজন লোকের সঙ্গে মদনলাল একটি মোটর গাড়িতে এসেছেন?

সাক্ষী: আমি তা মনে করি না।

প্রশ্ন: সেই স্ত্রীলোকটি বলেছিলেন যে, মদনলালকে আরো তিনজনের সঙ্গে তিনি একটি গাড়ি থেকে নামতে দেখেন, পুলিশের নিকট আপনি এরূপ বিবৃতি দিয়েছিলেন কি?

সাক্ষী: আমার মনে নেই।

প্রশ্ন: পুলিশের নিকট আপনার বিবৃতিতে আপনি বলেছিলেন, কনেস্টবল রতন সিং প্রথম লাফিয়ে দেয়াল পার হন। কিন্তু আজ বললেন যে, আপনিই আগে লাফিয়ে দেয়াল পেরিয়েছিলেন। এর মধ্যে কোনটি সত্য?

উত্তর: পুলিশের কাছে আমি কি বলেছিলাম, মনে নেই।

প্রশ্ন: আপনি কি জানেন যে, পুলিশ-কনেস্টবল যে-ক্ষেত্রে উপস্থিত সে-ক্ষেত্রে আপনার করণীয় কিছু নেই?

আদালত এ-প্রশ্ন অগ্রাহ্য করেন।

এর পর সাক্ষ্য দিতে আসেন তোঘলক রোড থানার সহকারী দারোগা শ্রীযুত অমরনাথ।

সাক্ষী বলেন, তিনি বিড়লা ভবনের পুলিশ-প্রহরী দলের ভারপ্রাপ্ত অফিসার ছিলেন। মহাত্মার প্রার্থনা সভায় প্রত্যহ সাড়ে চারটে থেকে তাঁর ডিউটি থাকতো। গান্ধীজী নিহত হবার দিন প্রার্থনা সভায় তিনি ছাড়া আরো চারজন কনেস্টবলের ডিউটি ছিলো।

সাক্ষী : মহাত্মা গান্ধীকে কি ভাবে হত্যা করা হয়েছে, আমি জানি। আমি নিজে তাঁকে নিহত হতে দেখেছি। ৩০শে জানুয়ারি বিকেল ৫-১৫ মিনিটের সময় তাঁর কক্ষ থেকে প্রার্থনা সভার দিকে আসতে দেখি তাঁকে। মহাত্মার দু'পাশে বালিকা ছিলেন দু'জন, তাঁদের কাঁধের উপর ছিলো গান্ধীজীর দু'টি হাত। সঙ্গীরা আসছিলেন পশ্চাতে। মহাত্মা এসে উঠলেন প্রার্থনাসভা-সংলগ্ন সিঁড়িতে। ছ'-সাত পা যাবার পরেই জনতা তাঁকে যাবার জন্যে পথ ছেড়ে দিলো। আমি ছিলাম তাঁর বাঁ দিকে আড়াই কি তিন পা দূরে। এই সময়ে আমি শুনতে পেলাম গুলীর আওয়াজ, ধোঁয়াও দেখলাম। মনে হলো, কেউ গুলী করেছে। তখুনি সুমুখের দিকে ছুটে গিয়ে যে-লোকটি গুলী করেছিলো তাকে ধরে ফেললাম। ইতিমধ্যে তিনটি গুলী ছোড়া হয়ে গেছে। গুলীতে মহাত্মা আহত হয়েছিলেন। জনতার ভেতর থেকে তখন সার্জেণ্ট দেবরাজ সিং-ও সেখানে ছুটে এসেছিলেন। লোকটির হাত থেকে তিনি রিভলবারটি কেড়ে নেন। রিভলবার থেকে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছিলো। মহাত্মার কাছ থেকে আততায়ী প্রায় আড়াই পা দূরে ছিলো। এই সময়ে জনতা আততায়ীকে মারধর করতে সুরু করে। আততায়ী মাথায় আঘাত পায়, সেখান থেকে রক্ত পড়তে থাকে। আমার মনে হলো, জনতা আততায়ীকে মেরে ফেলবে। এইজন্যে একজন হেড-কনেস্টবল ও সার্জেণ্ট দেবরাজ সিংয়ের সাহায্যে আততায়ীকে জনতা

থেকে দূরে প্রার্থনা-মঞ্চের অপর পার্শ্বে নিয়ে যাই। দেবরাজ সিং তখন পিস্তল থেকে চারটি কার্ত্তুজ বের করে নেন। পিস্তলটি বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং প্রাপ্ত দ্রব্যের একটি লিপি সেখানেই তৈরি হয়। পিস্তল ও কার্ত্তুজগুলিকে স্বতন্ত্রভাবে 'সীল' করে বিভিন্ন বাণ্ডিলে রাখা হয়। আততায়ীকে আমি নিয়ে যাই তোঘলক রোড থানায়। সেখানে তার দেহ তল্লাস করে অনেক জিনিষ পাওয়া যায়।

শ্রীযুত দফ্‌তরি: মহাত্মা গান্ধীকে গুলী করেছিলো বলে যাকে আপনি ধরেছিলেন তাকে সনাক্ত করতে পারেন কি?

উত্তরে সাক্ষী, আসামী নাথুরাম গড্‌সেকে দেখিয়ে দেন।

আততায়ীর হাত থেকে যে-পিস্তলটি কেড়ে নেওয়া হয়েছিলো আদালতে সেটিকে উপস্থাপিত করা হয়। সাক্ষী সনাক্ত করেন সেই পিস্তলটিকে।

জবানবন্দী শেষ হলে আদালত, আসামীপক্ষের কৌঁসুলিদের, সাক্ষীকে জেরা করতে অনুরোধ জানান।

নাথুরাম বলেন যে, ৩০শে জানুয়ারি বিড়লাভবনের ঘটনা সম্পর্কিত বিবৃতিদানকারী সরকারপক্ষীয় কোনো সাক্ষীকে জেরা করা হয়, তা তাঁর ইচ্ছা নয়।

শ্রীযুত ওক: আমার মক্কেল আমাকে অনুরোধ করেছেন, ৩০শে জানুয়ারির ব্যাপার সম্পর্কে, এই সব প্রত্যক্ষদর্শীকে আমি যেন জেরা না করি। জেরা আমি হয়তো করতে পারতাম। কিন্তু আমার মক্কেলের নির্দ্দেশানুযায়ী আমি তা করবো না।

বলাবাহুল্য এর পর সাক্ষীকে কোনোরূপ জেরা করা হয় নি।

এরপর নয়া দিল্লীর জনৈক ব্যবসায়ী শ্রীযুত নন্দলালের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। গান্ধীজীর শেষ-জীবনে ইনি প্রায় সর্ব্বদাই মহাত্মার সঙ্গে থাকতেন।

তিনি বলেন যে, ৩০শে জানুয়ারি, বিড়লা ভবনে, ৫—১৫ মিনিটের সময় গান্ধীজী যখন প্রার্থনা সভার দিকে অগ্রসর হন, তিনি তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন। মহাত্মার দক্ষিণে ছিলেন শ্রীমতী আভা গান্ধী, আর বাঁ দিকে শ্রীমতী মানু গান্ধী। সিঁড়িতে উঠে কয়েক পা গিয়ে অভ্যস্ত-ভাবে গান্ধীজী হাত জোড় করেন। জনতা তাঁকে পথ ছেড়ে দেয়। এই সময়ে সাক্ষী পরপর দু'বার গুলির শব্দ শুনেন এবং সুমুখে লাফিয়ে পড়ে আততায়ীকে ধরে ফেলেন। ইতিমধ্যে আরো তিন জন এসে তাঁকে ধরেছিলো। আততায়ীর হাতে ছিলো পিস্তল। তারপর তাঁর লক্ষ্য পড়ে মহাত্মার দিকে। মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন মহাত্মা। সাক্ষীর ধারণা যে, গান্ধীজী দু'-এক মিনিটের মধ্যেই মারা গিয়েছিলেন। মহাত্মাকে তাঁর কক্ষে নিয়ে যাওয়া হয়। সাক্ষী তাঁর দেহের তিন স্থানে আঘাত দেখেন—একটি তলপেটে এবং দু'টি বুকে।

সাক্ষী, নাথুরামকে আততায়ী বলে সনাক্ত করেন।

এঁকেও জেরা করা হয় নি।

পরবর্ত্তী সাক্ষী তোঘলক রোড থানার হেড-কনেস্টবল কাবুল সিং।

যে-সকল হাতবোমা, প্রজ্জ্বালক সেট, কার্ত্তুজ, ডেটোনেটার, গান-কটনখণ্ড তাঁর কাছে গচ্ছিত রাখা হয়েছিলো সেই সম্পর্কে কাবুল সিংয়ের জবানবন্দী গৃহীত হয়।

তারপর সাক্ষ্য দেন শ্রীরতন সিং। তোঘলক রোড থানার পুলিশ-কনেস্টবল তিনি।

তিনি বলেন, জানুয়ারি মাসে প্রার্থনা সভায় তাঁর ডিউটি ছিলো। বোমাবিস্ফোরণকালে তিনি গান্ধীজীর কাছ থেকে পাঁচ-সাত পা দূরে ছিলেন। যেদিক থেকে বিস্ফোরণের শব্দ এসেছিলো সেদিকে তিনি দৌড়ে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলো একটি রাইফেল ও কিছু কার্ত্তুজ। সীমাপ্রাচীর পার হয়ে তিনি দেখলেন, সুমুখেই একজন পাঞ্জাবী স্ত্রীলোক

দাঁড়িয়ে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কে বোমা ছুড়েছে। স্ত্রীলোকটি একজন লোককে দেখিয়ে দেন। লোকটি একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলো। সাক্ষী তখন লোকটির দিকে এগিয়ে যান এবং বলেন যে, সে যদি পালাতে চেষ্টা করে তবে তাকে গুলী করে মারা হবে। সাক্ষী তাকে গ্রেফ্‌তার করে পুলিশ-শিবিরে নিয়ে যান।

মদনলালকে, সাক্ষী সেই বোমানিক্ষেপকারী-হিসাবে-ধৃত লোক বলে সনাক্ত করেন।

শ্রীযুত ব্যানার্জির জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, প্রার্থনা সভায় তিনি যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে প্রায় তেইশ থেকে ত্রিশ গজের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটেছিলো। সাক্ষীকে দেখে মদনলাল পালাবার চেষ্টা করেছিলো। ভৃত্যাবাসের ফটকের কাছে তিনি মদনলালকে গ্রেফ্‌তার করেন।

নাথুরাম ও আপ্তেকে দেখিয়ে সাক্ষী বলেন যে, ৩০শে জানুয়ারি ঐ দু'জনের মধ্যে একজনকে ধরা হয়েছিলো। কিন্তু ঠিক কাকে ধরা হয়েছিলো, তা তিনি বলতে পারেন না।

এরপর সাক্ষ্য দেন সহকারী দারোগা শ্রীধন্নুরাম। তারপরের সাক্ষী শ্রীপরশুরাম। এঁদের সাক্ষ্য তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

সেদিনকার শেষ সাক্ষী হেড-কনেস্টবল শ্রীধরম সিং। ৩০শে জানুয়ারি তারিখে প্রার্থনা সভায় তাঁরও ডিউটি ছিলো। তিনিও গুলীর শব্দ শুনতে পেয়েছিলেন। পিস্তল-হাতে একটি লোককে দেখে তার যে-হাতে পিস্তল ছিলো সেই হাত চেপে ধরেন তিনি। ইতিমধ্যে সৈন্যবিভাগীয় কোনো লোক এসে আততায়ীর হাত থেকে পিস্তলটি কেড়ে নেন।

সাক্ষী নাথুরামকে সনাক্ত করেন।

বলাবাহুল্য এঁকেও জেরা করা হয় নি।

গান্ধী-হত্যার কাহিনী

উনিশ

পঞ্চ ক্ষত

১২ই জুলাই তারিখের শুনানি সুরু হবার আগে মদনলালের পক্ষ থেকে কৌঁসুলি শ্রীযুত ব্যানার্জি এক আবেদনপত্র পেশ করলেন আদালতে। মৃত্যুর পূর্ব্বে পাঁচ মাস ধরে দিল্লীতে গান্ধীজী বহু বক্তৃতা দিয়েছিলেন। কিছু প্রবন্ধও লিখেছিলেন তখন। সেগুলোকে একত্র করে একটি পুস্তক প্রকাশ করেছেন নব-জীবন প্রেস। সঙ্কলন-গ্রন্থটির নাম "দিল্লী ডায়েরি"। এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছেন ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ। গান্ধীজীর তৎকালীন মতবাদ সম্পর্কে "দিল্লী ডায়েরি" একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ। আবেদন-পত্রে অনুরোধ করা হয়েছে যে, গান্ধী-হত্যার মামলায় আসামী মদনলালের পক্ষসমর্থকরূপে গ্রহণ করা হোক এই গ্রন্থটিকে।

যুক্তিস্বরূপ শ্রীযুত ব্যানার্জি বলেন যে, ২০শে জানুয়ারি মদনলাল গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় বোমা নিক্ষেপ করেছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো মহাত্মার মতবাদ ও কার্য্যক্রমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। একথা মদনলাল নিজেই স্বীকার করেছেন তাঁর বিবৃতিতে। এই কারণেই গান্ধীজীর কার্য্যাবলীকে বুঝবার জন্যে এমন প্রামাণ্য রেকর্ডের প্রয়োজন যাকে এই আদালত বিশ্বাসযোগ্য বলে গ্রহণ করতে পারেন। "দিল্লী ডায়েরি" এ-ব্যাপারে নিঃসন্দেহে একটি প্রামাণ্য পুঁথি। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি পর্য্যন্ত গান্ধীজী যতো বক্তৃতা দিয়েছেন সবগুলিই সঙ্কলিত হয়েছে এই গ্রন্থে।

সরকারপক্ষের কৌঁসুলি শ্রীযুত দফ্‌তরি এই আবেদনে আপত্তি জানান।

বিচারপতি জানালেন, বিবাদীপক্ষ যখন যুক্তিপ্রমাণসহ আত্মপক্ষ সমর্থন করতে আরম্ভ করবেন, এই আবেদন-পত্র পেশ করবার সেই হবে

উপযুক্ত সময়। ইতিমধ্যে একখণ্ড "দিল্লী ডায়েরি" যেন আদালতে দাখিল করা হয়। এ-সম্বন্ধে কিছু বিবেচনা করবার আগে পুস্তকটি পড়ে নিতে চান তিনি।

এদিনকার প্রথম সাক্ষী হলেন লেঃ কর্নেল পি. এন. তানেজা। নয়াদিল্লীর আরুইন হাসপাতালের সিভিল সার্জন ও সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তিনি। ৩১শে জানুয়ারি সকাল আটটায় বিড়লা ভবনে মহাত্মা গান্ধীর মৃতদেহ তিনি পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর অভিমত এই যে, একটি পিস্তল-নিক্ষিপ্ত গুলীর আঘাতহেতু আভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণের ফলেই ঘটেছে মহাত্মার মৃত্যু।

ডাঃ জীবরাজ মেহ্‌তা গান্ধীজীর শব সনাক্ত করেছিলেন। মহাত্মার মৃতদেহে ছিলো পাঁচটি আঘাত চিহ্ন। একটি ছিলো ডিম্বাকৃতি ক্ষত। বুকের ডান দিক ভেদ করে সেটি ঢুকে গিয়েছিলো দেহের ভিতরে। অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবার কোনো চিহ্ন তাতে ছিলো না। আঘাতটি যে কোনো-একটি পিস্তলের, সন্দেহ নেই। দ্বিতীয় ও তৃতীয় আঘাত দু'টিও ডিম্বাকৃতি। অগ্রকড়ার (xiphisternum) ডান দিক বিদীর্ণ করে ভেতরে প্রবেশ করেছিলো। ক্ষত দু'টির আকার ছিলো ১/৪'' ইঞ্চি × ১/৬'' ইঞ্চি। দু'টি আঘাতই বক্র ও নিম্নমুখী হয়ে এক দিক দিয়ে ঢুকে অন্য দিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো। এই বহির্ভেদী ডিম্বাকৃতি ক্ষতের আকার ছিলো ১/৬'' ইঞ্চি × ১/৪'' ইঞ্চি। একটি ক্ষত ছিলো দক্ষিণ শ্রোণিপ্রদেশের (iliac crest) ২১/২'' ইঞ্চি উপরে, অপরটি ছিলো মেরুদণ্ডের (spinal column) ২''ইঞ্চি দক্ষিণে। দু'টি আঘাতই ছিলো প্রাণসঙ্কটকর, এবং সম্ভবত পিস্তলের গুলীর।

চতুর্থ ও পঞ্চম আঘাতও ছিলো ডিম্বাকৃতি এবং অন্তর্ভেদী। আকার—১/৪'' ইঞ্চি × ১/৬'' ইঞ্চি। আঘাত দু'টি তলপেট বিদীর্ণ করে বক্র ও নিম্নাভিমুখী হয়ে অপর দিক দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো। এই দু'টি

ডিম্বাকৃতি ও বহির্ভেদী ক্ষতের আকার ছিলো ⅛'' ইঞ্চি × ⅛'' ইঞ্চি। একটি ক্ষত ছিলো নাভিকুণ্ডলীর (umbil cus) ১'' ইঞ্চি উপরে, এবং অন্যটি ছিলো মেরুদণ্ডের ২'' ইঞ্চি ক্ষণে। এই দু'টি আঘাতও ছিলো প্রাণসংশয়কর, এবং সম্ভবত পিস্তলের গুলীর।

সাক্ষী বলেন, ঐ মারাত্মক আঘাতের ফলে স্বভাবতই যা ঘটা উচিত তাই হয়েছে, মহাত্মার মৃত্যু ঘটেছে। বিড়লা ভবনে পৌছবার অব্যবহিত পরেই সাক্ষীকে একখানা রক্তসিক্ত ধুতি দেখানো হয়। পুলিশ তাঁকে গান্ধীজীর মৃতদেহ তদন্তের রিপোর্ট এবং আঘাতগুলির বিবরণসম্পর্কিত বিবৃতিও দিয়েছিলেন।

পরবর্ত্তী সাক্ষীর নাম শ্রীযুত জগদীশ প্রসাদ গোয়েল। গোয়ালিয়রের অধিবাসী তিনি। ১৯৩৯ সাল থেকে তিনি বাস করছেন সেখানে। ডাঃ পারচুরের সঙ্গে তাঁর পরিচয় আছে। পারচুরেকে তিনি সনাক্তও করলেন আদালতে। ১৯৪১ সাল থেকে পারচুরের সঙ্গে পরিচয় তাঁর।

ডাঃ পারচুরে ছিলেন "হিন্দুরাষ্ট্র সেনা"র সর্ব্বাধিনায়ক। পারচুরের অনুরোধে তিনি যোগ দিয়েছিলেন সেই সেনাদলে। তাদের প্যারেডেও তিনি যোগদান করতেন। হিন্দু যুবকদের সংগঠন ও সঙ্ঘবদ্ধ করাই ছিলো সেনাদলের আদর্শ।

হিন্দু মহাসভার প্রাক্তন সভাপতি শ্রীযুত বিনায়ক সাভারকরের কর্ম্মসচিব শ্রীযুত দামেলকেও তিনি জানেন। হিন্দু মহাসভা ও রাষ্ট্র সেনার প্রচার কার্য্যের জন্যে ১৯৪১ সালে শ্রীযুত দামেল গিয়েছিলেন গোয়ালিয়রে। শ্রীযুত নারায়ণ আপ্তেকে সনাক্ত করে তিনি বলেন যে, আপ্তেও গিয়েছিলেন দামেলের সঙ্গে। তারপর আপ্তেকে আবার তিনি দেখেন ১৯৪৮ সালের ২৮শে জানুয়ারি গোয়ালিয়রে ডাঃ পারচুরের ডিস্পেন্সারিতে। নাথুরামকে দেখিয়ে তিনি বলেন যে, সেদিন গড্সেকে তিনি দেখেছিলেন সেখানে। বছর দুই আগেই গডসের সঙ্গে চেনাশোনা

হয়েছিলো তাঁর। তখন গড্‌সে ছিলেন দৈনিক অগ্রণীর সম্পাদক (পরে হিন্দু রাষ্ট্রের সম্পাদক)।

২৮শে জানুয়ারি সকালে, বেলা প্রায় ন'টার সময়, ডাঃ পারচুরের ডিস্পেন্সারিতে যাবার জন্যে, তাঁর কাছে এক জরুরি ডাক আসে। তিনি বলে পাঠান যে, আপিসে যাবার পথে তিনি সেখানে যাবেন। বেলা প্রায় দেড়টার সময় তিনি উপস্থিত হন ডিস্পেন্সারিতে। পারচুরে তখন সেখানে ছিলেন না, কেবল গড্‌সে ও আপ্তে বসেছিলেন। পারচুরের জন্যে অপেক্ষা না করে তিনি চলে যান আপিসে।

এই মামলার ফেরারি আসামী দণ্ডবতেকেও চেনেন তিনি। দণ্ডবতে গোয়ালিয়রেরই বাসিন্দা। ২৮শে জানুয়ারি রাত প্রায় ন'টার সময় দণ্ডবতে তাঁর বাড়ী এসে বলেন যে, গড্‌সের একটি পিস্তলের প্রয়োজন। এ-বিষয়ে আমি কি করতে পারি,—তিনি জিজ্ঞাসা করেন দণ্ডবতেকে। উত্তরে দণ্ডবতে বলেন যে, তিনি দণ্ডবতেকে নিজের পিস্তলটি বিক্রি করতে পারেন। তাতে তিনি জানান যে, তাঁর কাছে মাত্র একটি পিস্তলই আছে, সুতরাং সেটি তিনি বিক্রি করতে পারেন না। দণ্ডবতে বলেন যে, তাঁর পিস্তলের জন্যে তাঁকে পাঁচশো টাকা দেওয়া হবে, তখন তিনি আর-একটি পিস্তল যোগাড় করে নিতে পারবেন। দণ্ডবতেকে তিনি তখন পিস্তলটি দিয়ে দেন। পিস্তলটি সনাক্ত করে তিনি বলেন যে, পিস্তলের সঙ্গে সাত রাউণ্ড গুলীও তিনি দিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে পারচুরের সঙ্গে দেখা করে তিনি বলেন যে, তাঁর পিস্তলটির যথাযথ ব্যবহার হয় নি। পারচুরে সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকেন।

শ্রীযুত মঙ্গলের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন, ১৯৪১ সালে তিনি ছাত্র ছিলেন। সেই বছরেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেছিলেন। ঐ বছরেই মে মাসে তিনি যোগ দিয়েছিলেন হিন্দু রাষ্ট্র সেনাদলে।

ডাঃ পারচুরের পক্ষের কৌসুলি শ্রীযুত ইনামদার সাক্ষীকে জেরা করলে তিনি বলেন যে, গোয়ালিয়রে "ওয়ার প্রফিট্‌স্ ট্যাক্স্ ডিপার্টমেণ্ট"এ কেরাণী ছিলেন তিনি।

১৯৪৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারি পুলিশ তাঁর বাড়ী গিয়েছিলো। সাক্ষী তখন বাড়ীর পশ্চাৎ-দ্বার দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১১ই এপ্রিল পর্য্যন্ত ফেরার ছিলেন তিনি। ঐদিনে ঝাঁসিতে তাঁকে গ্রেফ্‌তার করা হয়। ১৬ই এপ্রিল অবধি তাঁকে ঝাঁসিতে রাখা হয়, বন্দী অবস্থায় পাঠিয়ে দেওয়া হয় বোম্বাইয়ে। ১৬ই জুন পর্য্যন্ত তিনি ছিলেন বোম্বাইয়ে। ১৮ই জুন থেকে আজ অবধি আছেন দিল্লীর লাল কেল্লায়।

সাক্ষী বলেন যে,'রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ' এবং 'হিন্দু রাষ্ট্র সেনা'— এই দুই দলের মধ্যে অনেক দিন ধরে বিরোধ চলছিলো।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ প্রায়ই গোয়ালিয়রে আসতেন। ভারতীয় ডোমিনিয়নের প্রতিষ্ঠানের থেকে সেখানকার প্রতিষ্ঠানগুলি ছিলো স্বতন্ত্র।

১৯৪৮ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে গোয়ালিয়রে কংগ্রেসের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু মহসভা দল কংগ্রেসের বিরোধী ছিলো। ডাঃ পারচুরে ছিলেন সেই সভার অন্যতম নেতা। ঐ ২৬শে জানুয়ারি তারিখে হিন্দু মহাসভা থেকে সত্যাগ্রহের আয়োজন হয়। গোয়ালিয়র সরকার তখন পারচুরেকে আটক করে রাখেন। অন্তর্ব্বর্ত্তী সরকার-এ একটি আসন দাবী করে মহাসভা থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়।

বিচারপতি: এ-সব প্রশ্ন করে আপনি কি প্রমাণ করতে চাইছেন?

শ্রীযুত ইনামদার: আমার মক্কেল ডাঃ পারচুরে, বিরোধী-দলের নেতা ছিলেন বলেই তাঁর বিরুদ্ধে এই মামলা আনা হয়েছে, এই কথাই আমি প্রমাণ করতে চাইছি।

দিল্লী ট্রাঙ্ক এক্সচেঞ্জের সুপারভাইজার শ্রীসর্দ্দারিলাল বর্ম্মা সাক্ষ্য দিতে এসে বলেন—

১৯৪৮ সালের ১৯শে জানুয়ারি দিল্লী ৮০২৪ নম্বর থেকে বোম্বাই ৬০২০১ নম্বরে একটি 'ট্রাঙ্ক কল্' 'বুক্' করা হয়েছিলো। এই জরুরী 'কল্'টি করা হয় বেলা ৯—২০ মিনিটের সময়। দিল্লীর ফোন নম্বরটি রয়েছে হিন্দু মহাসভার "জেনারেল সেক্রেটারি"র নামে, এবং বোম্বাইয়ের নম্বরটি শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নামে। এই কল্ সম্পর্কে ছু'জন লোকের নাম রেকর্ড করা হয়েছে—দামলে ও কাশারি।

দিল্লী এক্সচেঞ্জের এই 'ট্রাঙ্ক কল্' সম্পর্কিত "টি—৫০" নং টিকিটটি আদালতে প্রদর্শিত হয়। যে-অপারেটার দিল্লী ৮০২৪ নং থেকে কল্‌টি আসলে বুক্ করেছিলেন এবং 'কল্' সম্বন্ধীয় জ্ঞাতব্য তথ্য লিখে নিয়েছিলেন তাঁর নাম শ্রীযুত শান্তারাম সেগল। ১৯শে তারিখে 'এন্‌কোয়ারি' বিভাগে কাজ করেছিলেন মিস্ ফার্নে্স। ঐ টিকিটের উপর তাঁর ও কুমারী বলবন্ত কাউর্-এর যে-সংক্ষিপ্ত স্বাক্ষর ছিলো, সাক্ষী তা সনাক্ত করেন। প্রথমে বেলা এগারোটায় ও পরে আর-একবার বেলা ১১—৫৫ মিনিটে দিল্লী থেকে বোম্বাইয়ে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু যে-ছু'জনকে কল্ করা হয়েছিলো তাঁদের কাউকেই পাওয়া যায় নি। টিকিটের উপর "ক্যান্‌সেল্‌ড্" কথাটি মিস্ ফার্নেসের লেখা।

শ্রীযুত ভোপৎকারের জেরার উত্তরে শ্রীযুত সর্দ্দারিলাল বলেন যে, ১৯৪৮ সালের ১৯শে জানুয়ারির উক্ত কল্ সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে তিনি কিছুই জানেন না, তিনি যা বলেছেন তা কাগজপত্র দেখেই বলেছেন। যখনই কোনো ট্রাঙ্ক কল্ করা হয়, যে-স্টেশনের উদ্দেশ্যে সেটি করা হয় সেই স্টেশনে, যেখান থেকে কল্ করা হয় সেখানকার রেকর্ডও রাখা হয়। টি-৫০ নং কল্ সম্পর্কে বোম্বাইয়ে-প্রাপ্ত 'কলে'র টিকিটে যে-নাম ছু'টি লেখা হয়েছিলো তা হচ্ছে—"ডি'মেলো" এবং "কাশার"।

শ্রীযুত ভোপৎকার : দেখুন তো, "ডি'মেলো" কথাটির আগে কোনো শব্দকে কেটে ফেলা হয়েছে কি না।

উত্তর : প্রথমে-লেখা "দালাল" শব্দটি কেটে দেওয়া হয়েছে।

প্রশ্ন : দ্বিতীয় শব্দটি কি?

উত্তর : "কাশার"।

প্রশ্ন : ওটা কি "কাশিয়া" নয়?

বিচারপতি একটি লেন্স দিয়ে টিকিটটি পরীক্ষা করে বললেন যে, শব্দটি "কাশার"।

শ্রীযুত ভোপৎকার : ট্রাঙ্ক কলের নম্বর ৮০২৪ নয়, ওটি ৮৯২৪,—তাই না?

এবারেও বিচারপতি লেন্সের সাহায্যে টিকিটটি পরীক্ষা করে বললেন যে, নম্বরটি হলো ৮০২৪।

এরপর সাক্ষ্য দিতে এলেন নয়াদিল্লী টেলিফোন এক্সচেঞ্জের জনৈকা কর্মিনী—কুমারী বলবন্ত কাউর।

তাঁর বক্তব্য হলো এই যে, ১৯শে জানুয়ারি তারিখে দিল্লী আপিসে বোম্বাই 'সুইচ বোর্ডে' ডিউটি ছিলো তাঁর। সুপারভাইজারের কাছ থেকে তিনি ট্রাঙ্ক কলের টিকিট পেয়েছিলেন। 'কলে'র সময়, তারিখ, দু' জায়গার টেলিফোন নম্বর, যাঁদের ডাকা হয়েছিলো তাঁদের নাম, 'কলে'র উদ্দেশ্য—ট্রাঙ্ক কল্ টিকিটে এই সমস্ত বিষয়সম্পর্কিত স্তম্ভগুলি ইতিপূর্ব্বেই পূরণ করা হয়েছিলো। টিকিটে-লিখিত সমস্ত বিবরণই যথারীতি তিনি বোম্বাইয়ের অপারেটরকে জানিয়েছিলেন। টিকিটের নীচে "বি.পি.পি.এন্.-এ," লেখাটি তাঁর হাতের। বোম্বাইয়ের নম্বরের সঙ্গে টেলিফোনের যোগস্থাপন করে দেবার পর বোম্বাই ৬০২০১ নম্বরে কথা কয়ে তিনি জানতে পারলেন যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের পাওয়া যাবে না। তদনুযায়ী টিকিটে তিনি 'নোট' লিখে রাখেন একটি। দিল্লীর নম্বরেও

সে-কথা জানিয়ে দেন তিনি। বেলা ১১—৫৫ মিনিটে আবার তিনি বোম্বাইয়ের সঙ্গে যোগস্থাপন করেন, কিন্তু এবারেও নির্দ্দিষ্ট ব্যক্তিদের পাওয়া গেলো না। দিল্লীর নম্বরকে সেকথা জানালে তাঁকে কল্‌টি বাতিল করে দিতে বলা হয়। তিনি তাঁকে বলেন যে, কল্ বাতিল করতে হলে ৯১ নম্বরে ফোন করতে হবে। সে-নম্বরটি 'এন্‌কোয়ারি' বিভাগের।

মিস্ ফার্নেস সেদিন 'এন্‌কোয়ারি' বিভাগে কাজ করছিলেন। টিকিটের উপর 'ক্যান্‌সেলড্' কথাটি লিখবার পর ফার্নেস এসেছিলেন তাঁর কাছে। ফার্নেসকে তিনি বলেছিলেন যে, কল্ অনুযায়ী সংযোগস্থাপনের পর কল্‌কে আর 'বাতিল' বলে গণ্য করা যায় না। মিস ফার্নেস অতঃপর 'ক্যানসেলড্' শব্দটি কেটে ফেলেন।

শ্রীযুত ভোপৎকারের জেরার উত্তরে কুমারী বলবন্ত কাউর বলেন যে, বোম্বাই এক্সচেঞ্জে সেদিন কে অপারেটার ছিলেন তা তিনি জানতেন না। বোম্বাই-নম্বর থেকে কোনো একজন তাঁর কথার উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিদের পাওয়া যাবে না।

তারপর সাক্ষ্য দেন, মিস্ ফার্নেস। দিল্লী ট্রাঙ্ক এক্সচেঞ্জ সংবাদ সরবরাহ শাখার (Information Section) "এনকোয়ারি" বিভাগে কাজ করেন তিনি।

তিনি বলেন যে, ১৯৭৭ সালের আগস্ট মাসে তিনি যোগদান করেন টেলিফোন বিভাগে। ঐ বছরেই নভেম্বর মাসে তাঁকে ট্রাঙ্ক এক্সচেঞ্জে বদলি করা হয়। টিকিটের উপর 'ক্যানসেল্‌ড্' কথাটি তাঁরই হাতের লেখা। অপারেটার কুমারী কাউর এ-বিষয়ে তাঁকে তাঁর ভুল দেখিয়ে দিলে ঐ কথাটি কেটে ফেলা হয়। কথাটি ঠিক কে কেটেছিলেন, বলতে পারেন নি তিনি।

নাথুরাম গড্‌সে

বীর সাভারকর

বিশ

টাঙ্গা-কাহিনী

১৩ই জুলাই তারিখে ডাঃ পারচুরের পক্ষের কৌঁসুলি শ্রীযুত ইনামদার আদালতে এক আবেদন-পত্র পেশ করেন। তাতে বলা হয়েছে যে, আবেদনকারী-আসামীর স্বীকারোক্তি বলে সরকারপক্ষ যে-সব দলিল-পত্র দাখিল করেছেন, এই মামলা সম্পর্কে সেগুলি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, ডাঃ পারচুরের এবং তাঁর আত্মীয়-স্বজনের প্রাণ, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি ভবিষ্যতে সাঙ্ঘাতিকরূপে বিপন্ন হতে পারে, এই ভয় দেখিয়েই পুলিশ; পারচুরের কাছ থেকে তথাকথিত স্বীকারোক্তিটি আদায় করেছে, স্বেচ্ছায় তিনি তা করেন নি।

যুক্তিস্বরূপ আবেদন-পত্রে বলা হয়েছে,—

"যে-অফিসারের সুমুখে স্বীকারোক্তি করা হয়েছিলো বলে বলা হয়েছে, এরূপ কোনো স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করার আইনত কোনো ক্ষমতা ছিলো না তাঁর। উক্ত অফিসার ম্যাজিস্ট্রেট নন, সিভিল জজ মাত্র।

"ঐ স্বীকারোক্তিতে আসামী নিজের কাজের সকল দায় থেকে আপনাকে মুক্ত করবার চেষ্টা করেছেন, সুতরাং ঐ তথাকথিত স্বীকারোক্তিকে আইনত স্বীকারোক্তি বলে গণ্য করা চলে না।

"যে-উদ্দেশ্যে ঐ স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ হয়েছিলো তাতে আইনের কোনো দাবী পূর্ণ হয় না।

"ঐ তথাকথিত স্বীকারোক্তি যখন গৃহীত হয়েছিলো তখন আট নম্বর আসামীর প্রবল জ্বর ছিলো। অতএব তিনি যা করছেন বা বলছেন, আইনত তার কি ফল হতে পারে, তা বোঝবার মতো শারীরিক বা মানসিক অবস্থা তখন তাঁর ছিলো না।

"অধিকন্তু আট নম্বর আসামীকে গ্রেফ্‌তার করবার পর তাঁকে এমন অবস্থায় রাখা হয়েছিলো যাতে পুলিশের নির্দ্দেশ অনুসারে চলা ভিন্ন তাঁর আর গত্যন্তর ছিলো না।

"উপরন্তু তাঁর এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনের জীবন, স্বাধীনতা ও ধনসম্পত্তি ভবিষ্যতে সাঙ্ঘাতিকরূপে বিপন্ন হতে পারে, এই ভয় দেখিয়েই ঐ তথাকথিত স্বীকারোক্তিটি তাঁর কাছ থেকে আদায় করা হয়েছিলো। এক কথায় স্বীকারোক্তিটি আসামী স্বেচ্ছায় করেন নি; ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে আদায় করা হয়েছিলো সেটি।

"ঐ স্বীকারোক্তি আইন সিদ্ধ নয়। বিশেষ করে এই আদালতে তার কোনো মূল্য নেই।

"অতএব এই মামলার বিচার সম্পর্কে কোনো উদ্দেশ্যেই আদালত যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐ স্বীকারোক্তিকে গ্রাহ্য না করেন,— আসামীর এই প্রার্থনা।"

অপর একটি আবেদন-পত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে, যেহেতু আসামী জানিয়েছেন যে, তিনি ভারতীয় আইনের আওতায় পড়েন না সেহেতু বাদীপক্ষ স্পষ্টভাবে বলুন যে, আইনের কোন্ ধারা অনুযায়ী আসামীর বিরুদ্ধে তাঁরা স্বীকারোক্তি, সাক্ষীর জবানবন্দী, তদন্ত-তালিকা, সনাক্তকরণ-স্মারকলিপি প্রভৃতি দলিলপত্র দাখিল করবার দাবী করতে পারেন।

এ-দিনের প্রথম সাক্ষী হলো গরিবা টাঙ্গাওয়ালা। তার সাক্ষ্যের সারমর্ম্ম হলো এই:

গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের দিন-দু'-তিন আগে রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় বোম্বাই-এক্সপ্রেস থেকে দু'জন যাত্রী নামেন গোয়ালিয়র স্টেশনে। ডাঃ পারচুরের বাড়ী যাবেন বলে তাঁরা

তার টাঙ্গা ভাড়া করেন। গাড়ি দশ-বারো পা যাবার পরই ঘোড়ার লাগাম যায় ছিঁড়ে। গরিবা তখন আর-একজন টাঙ্গাওয়ালার গাড়িতে সেই যাত্রীদের তুলে দেয়। তার নাম জুম্মা।

শ্রীযুত দফ্‌তরি : সেই রাত্রিতে যে-দু'জন যাত্রী তোমার টাঙ্গা ভাড়া করেছিলো তাদের তুমি সনাক্ত করতে পারো?

আসামীর কাঠগড়ার দিকে গিয়ে গরিবা তখন নাথুরাম ও আপ্তেকে সনাক্ত করে। ইতিপূর্ব্বে বোম্বাইয়েও সে একবার এই দু'জনকেই সনাক্ত করেছিলো।

নাথুরামের পরামর্শক্রমে তাঁর কৌঁসুলি শ্রীযুক্ত ওক, গরিবাকে আর জেরা করেন নি।

তারপর জেরা আরম্ভ করেন শ্রীযুত মঙ্গলে।

শ্রীযুত মঙ্গলে : গোয়ালিয়র রেলওয়ে স্টেশনে যাত্রী দু'জন যেদিন তোমার টাঙ্গা ভাড়া করেছিলেন তার কতোদিন পরে বোম্বাইয়ের সনাক্তকরণ প্যারেডে তাঁদের তুমি সনাক্ত করেছিলে?

উত্তর : প্রায় দু'মাস পরে।

প্রশ্ন : তুমি বলেছো যে, গান্ধী-হত্যার দুই কি তিন দিন আগে এই দুই ব্যক্তি তোমার টাঙ্গা ভাড়া করেছিলেন, কেমন?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : ব্যাপারটা গান্ধী-হত্যার চারদিন আগেকারও তো হতে পারে?

উত্তর : না, তা হতে পারে না।

গরিবা বলে যে, প্রত্যহ রাত্রিতে স্টেশন থেকে বহু যাত্রীকে সে বহন করতো। গান্ধী-হত্যার চারদিন আগেও যে-যাত্রীদের সে বহন করেছে, তার সুমুখে তাঁদের আনলে, গরিবা সহজেই তাঁদের চিনতে পারবে। গান্ধীজী যেদিন নিহত হন সেদিন সন্ধ্যাবেলায় রেডিওতেই সে-সংবাদ গরিবা শুনেছিলো।

শ্রীযুত ডাঙ্গের জেরার উত্তরে সে বলে যে গত ত্রিশ বছর ধরে সে টাঙ্গা চালাচ্ছে, এবং সেই দীর্ঘকালের মধ্যে নিশ্চয়ই সে হাজার-হাজার যাত্রীকে বহন করেছে।

শ্রীযুত ইনামদারের জেরার উত্তরে সে বলে যে, পুলের নিকটবর্ত্তী মহল্লায় ডাঃ পারচুরের যে-বাড়ী আছে তা লাল রঙের কি না, সে বলতে *পারে না। যে-রাত্রির কথা হচ্ছে, দিল্লী-মাদ্রাজ-এক্সপ্রেস সেদিন রাত্রি ৯—৪৫ মিনিটে গোয়ালিয়র স্টেশনে পৌছেছিলো। বোম্বাই-দিল্লী-*এক্সপ্রেস পৌছেছিলো রাত সাড়ে এগারোটায়। স্টেশন থেকে বেরোবার জন্যে উচ্চশ্রেণীর যাত্রীদের যে-ফটক নির্দ্দিষ্ট আছে সেখানে দাঁড়ালে, কোন্ যাত্রী কোন্ গাড়ী থেকে নেমে আসছে, তা দেখা যায়।

গরিবা: গান্ধীজীর হত্যার প্রায় আটদিন পরে রেলওয়ে স্টেশনে আমি দারোগা শ্রীমণ্ডলিককে দেখি। ভোর পাঁচটায় দিল্লী-এক্সপ্রেস থেকে তিনি নামেন। যে-দু'জন যাত্রী ডাঃ পারচুরের বাড়ীতে এসেছিলো, মহাত্মা গান্ধীর হত্যা-ব্যাপারে তারা জড়িত আছে বলে চারিদিকে জোর গুজব রটেছিলো। আমি তখন দারোগা-সাহেবকে বলি যে, ঐ দু'জন যাত্রী প্রথমে আমার ও পরে জুম্মার টাঙ্গায় চড়ে ডাঃ পারচুরের বাড়ী গিয়েছিলো। তার দু'ঘণ্টা পর আমাকে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। রেলওয়ে স্টেশনে দারোগা-সাহেব আমার কাছ থেকে কোনো বিবৃতি লিখে নেন নি। যে-রাত্রে আমি যাত্রী দু'জনকে ডাঃ পারচুরের বাড়ী নিয়ে গিয়েছিলাম সে-রাত্রে জ্যোৎস্না ছিলো।

গরিবার পরে সাক্ষ্য দিতে আসে জুম্মা। সে বলে—

গরিবাকে সে চেনে। যেদিন রাত্রে গরিবা দু'জন যাত্রীকে তার টাঙ্গায় তুলে দেয় সেদিনের কথা মনে আছে তার। মহাত্মা গান্ধী নিহত হবার চারদিন পরে সে ঐ সংবাদ শুনতে পায়। সেই সংবাদ শুনবার তিনদিন আগে গরিবা দু'জন যাত্রীকে তুলে দিয়েছিলো তার

গাড়িতে। তার একটু আগেই রাত সাড়ে এগারোটায় বোম্বাই-দিল্লী-এক্সপ্রেস এসে পৌঁছেছিলো গোয়ালিয়র স্টেশনে।

জবানবন্দীর পর আরম্ভ হয় জেরা।

শ্রীযুত ইনামদার: গত বছর গোয়ালিয়রে কি হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা হয়েছিলো?

সাক্ষী: গত বছর গোয়ালিয়রে হিন্দু-মুসলমানের কয়েকটি দাঙ্গা হয়েছিলো।

প্রশ্ন: দাঙ্গার ফলে কিছু মুসলমান গোয়ালিয়র থেকে পালিয়ে গিয়েছিলো?

উত্তর: কিছু মুসলমান পালিয়ে গিয়েছিলো।

প্রশ্ন: তুমিও কি গোয়ালিয়র ছেড়ে চলে গিয়েছিলে?

উত্তর: আমিও গোয়ালিয়র ছেড়ে লস্করে চলে গিয়েছিলাম।

কারণস্বরূপ সাক্ষী বলে যে, হিন্দু মহাসভার ভয়েই সে গোয়ালিয়র ছেড়েছিলো। সে শুনেছিলো, ডাঃ পারচুরে হিন্দু মহাসভার একজন পাণ্ডা।

অতঃপর কানপুর সেন্ট্রাল স্টেশনের 'সিনিয়ার এনকোয়ারি ক্লার্ক, শ্রীযুত শিউ প্যারেলাল দীক্ষিতের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

তিনি বলেন, ২১শে জানুয়ারি তারিখে জনৈক সঙ্গীসহ একজন লোক এসে একটি বিশ্রামাগার ভাড়া করে সেখানে থাকেন। লোকটি নিজের নাম বলেছিলেন, এন্. ভি. গড্‌সে।

পরবর্তী সাক্ষী হলেন কানপুর স্টেশনেরই অপর একজন এন্‌কোয়ারি ক্লার্ক, নাম শ্রীআনন্দবিহারীলাল শকসেনা। তিনিও শ্রীযুত দীক্ষিতের অনুরূপ সাক্ষ্য দেন। বিশ্রাম-কক্ষের রেজিস্টারি বইয়ে এবং সংশ্লিষ্ট রসিদে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় তিনি নিজের হাতেই লিখে নিয়েছিলেন। রেজিস্টারি বইয়ে গড্‌সের স্বাক্ষরও রয়েছে।

তারপর সাক্ষ্য দিতে আসেন মিসেস্ অ্যাঞ্জেলিনা কলেস্টন। কানপুর স্টেশনের ম্যাট্রন তিনি। বিশ্রামাগার প্রভৃতি পরিষ্কার আছে কি না, তাই দেখা-শোনা করা তাঁর কাজ। ২১শে ও ২২শে জানুয়ারি এই দু'দিন বিশেষ করে তাঁর কাজ সম্বন্ধে তিনি সতর্ক ছিলেন। কারণ ২৩শে তারিখ পরিদর্শকের আসবার কথা ছিলো। ২২শে জানুয়ারি এক নম্বর বিশ্রাম-কক্ষে দু'জন লোককে তিনি দেখেছিলেন। তাঁদের পোষাক পরিচ্ছদ ছিলো অপরিচ্ছন্ন। তিনি খবর নিয়ে জেনেছিলেন যে, স্টেশন কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমেই তাঁরা সেখানে রয়েছেন। তারপর তিনি যখন নিজের কাজ করছিলেন তখন শুনতে পান যে, সিঁড়ির নীচে থেকে কেউ মারাঠি ভাষায় চেঁচাচ্ছে, "নাথুরাম, গাডি আলি" (নাথুরাম, গাড়ি এসেছে)। তারপর তিনি দেখেন যে, ঐ যাত্রীদ্বয়ের একজন একটি 'অ্যাটাচি কেশ' ও একটি বিছানা হাতে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে আসছেন। তখন বেলা প্রায় ১১-২০ মিনিট। সে সময় লক্ষ্ণৌ ঝান্সি মেলের আসবার কথা।

মিসেস্ কলেস্টন, নাথুরামও আপ্তেকে ঐ দু'জন যাত্রী বলে আদালতে সনাক্ত করেন।

শ্রীযুত মঙ্গলের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, ঐ দু'জন যাত্রীকে তিনি প্রায় আট মিনিট ধরে বিশ্রাম-কক্ষের বারান্দার এদিক থেকে ওদিক ঘুরে বেড়াতে দেখেছিলেন। যখন তিনি, 'নাথুরাম, গাড়ি এসেছে,'—এই চীৎকার শুনেছিলেন, সে সময় ঝাড়ুদারকে তিনি দু'নম্বর ঘর পরিষ্কার করবার নির্দ্দেশ দিচ্ছিলেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর মাত্র আর একজনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তিনি পূর্ব্ব-পাঞ্জাব-রেলওয়ের কর্ম্মচারী এবং দিল্লী স্টেশনের 'গাইড' শ্রীরঘুপতি রায় হাণ্ডার।

একুশ

আইন ও বে-আইন

১৪ই জুলাই তারিখেও শুনানির আরম্ভে শ্রীযুত ব্যানার্জি এক আবেদন-পত্র দাখিল করলেন আদালতে। তাতে বলা হয়েছে যে, আজকের অন্যতম সাক্ষী সৈয়দ মনসর আলির সাক্ষ্য কোনরূপেই গ্রহণীয় নয়। আলোচ্য সাক্ষী গোয়ালিয়রের ম্যাজিস্ট্রেট। মামলার অন্যতম আসামী আপ্তে তাঁর কাছে যে-বিবৃতি দিয়েছিলেন বলে বলা হয়েছে তা ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারা অনুযায়ী লিপিবদ্ধ হয় নি। এক্ষেত্রে, আপ্তের নিজের বিরুদ্ধে কোনো স্বীকৃতি ঐ বিবৃতিতে থাকলে তা গ্রহণ করা চলতো। কিন্তু এরূপ কোনো স্বীকৃতি তাতে নেই ; অতএব গ্রহণীয় নয় সেটি। তা ছাড়া আপ্তের বিবৃতিতে গড্‌সে সম্বন্ধে যেসব কথা রয়েছে সেগুলো বলা হয়েছিলো আপ্তের গ্রেফ্‌তারের পর ও ষড়যন্ত্র সম্পূর্ণ হবার শেষে। সুতরাং ভারতীয় সাক্ষ্য-আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী বিবৃতিটি অগ্রাহ্য।

আপ্তের যে বিবৃতির কথা উপরে উল্লেখ করা হলো তার এক জায়গায় আছে যে, গোয়ালিয়রের ডাঃ পারচুরের বাড়ীতে যেখানে গড্‌সে পিস্তল পরীক্ষা করেছিলেন, ম্যাজিস্ট্রেট ও অন্যান্য ব্যক্তিদের সেখানে নিয়ে যাবেন বলে আপ্তে বলেছিলেন।

বাদীপক্ষের কৌঁসুলি শ্রীযুত দফ্‌তরি বলেন যে, আপ্তের বিবৃতির ফলে কিছু, অন্তত পিস্তল পরীক্ষার জায়গাটি—আবিষ্কৃত হয়েছে। সে কারণেও গ্রহণ করা যেতে পারে ঐ বিবৃতি। সে যাই হোক, সাক্ষীর বক্তব্য শোনবার পর বিবেচ্য এই আবেদন-পত্র।

আপ্তের কৌঁসুলি শ্রীযুত মঙ্গলে আবার এক প্রশ্ন তুলে বললেন যে, সাক্ষ্য আইন অনুযায়ী, যে ম্যাজিস্ট্রেট কোনো বিবৃতি লিপিবদ্ধ করবেন

তাঁকে হতে হবে ভারতীয় ডোমিনিয়নের ম্যাজিস্ট্রেট। তা ছাড়া, আপ্তের বিবৃতির ফলে প্রকৃত সত্য আবিষ্কৃত হয় নি কিছু।

বিচারপতি, লিখিতভাবে শ্রীযুত মঙ্গলকে তাঁর বক্তব্য জানাতে বলেন। বিবাদীপক্ষের কৌসুলি যদি—এখন হোক কি পরে হোক—তাঁকে বোঝাতে পারেন যে, লিপিবদ্ধ কোনো-বিবৃতি স্বীকার্য্য নয়, তবে নিশ্চয়ই তা গ্রহণ করবেন না তিনি।

তখন সৈয়দ মনসর আলিকে সাক্ষ্য দেবার জন্যে আহ্বান করা হয়।

তিনি বলেন, গত ফেব্রুয়ারি মাসে গোয়ালিয়রস্থ লস্করে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন তিনি। ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ডাঃ পারচুরের বাড়ী তিনি গিয়েছিলেন, একথা স্মরণ আছে তাঁর। গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জনাব খিজির মহম্মদ এবং গোয়েন্দা বিভাগের ইন্‌স্পেক্টার শ্রীযুত মণ্ডলিক তাঁর আদালতে এসে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন সেদিন। তাঁদের সঙ্গে পার্ক হোটেলে যাবার অনুরোধও জানান তাঁকে। তাঁরা তাকে নিয়ে যান হোটেলের নীচের তলার একটি ঘরে। সেখানে তখন উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুত ডি. পি. থোরাট্ পাতিল, শ্রীযুত এন্. ওয়াই. দেউলকর শ্রীযুত কোর গাঁওকর, গঙ্গা সিং ও কানহাইয়ালাল।

একজন পুলিশ-অফিসার হোটেলের উপরতলা থেকে আপ্তেকে নিয়ে আসেন। আপ্তে তখন তাদের বলেন যে, সকলকেই তনি নিয়ে যাবেন ডাঃ পারচুরের বাড়ীতে। শুধু তাই নয়, গড্‌সে যেখানে পস্তল পরীক্ষা করে দেখেছিলেন সে-স্থানটিও দেখিয়ে দেবেন।

অতঃপর একটি গাড়িতে করে তাঁরা পারচুরের বাড়ীর দিকে যাত্রা করেন। সে সময় গাড়ির চারদিক রঙীন পর্দ্দায় ঢাকা ছিলো।

পারচুরের বাড়ী পৌছে বাঁ দিকের প্রবেশ-পথ দিয়ে তাঁরা অগ্রসর হন বাড়ীর পেছন দিকে। ডান দিকের দরজা ছিলো বন্ধ। আপ্তে প্রথমে এই দরজার দিকে ফিরেই বলেন যে, আগে একবার এই দরজা দিয়েই

বাড়ীর পেছন দিকে গিয়েছিলেন তিনি। যা হোক, পেছন দিকে পৌঁছে সাক্ষী, আপ্তেকে বলেন পেছনের দেয়ালের কাছে তাঁদের নিয়ে যেতে। সেখানে পৌঁছে আপ্তে দেওয়ালের গায়ে একটি কুলুঙ্গি দেখিয়েছিলেন তাঁদের। দেয়ালের গায়ে তিনটি গুলির দাগও দেখেছিলেন সাক্ষী। আর দেখেছিলেন কুলুঙ্গির নীচে মাটির উপর একটি ব্যবহৃত বুলেট।

শ্রীযুত ব্যানার্জির জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, আইনের কোন্ ধারা অনুযায়ী তিনি ডাঃ পারচুরের বাড়ী গিয়েছিলেন তা তিনি জানেন না।

শ্রীযুত ব্যানার্জি: ডাঃ পারচুরের বাড়ী তল্লাসীর পরোয়ানা জারি করবার ক্ষমতা যদি না থাকে আপনার, তা হলে যে সেখানে প্রবেশ করতে পারেন না আপনি,—এ-কথা জানেন কি?

সাক্ষী: খানাতল্লাসীর পরোয়ানা জারি করবার ক্ষমতা না থাকলে আমি যে পুলিশের সঙ্গেও ডাঃ পারচুরের বাড়ী যেতে পারবো না, আইনের এমন বিধান আছে বলে আমি জানি না।

প্রশ্ন: আপনি কি গোয়ালিয়র ফৌজদারি আইন অনুযায়ী কাজ করেছিলেন?

উত্তর: গোয়ালিয়র ফৌজদারি আইন অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে কাজ করেছিলাম আমি।

প্রশ্ন: আপনি সেখানে যা লিখেছিলেন তা ম্যাজিস্ট্রেটের নথিভুক্ত বিষয় হতে পারবে বলেই লিখেছিলেন?

উত্তর না। কাগজপত্র আমি পুলিশকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম। কারণ, আমার আদালতে কোনো মামলার শুনানি মুলতুবি ছিলো না।

শ্রীযুত ইনামদার: জনাব খিজির মহম্মদ বা শ্রীযুত মণ্ডলিক কি আপনাকে বলেছিলেন যে, ভারতীয় ইউনিয়ন হতে আনীত কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পর্কে আপনাকে বিহিত করতে হবে?

সাক্ষী : আদালতে আমাকে তেমন কথা বলা হয় নি।

প্রশ্ন : বোধ করি হোটেলে যাবার পথে আপনাকে বলা হয়েছিলো যে, কোনো ভারতীয় প্রজার সম্পর্কে ব্যবস্থা করতে হবে আপনাকে ?

উত্তর : হ্যাঁ। পার্ক হোটেলে যাবার পথে আমি জানতে পারি যে, উদ্দিষ্ট ব্যক্তিকে ভারতীয় ডোমিনিয়ন থেকে আনা হয়েছে।

প্রশ্ন : বহিষ্করণের ভার কি আপনার উপর প্রদত্ত হয়েছে ?

উত্তর : গোয়ালিয়রে এমন অধিকার আমাকে দেওয়া হয় নি।

প্রশ্ন : তদন্ত করবার উদ্দেশ্যে মুখ্য-বহিষ্করণ-কর্তৃপক্ষের অনুমতি গ্রহণ করা হয়েছে কি না, এ-বিষয়ে পুলিশ-অফিসারদের কাছে আপনি কিছু জানতে চেয়েছিলেন ?

উত্তর : এ-বিষয়ে আমি কোনো অনুসন্ধান করি নি।

প্রশ্ন : আসামী কার হেপাজতে ছিলেন ?

উত্তর : আসামী আপ্তে ছিলেন বোম্বাই পুলিশের হেপাজতে।

প্রশ্ন : আপনার নির্দ্দেশ অনুসারেই কি পুলিশ ও আসামী আপনার সঙ্গে ডাঃ পারচুরের বাড়ী গিয়েছিলেন ?

উত্তর : আমি বোম্বাই বা গোয়ালিয়র পুলিশকে, কিংবা আপ্তেকে এমন কোনো আদেশ দিই নি।

প্রশ্ন : সুতরাং আপনি যা-কিছু করেছিলেন, গোয়ালিয়র পুলিশের অনুরোধেই করেছিলেন ?

উত্তর : আসামী আপ্তের অনুরোধেই আমি ডাঃ পারচুরের বাড়ী গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : ডাঃ পারচুরের বাড়ী ঢুকবার আগে আপনি কি পুলিশ ও সাক্ষীদের তল্লাস করেছিলেন ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : গৃহ-প্রবেশের পূর্ব্বে কি পুলিশের নিকট আপনি ডাঃ পারচুরের সন্ধান নিয়েছিলেন ?

উত্তর : আমি আগেই জানতাম, ডাঃ পারচুরে পুলিশ-হাজতে আটক আছেন। অতএব এ-সম্পর্কে কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করি না।

প্রশ্ন : খানাতল্লাসের সময় ডাঃ পারচুরের বাড়ীর কোনো পুরুষ কি আপনাদের সঙ্গে ছিলেন ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : তদন্ত সম্পর্কে আপনি যা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাতে কি আপ্তে বা ডাঃ পারচুরের বাড়ীর কোনো পুরুষের স্বাক্ষর নিয়েছিলেন ?

উত্তর : না।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর গোয়ালিয়র রাজ্যের কর্ম্মচারী-বলে-পরিচিত শ্রীমধুকর কেশব কালে সাক্ষ্য দান করেন। তিনি বলেন,—

ডাঃ পারচুরের সঙ্গে বিশেষরূপ জানাশোনা আছে তাঁর। ২৮শে জানুয়ারি ব্যাঙ্কে যাবেন বলে তিনি আপিস থেকে বেরোন। গোয়ালিয়রের মহারাজা ও হিন্দু মহাসভার মধ্যে চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা দান করার ফলে, মহাসভা সে-বিষয়ে কি ব্যবস্থা করতে চান, তাই জানবার জন্যে, যাবার পথে তিনি পারচুরের বাড়ী যান। পারচুরে তখন বসেছিলেন তাঁর হল-ঘরে। আরো তিনজন লোক ছিলেন সেখানে। তাঁদের একজন দণ্ডবতে। পরে জানতে পেরেছিলেন যে, অপর দু'জন ছিলেন নাথুরাম গড্‌সে ও নারায়ণ আপ্তে।

গড্‌সে ও আপ্তের হাতে ছিলো দু'টি রিভলবার। রিভলবারের ঘোড়া টিপবার চেষ্টা করছিলেন তাঁরা। ব্যর্থ চেষ্টার পর দণ্ডবতেকে তাঁরা বলেন একটি পিস্তল যোগাড় করে দিতে। দণ্ডবতে তখন গড্‌সে ও আপ্তেকে নিয়ে চলে যান প্রাঙ্গণের দিকে, সাক্ষীও অনুগমন করেন তাঁদের।

ঐ দুই ব্যক্তির একজনের কাছ থেকে দণ্ডবতে চেয়ে নেন একটি কার্তুজ। সেটি রিভলবারে পুরে উপরের দিকে আকাশ লক্ষ্য করে গুলি করেন তিনি। অতঃপর অন্য দু'জনও রিভলবারে কার্তুজ পুরে গুলি ছোড়বার ব্যর্থ চেষ্টা করেন। তখন তাঁরা দণ্ডবতেকে আবার বলেন একটি ভালো রিভলবার যোগাড় করে দিতে। তাঁরা আরও বলেন যে, তাঁদের দলের সবাই ইতিপূর্ব্বেই চলে গেছে, আড়াইটা কিংবা তিনটার গাড়িতে তাঁদেরও চলে যেতে হবে; অতএব খুব শীগগীরই একটি রিভলবার তাঁদের চাই-ই। সেজন্যে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত থাকতে স্বীকৃত হয়েছিলেন তাঁরা।

এসব কথাবার্ত্তা হয়েছিলো পারচুরের বাড়ীর প্রাঙ্গণে। পারচুরে তখন প্রাঙ্গণে উপস্থিত ছিলেন না। সাক্ষী নিজে একটি রিভলবার হাতে নিয়ে দেখেছিলেন। রিভলবারটি ছিলো দেশী।

অতঃপর তাঁরা সকলেই যান পারচুরের উপর তলাকার ঘরে। কিছু কথাবার্ত্তার পর আবার তাঁরা নেমে আসেন নীচে। সেখানে গোয়ালিয়রের রাজনীতি সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা হয়। ব্যাঙ্কে যান তিনি অপরাহ্ন ১—৪০ মিনিটে।

পারচুরের সঙ্গে সাক্ষীর আবার দেখা হয় ৩০শে জানুয়ারি সন্ধ্যা ছ'টার সময় মারাঠা বোর্ডিং হাউসের সুমুখে। সাক্ষী তাঁকে জানান যে, বেতারে মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু-সংবাদ ঘোষণা করা হয়েছে। পারচুরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, মহাত্মা গান্ধীর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, না তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। উত্তরে তিনি বলেন, মহাত্মা গান্ধী মারা গেছেন,—এই সংবাদই শুধু পাওয়া গেছে। তাঁকে হত্যা করা হয়েছে কি না, পরিষ্কার বুঝা যায় নি। সাক্ষীর অনুরোধে, মহাত্মার মৃত্যু উপলক্ষে, পারচুরে তাঁর ডিস্পেন্সারি বন্ধ করে দেন।

৩১শে তারিখে সাক্ষী, মহাত্মা গান্ধীর আততায়ী বলে কথিত ব্যক্তির

নাম শুনতে পান। সে নামটি হচ্ছে,—নাথুরাম। সাক্ষী তাঁর বন্ধুদের বলেন, এ নিশ্চই নাথুরাম গড্‌সে।

১লা ফেব্রুয়ারি তারিখে সম্পূর্ণ কাহিনীটি তিনি তাঁর মায়ের কাছে বলেছিলেন। ২রা ফেব্রুরারি তারিখেও তাই বর্ণনা করেন শঙ্কর পাওয়ার, গঙ্গাধর পটবর্দ্ধন ও মধুকর খিরের কাছে। পটবর্দ্ধন তাঁকে বলেন যে, ঘটনাটি সরকারকে জানানো উচিত। এই উদ্দেশ্যেই তাঁরা স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত গুলের বাড়ী যান। মধুকর খিরেও সঙ্গে ছিলেন তাঁদের। স্বরাষ্ট্র-সচিবকে সংক্ষেপে সম্পূর্ণ ঘটনাটি তিনি জানিয়েছিলেন।

জবানবন্দীর পর সাক্ষীকে জেরা করা হয়। শ্রীযুত ইনামদারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, ডাঃ পারচুরের দাদা শ্রীযুত কে. এস. পারচুরেকে তিনি জানেন। গত দু'-তিন বছর ধরে জগদীশ গোয়েলের সঙ্গেও পরিচয় আছে তাঁর। জগদীশ হিন্দু-রাষ্ট্র-সেনার সদস্য। গত ৩০শে জানুয়ারি, পাঁচ মিনিট কাল তিনি ডাঃ পারচুরের ডাক্তারখানায় ছিলেন। মধুকর খিরেও ছিলেন সেখানে। গান্ধীজীর প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের নিমিত্ত তিনি খিরের সুমুখেই ডাঃ পারচুরেকে তাঁর ডাক্তার-খানা বন্ধ করবার অনুরোধ জানিয়েছিলেন।

২রা ফেব্রুয়ারি, সকাল, দুপুর ও সন্ধ্যায় পটবর্দ্ধনের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিলো।

শ্রীযুত ইনামদার: পটবর্দ্ধনের সঙ্গে যখন আপনার কথা হয়, খিরে তখন সেখানে ছিলেন?

সাক্ষী: সন্ধ্যাবেলাকার আলাপ-আলোচনার সময় খিরে উপস্থিত ছিলেন।

প্রশ্ন: তৃতীয়বারের আলাপ-আলোচনার সময়েই পটবর্দ্ধন আপনার কাছ থেকে কোনো সংবাদ সংগ্রহ করবার চেষ্টা করেছিলেন?

উত্তর : ঘটনার সম্বন্ধে আমার কিছু জানা থাকলে তার বিশদ বিবরণ তাঁকে জানাবার জন্যে পটবর্দ্ধন আমাকে অনুরোধ করেছিলেন।

প্রশ্ন : খিরে যখন উপস্থিত ছিলেন সে-সময়কার আলাপ-আলোচনাকালেও কি পটবর্দ্ধন ঐ-কথা বলেছিলেন ?

উত্তর : না।

পটবর্দ্ধন গোযালিয়রের স্ববাষ্ট্র-সচিবের মোটর গাড়ি নিয়ে এসেছিলেন। স্বরাষ্ট্র-সচিবের বাডী পৌছেন তাঁরা রাত্রি সাড়ে আটটার পর। সেখানে ছিলেন তাঁরা আধ ঘণ্টা। সাক্ষীকে যখন গ্রেফ্‌তার করে থানায় নিযে যাওয়া হয় তখন সেখানে ডাঃ কিশোব, বামচবণ এবং আরো পাঁচ-ছ'জনকে তিনি দেখতে পান।

শ্রীযুত ইনামদাব : গান্ধী-হত্যা সংক্রান্ত ব্যাপাবে সংবাদ দেওয়াব জন্যে পটবর্দ্ধন কি আপনাকে বথশিশ কবেছিলেন ?

সাক্ষী : না।

প্রশ্ন : সংবাদ না দিলে গান্ধী-হত্যার মামলায আপনাকে জড়ানো হবে বলে পটবর্দ্ধন ভয় দেখিযেছিলেন আপনাকে ?

সাক্ষী : না।

বাইশ

"মিষ্টান্নম্—"

অতঃপর সাক্ষ্য দেন গোয়ালিয়রস্থ জনৈক ছাত্র শ্রীমধুকর বালকৃষ্ণ খিরে। তাঁর বয়স বিশ।

তিনি বলেন, গত পাঁচ-ছ' বছর ধরে পারচুরেকে জানেন তিনি। হিন্দু রাষ্ট্র সেনার প্যারেডে সাক্ষী যোগদান করতেন। ডাঃ পারচুরে ছিলেন সেই 'সেনা'দলের প্রধান। পারচুরের বাড়ীতেও যেতেন তিনি।

গত ৩০শে জানুয়ারি সন্ধ্যা ছ'টার সময়েই মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু সংবাদ তিনি জানতে পারেন। সংবাদ শুনেই তিনি যান পারচুরের ডাক্তার খানায়। তাঁকে বলেন, মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করার ফলে গান্ধীজীর নীতির বিরোধিতা করা আর সম্ভবপর নয়। গান্ধীজীকে কার পক্ষে হত্যা করা সম্ভব, এ-কথাও জিজ্ঞাসা করেছিলেন পারচুরেকে। উত্তরে পারচুরে বলেন, যে এই হত্যা করেছে সে 'আমাদেরই মতো কেউ' হবে নিশ্চয়।

সাক্ষী, ডাঃ পারচুরেকে তাঁর ডাক্তারখানা বন্ধ করতে বলেন এবং তিনি তা করেনও। তারপর তাঁরা নিজ নিজ গৃহাভিমুখে যাত্রা করেন। পারচুরের সঙ্গে তিনি রাজপুত বোর্ডিং হাউস পর্য্যন্ত গিয়েছিলেন। সেখানে রামদয়াল সিংকে ডেকে পারচুরে বলেন যে, তাঁর কাজ তিনি শেষ করেছেন, বাকি কাজ শেষ করতে হবে রামদয়ালকেই। পারচুরে আরো বলেছিলেন, "আমাদের আন্দোলন সফল হবেই।"

তারপর পারচুরের সঙ্গে আসেন পারচুরের বাড়ীতে। তখন বেতারে খবর বলা হচ্ছে। সেখানে কিছু মিঠাই কিনে এনে বিতরণ করা হয়েছিলো। কে মিষ্টি আনতে দিয়েছিলেন, সাক্ষীর তা মনে নেই। তবে এটুকু স্মরণ আছে যে, রূপা নামে হিন্দু রাষ্ট্র সেনার একজন সদস্য মিষ্টি কিনে এনেছিলেন। রূপা, পারচুরের সঙ্গে প্রায় সব সময়েই ঘোরা ফেরা করতেন।

গঙ্গাধর পটবর্দ্ধনকেও জানেন তিনি। একই বাড়ীতে তাঁরা থাকতেন। মহাত্মা গান্ধীকে কে হত্যা করেছে, এই নিয়ে আলোচনা হয়েছিলো। পটবর্দ্ধনের সঙ্গে দেখা হলে পটবর্দ্ধন বলেছিলেন, "আততায়ী নিশ্চই একজন মারাঠি"।

সেই রাত্রেই সাক্ষী দিল্লী যাত্রা করেন। সেখানে একদিন থেকে গান্ধীজীর শব শোকযাত্রা দেখে, ১লা ফেব্রুয়ারি আবার গোয়ালিয়রে ফিরে আসেন। পারচুরের বাড়ী গিয়ে তিনি তাঁকে সেখানে দেখতে পান নি। সেদিন সকালেই পটবর্দ্ধনের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর।

মধুকর কালেকেও জানতেন তিনি। ১লা তারিখে রাস্তায় হঠাৎ তাঁর সঙ্গে দেখা হয়। খানিক পরে পটবর্দ্ধনও আসেন সেখানে। কালে সাক্ষীকে বলেন যে, তিনি গড্‌সে ও আপ্তেকে দেখেছিলেন। কখন, কোথায় তাঁদের দেখেছিলেন, তা বলেন নি। তাদের কাছে সবকিছু বলবার জন্যে পটবর্দ্ধন তখন অনুরোধ করেন কালেকে। কালে তখন বলেন যে, পটবর্দ্ধনের কাছে তিনি কিছু বলবেন না, কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষের কাউকে, তিনি যা জানেন, বলতে পারেন।

পটবর্দ্ধন তখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গিয়ে আবার পাঁচ মিনিট পরেই একটি মোটর গাড়ি নিয়ে ফিরে আসেন। তারপর তাঁরা তিনজনেই যাত্রা করেন স্বরাষ্ট্র-সচিবের গৃহাভিমুখে। ভাবে নামক এক ব্যক্তিও গিয়েছিলেন তাঁদের সঙ্গে। স্বরাষ্ট্র-সচিবের কাছে কালে তখন সম্পূর্ণ কাহিনীটি বর্ণনা করেন।

শ্রীযুত ইনামদারের জেরার উত্তরে তিনি বলেন যে, পটবর্দ্ধন ও সাক্ষী পরস্পর এমনভাবে মেলামেশা করতেন যাতে মনে হতো তাঁদের মধ্যে আছে আত্মীয়তার সম্পর্ক। পটবর্দ্ধন কোনো বীমা প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন।

শ্রীযুত ইনামদার: পটবর্দ্ধন কি গোয়েন্দা বিভাগের লোক?

সাক্ষী: না।

প্রশ্ন: কখনো কি তিনি সেই বিভাগে ছিলেন?

উত্তর: না।

প্রশ্ন: ডাঃ পারচুরেকে আপনি কেন ডাক্তারখানা বন্ধ করতে বলেছিলেন?

উত্তর: মহাত্মার মৃত্যুর দরুণ অন্যান্য দোকানও বন্ধ হয়ে গিয়েছিলো। আমি ভেবে ছিলাম যে, ডাঃ পারচুরের ডাক্তারখানা বন্ধ করলেও ভালো হয়।

প্রশ্ন : 'কালে'ও কি ডাঃ পারচুরেকে ডাক্তারখানা বন্ধ করতে বলেছিলেন ?

উত্তর : আমার সুমুখে কিছু বলেন নি।

মধ্যাহ্ন-ভোজের পর সাক্ষ্য আরম্ভ হয় শ্রীরামদয়াল সিংয়ের। তিনি গোয়ালিয়রের জমিদার এবং রাজপুত সেবা সঙ্ঘের সভাপতি। আগে ছিলেন তিনি একটি সংবাদপত্রের স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক।

যে-সময়ে তিনি মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শোনেন সে-সময়ে ছিলেন তিনি লস্করস্থ রাজপুত বোর্ডিং হাউসে। ঐ সংবাদ পেয়েই তিনি একটি শোক-সভার আয়োজন করেছিলেন।

পতাকা-দণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে তিনি কথা কইছিলেন তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে। জগন্নাথ সিংও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। সভার আয়োজন হচ্ছিলো বোর্ডিংএর উপরতলাকার হলঘরে। এমন সময় এলেন ডাঃ পারচুরে। সঙ্গে আরো দু'জন লোক। পারচুরে এসেই হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন, "একটি ভালো কাজ সারা হয়েছে।" তারপর বললেন, খুন করা হয়েছে একজন হিন্দুধর্ম্মবিরোধীকে। হিন্দুধর্ম্ম নিরাপদ হবে এবার। গান্ধীজীকে যে হত্যা করেছে সে তাঁদেরই নিজের লোক ("গান্ধীকো মারনেবালা আপনা হি আদ্‌মি হ্যায়")। কয়েকদিন আগে যে-লোক বোমা নিক্ষেপ করেছিলো সেও তাঁদেরই একজন।

পারচুরে বলে যেতে লাগলেন, পিস্তল পাঠানো হয়েছিলো গোয়ালিয়র থেকে। গান্ধীজীর হত্যাকারী দক্ষিণ-ভারতের লোক। গোয়ালিয়র হয়েই সে দিল্লী গিয়েছিলো।

সাক্ষী সর্ব্বক্ষণ চুপ করেই ছিলেন। জগন্নাথ সিং দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর পাশে। তিনি পারচুরেকে চলে যেতে বলেন সেখান থেকে। পারচুরে তখন সঙ্গীদের নিয়ে চলে যান। জগন্নাথ সিং সাক্ষীকে বলেন যে, ডাঃ পারচুরে যা বলেছেন তার মধ্যে সত্য থাকতে পারে কিছু।

তারপর সাক্ষী চলে যান সভায় যোগদান করতে।

শ্রীযুত ইনামদার জেরা করেন: "রাজপুত সেবা সঙ্ঘ" কিরূপ প্রতিষ্ঠান,—রাজনৈতিক না সামাজিক?

সাক্ষী: প্রতিষ্ঠানটি রাজনৈতিক ও সামাজিক, দুই-ই।

প্রশ্ন: একথা কি সত্য যে, মন্ত্রীসভায় আপনি অংশ গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন?

উত্তর: হ্যাঁ, রাজপুত সেবা সঙ্ঘ দু'টি আসন চেয়েছিলো মন্ত্রীসভায়।

প্রশ্ন: মন্ত্রীসভায় রাজপুত সেবা সঙ্ঘের কোনো প্রতিনিধিকে গ্রহণ না করায় আপনি কি ৩০শে জানুয়ারির মধ্যে কোনো আন্দোলন সুরু করবার মতলব করেছিলেন?

উত্তর। হ্যাঁ।

পরবর্তী সাক্ষীর নাম শ্রীজগন্নাথ সিং। তিনি গোয়ালিয়রের একজন জমিদার ও ফরেস্ট্ কন্ট্রাক্টার। রাজপুত সেবা সঙ্ঘেরও সদস্য তিনি।

৩০শে জানুয়ারি সকালে যখন পারচুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় তখন পারচুরে তাঁকে বলেন যে, এক সপ্তাহের মধ্যে একটা কিছু ঘটবে। তারপর সেদিনই আবাব পারচুরের সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সন্ধ্যা প্রায় সাতটার সময়। শোকসভায় যোগদান করবার জন্যে তিনি তখন গিয়েছিলেন রাজপুত বোর্ডিং হাউসে। পারচুরে সেখানে এসে বলেছিলেন যে, একটি কাজ তাঁর শেষ হয়েছে। কারো নাম না করে পারচুরে বলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর আততায়ী তাঁদের নিজের লোক। দক্ষিণভারতবাসী সে। গোয়ালিয়র থেকেই সে পিস্তল নিয়ে গিয়েছিলো। আর মদনলাল, যে বোমা ফেলেছিলো ক'দিন আগে,—সেও তাদের লোক। সাক্ষী তখন পারচুরেকে বেরিয়ে যেতে বলেন বোর্ডিং হাউস থেকে।

সাক্ষীকে অতঃপর ডাঃ পারচুরেকে সনাক্ত করতে বলা হয়। বিনায়ক দামোদর সাভারকরকে দেখিয়ে সাক্ষী বলেন, তিনিই ডাঃ পারচুরে। তারপর সাক্ষীর কাঠগড়ায় ফিরে এসে বলেন যে, ডাক্তার-সাহেব পেছনে বসে আছেন। তখন আবার আসামীর কাঠগড়ার কাছে গিয়ে পারচুরেকে সনাক্ত করেন।

আসামী আপ্তে আপত্তি জানান এ-ব্যাপারে। তিনি বলেন যে, সাক্ষী আগে যখন পারচুরে বলে সাভারকরকে দেখিয়েছিলেন তারপর সরকারপক্ষের কৌশুলিকে সাক্ষীর সঙ্গে কথা কইতে দেখা গিয়েছিলো, একথা আপ্তে শুনেছেন। সরকারপক্ষের কৌশুলি শ্রীযুত এন. কে. পেতিগারা বলেন, "আমি এর (আপ্তের কথার) বিরুদ্ধে আপত্তি জানাচ্ছি।"

বিচারপতি বলেন, আসামী-যে প্রথমে সাভারকরকে দেখিয়েছিলেন, এ-কথা লিখে রাখছেন তিনি।

শ্রীযুত ইনামদারের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, বোর্ডিং হাউসে ডাঃ পারচুরে যা বলেছিলেন সে-সম্পর্কে তিনি পুলিশে কোনো রিপোর্ট করেন নি।

১৬ই জুলাই তারিখের প্রথম সাক্ষী দিল্লীর জনৈক লম্বরদার, শ্রীগগন সিং।

৩০শে জানুয়ারি বিড়লা ভবনে প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন তিনি। ঐদিন একটি রিভলবার, চারটি কার্ত্তুজ, দু'টি খালি কার্ত্তুজের খোল, দু'টি ব্যবহৃত বুলেট ও একটি স্কন্ধচর্ম্মবন্ধনী পাওয়া যায়। পরীক্ষার পর প্রাপ্ত দ্রব্যগুলি 'সীল' করে রাখা হয়। তারপর বিভিন্ন দিনে আরো দু'বার তাঁর উপস্থিতিতেই আরো কিছু দ্রব্য 'সীল' করা হয়। প্রথমবার করা হয় একটি খালি কার্ত্তুজের খোল, দ্বিতীয়বার একটি হাতবোমা।

তারপর সাক্ষ্য দেন নয়াদিল্লীর পার্লামেণ্ট স্ট্রীট থানার দারোগা শ্রীবিহারীলাল।

৩০শে জানুয়ারি, দিল্লী জংসন রেলওয়ে স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর বিশ্রাম-কক্ষে ফেলে-আসা নাথুরামের বিছানা ও দু'টি কেম্বিস ব্যাগ ক্রোক করবার নির্দেশ তিনি পেয়েছিলেন। কেম্বিস ব্যাগে ছিলো কিছু কাপড়-চোপড়, বই আর সংবাদপত্র। বিছানার মধ্যেও কাপড়-চোপড় ছিলো।

বিছানা, কেম্বিস ব্যাগ দু'টি, কাপড়-চোপড় ইত্যাদি আদালতে প্রদর্শিত হয়। গড্‌সের কৌঁসুলি শ্রীযুত ওক আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দেখান যে, কোনো বইয়ের উপরেই নাম লেখা নাই। শ্রীযুত ওকের জেরার উত্তরে বিহারীলাল বলেন যে, স্টেশনে যাবার সময় নাথুরামকে সঙ্গে নিয়ে যান নি তিনি। স্টেশনের বিশ্রামঘর তালাবন্ধ ছিলো না।

তেইশ

গোয়ালিয়র দুর্গে

১৯শে জুলাই তারিখে গোয়ালিয়রের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত বি. আর. অটলের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। গত ১৮ই ফেব্রুয়ারি গোয়ালিয়র দুর্গের অভ্যন্তরে তিনি স্বয়ং, গান্ধী-হত্যা মামলার অন্যতম আসামী ডাঃ পারচুরের এক স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। সাক্ষ্য দিতে এসে সেই স্বীকারোক্তিটি পাঠ করেন তিনি। স্বীকারোক্তিটি অংশত এইরূপ :

"১৯৩৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর থেকে আমি গোয়ালিয়রে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছি। ১৯৩৯ সালে গোয়ালিয়রে আমি হিন্দু রাষ্ট্র সভার প্রতিষ্ঠা করি। ছ'মাস পরে আমি আর-একটি সমিতি গঠন করি, তার

নাম হিন্দু রাষ্ট্র সেনা। হিন্দু সভা দল থেকে সেটি ছিলো স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। প্রথমে রাষ্ট্র সেনার সদস্য ছিলো চল্লিশ জন। ১৯৪৮ সালে ঐ সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় তিন হাজারে। সেনা দলের উদ্দেশ্য ছিলো হিন্দুদের উন্নতি বিধান ও হিন্দু জাতির পুনর্গঠন। ১৯৪২ সাল থেকে রাষ্ট্র সেনার সর্ব্বাধিনায়কের পদে অধিষ্ঠিত আছেন সন্ত পাবলেগাঁওকর মহারাজ। বর্ত্তমানে আমি ছিলাম গোয়ালিয়র স্টেট হিন্দু সভার সভাপতি।

"১৯৪১ সাল থেকে নাথুরাম গড্‌সের সঙ্গে আমার পরিচয়। হিন্দুরাষ্ট্র দল ও হিন্দুরাষ্ট্র সেনা এই দু'টি প্রতিষ্ঠানের একত্রীকৃতকরণ সম্পর্কে হিন্দুরাষ্ট্র দলের কর্ম্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবার জন্যে ঐ বৎসরেই আমি পুণা ও বোম্বাইয়ে গিয়েছিলাম। পুণায় নাথুরামের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। তাঁর সঙ্গে আলাপও করি উক্ত বিষয়ে। কিন্তু মতের মিল হয় নি আমাদের মধ্যে। ঐ সময় থেকেই নাথুরামের সঙ্গে আমার বিশেষ সদ্ভাব ছিলো না।

"গত ২৭শে জানুয়ারি রাত্রি প্রায় এগারোটার সময় আমার বড়ো ছেলে নীলকণ্ঠ আমার ঘরে এসে বলে যে, দু'জন অতিথি এসেছেন। নীচে নেমে এসে বিস্মিত হয়ে দেখি, অতিথি দু'জন আর কেউ নন, তাঁরা শ্রীনাথুরাম গড্‌সে ও শ্রীনারায়ণরাও আপ্তে। আমি জিজ্ঞাসা করি তাঁদের, "পূর্ব্বাহ্নে খবর না দিয়েই আপনারা এসে হাজির হয়েছেন, তার কারণ কি?" নাথুরাম উত্তর করেন, বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নিয়েই এসেছেন তিনি।

"গড্‌সে ও আপ্তে আমাকে বলেন যে, ২রা ফেব্রুয়ারির আগেই তাঁরা একটি সাংঘাতিক কাজ করবেন। সেই সাংঘাতিক কাজটি হচ্ছে দিল্লীতে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা। তারপর নাথুরাম আমাকে একটি রিভলবার দেখিয়ে বলেন যে, গোয়ালিয়র থেকে আরো ভালো একটি রিভলবার চেষ্টা করে আমাকে যোগাড় করে দিতে হবে। কারণ যে-

রিভলবারটি তিনি দেখিয়েছিলেন সেটির ঘোড়া ছিল অত্যন্ত কড়া। পাঁচ-ছ' রাউণ্ড গুলীও ছিলো নাথুরামের সঙ্গে। আমি তাঁকে বলি যে, আমার একটি পিস্তল আছে বটে, কিন্তু কিছুতেই তা আমি অন্য কাউকে দিতে পারবো না। যদি সম্ভব হয়, আগামী কাল একটি পিস্তল কিংবা রিভলবার সংগ্রহ করবার চেষ্টা করতে পারি। গড্‌সে ও আপ্তেকে আমি চা খেতে দিয়েছিলাম; কিন্তু গড্‌সে চা খেতে চান নি। তারপর আমি উপরে গিয়ে শুয়ে পড়ি।

"২৮শে জানুয়ারি সকালে গড্‌সে ও আপ্তেকে আমি জানাই যে, আমি আমার একজন কর্ম্মীকে ডাকিয়ে আনাচ্ছি, প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে তাঁরা কথা কয়ে দেখতে পারেন। ছত্রীবাজার থেকে নানা দণ্ডবতেকে ডেকে আনবার জন্যে আমি আমার ছেলে নীলকণ্ঠ ও আমার দেহরক্ষী রূপোকে পাঠাই। ফিরে এসে তারা জানায় যে, দণ্ডবতেকে পাওয়া যায় নি। তারপর আমি রোগী দেখবার জন্যে চলে যাই আমার ডাক্তারখানায়। মধ্যাহ্নে বাড়ী ফিরে এসে দেখি, আমার বাড়ীর নীচের তলাকার ঘরে বসে আছেন নানা দণ্ডবতে, গড্‌সে ও আপ্তে। গড্‌সে ও আপ্তেকে আমি পূর্ব্বেই বলে গিয়েছিলাম যে, নানা দণ্ডবতে এলে আমার অনুপস্থিতিতে তাঁরা নিঃসন্দেহে সব বিষয়েই তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে পারেন। আরো বলেছিলাম, দণ্ডবতে আমার বিশ্বাসী লোক, তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনে তিনি সাহায্য করবেন।

"আমার অনুপস্থিতিতেই গড্‌সে ও আপ্তে, দণ্ডবতেকে আরো-ভালো ও বিশ্বাসযোগ্য আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহ করে দিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ডাক্তারখানা থেকে বাড়ী ফিরে আমি দেখতে পাই যে, তাঁরা সকলে মিলে একটি দেশী রিভলবার পরীক্ষা করছেন। আমার বাড়ীর প্রাঙ্গণেই তাঁরা তিনজন সেই দেশী রিভলবার থেকে গুলী ছুড়ে অস্ত্রটি পরীক্ষা করেন। আমি কেবল একটি গুলীর আওয়াজ শুনেছিলাম। যখন গুলী ছোড়া

হয়, আমি তাঁদের সঙ্গে ছিলাম না। রিভলবারটি গড্‌সে ও আপ্তের পছন্দ হয় নি। দণ্ডবতেকে ফেরৎ দেওয়া হয় সেটি।

"গড্‌সে ও আপ্তে বলেছিলেন যে, মেল ট্রেনে চলে যাবেন তাঁরা, তার আগেই একটি রিভলবার যোগাড় করে দিতে হবে। আমি তাঁদের বলি যে, এই সময়ের মধ্যে রিভলবার সংগ্রহ করা সম্ভবপর হবে না, ইচ্ছা করলে তাঁরা চলে যেতে পারেন। তাতে তাঁরা বলেন যে, রাত্রি পর্য্যন্ত থাকতে পারেন তাঁরা। আমরা সকলে একসঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজন করি। আহারের পর বর্ত্তমান রাজনৈতিক 'পরিস্থিতি' সম্পর্কে আলোচনা হয় আমাদের মধ্যে। এই আলোচনার সময় তাঁরা বলেন যে, দিল্লীতে প্রার্থনা সভায় বোমা-নিক্ষেপকারী মদনলাল না কি আমাকে চেনেন। আমি বলি যে, তাঁকে কখনো দেখিও নি, নামও কখনো শুনি নি তাঁর।

"সন্ধ্যাবেলায় দণ্ডবতে একটি পিস্তল নিয়ে আমার বাড়ীতে আসেন। কোত্থেকে তিনি সেটি এনেছিলেন আমি জানতাম না। এই পিস্তলটি ছিলো একটি স্বক্রিয় (automatic) পিস্তল। দণ্ডবতে এগারো-বারো রাউণ্ড গুলীও এনেছিলেন সঙ্গে। গড্‌সে ও আপ্তে পছন্দ করেন এই পিস্তলটি। দণ্ডবতে পিস্তলটির দাম বলেন পাঁচশো টাকা। আপ্তে তখুনি তাঁকে ছু'শো টাকা দিয়ে দেন। বাকি টাকা পরে দেবেন বলে জানান।

"সেইদিনই রাত্রি সাড়ে দশটায় দণ্ডবতে একটি টাঙ্গা নিয়ে এলে গড্‌সে ও আপ্তে তাতে চড়ে যাত্রা করেন রেলওয়ে স্টেশনের দিকে। তাঁরা চলে যাবার পর আমি শয়নঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। দণ্ডবতেও চলে যান তাঁর বাড়ীতে।

"পরদিন, অর্থাৎ ২৯শে জানুয়ারি, আমি আমার দাদা কৃষ্ণরাও পারচুরেকে বলি যে, দিল্লীতে গান্ধীজীকে হত্যা করার পরিকল্পনা নিয়ে ছু'জন ভদ্রলোক দেখা করতে এসেছিলেন আমার সঙ্গে; আমি একটি

পিস্তল যোগাড় করে দিয়েছি তাঁদের। আমার কথা শুনে মর্ম্মাহত হয়ে তিনি বলেন, "এ ব্যাপারে তুমি আবার জড়াতে গেলে কেন?"

"৩০শে জানুয়ারি সন্ধ্যা ছ'টার সময়ে হেঁটে আমি আমার ডাক্তারখানায় যাচ্ছিলাম। পথে মধুকর কালে আমাকে বলেন যে, বেতারযোগে গান্ধীজীর হত্যার সংবাদ প্রচারিত হয়েছে বলে কেউ তাঁকে খবর দিয়েছে। আমি ডাক্তারখানায় গিয়ে পনেরো মিনিটের মধ্যেই ডাক্তারখানা বন্ধ করে বাড়ী ফিরে আসি। বাজার থেকে মিষ্টি কিনে আনবার জন্যে ভৃত্য রূপোকে একটি টাকা দিই আমি। তখন হিন্দু রাষ্ট্র সেনার দশ-পনেরোজন সদস্য আমার বাড়ীতে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে মিষ্টি বিতরণ করে দিই আমিই। গড্সে ও আপ্তে সঙ্গে করে যে-রিভলবারটি এনেছিলেন সেটি তাঁদের সঙ্গেই ছিলো, না দণ্ডবতেকে সেটি দেওয়া হয়েছিলো, বলতে পারি না আমি। আমার একটি ভাঙা স্টেনগান আছে। সেটি আমি রেখে দিয়েছিলাম মোরারে আমার এক বন্ধুর কাছে, তাঁর নাম রামকান্ত পুরাণিক।"

স্বীকারোক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অন্য একটি পত্রে শ্রীযুত অটল বলেছেন: ডাঃ দত্তাত্রেয় সদাশিব পারচুরেকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম যে, স্বীকারোক্তি করা-না-করা সম্পর্কে তাঁর বাধ্যবাধকতা নেই কিছু; কিন্তু তিনি যদি স্বীকারোক্তি করেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে সেটি সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। আমি বিশ্বাস করি, স্বেচ্ছায় ঐ স্বীকারোক্তি করা হয়েছিলো। আমার উপস্থিতিতেই উহা গৃহীত হয়েছিলো। যিনি স্বীকারোক্তি করেছিলেন তাঁকে সেটি পড়েও শোনানো হয়েছিলো। যথাযথ বলেই সেটিকে তিনি স্বীকার করেছিলেন। এই স্বীকারোক্তিতে তাঁর বিবৃতিটি সম্পূর্ণ যথাযথভাবেই লিপিবদ্ধ হয়েছে

স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করবার আগে ডাঃ পারচুরে বলেছিলেন: আমি বেশ জানি যে, আমি একজন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত রয়েছি। আমি স্বেচ্ছায় স্বীকারোক্তি করছি। আমার বিরুদ্ধে উহা ব্যবহৃত হতে পারে। কোনো পুলিশ-অফিসার আমাকে কোনো প্রলোভন দেখান নি, ভীতিপ্রদর্শনও করেন নি। আমি আমার নিজের ও সহকর্মীদের বিষয় পরিষ্কার করে দেবার জন্যেই স্বীকারোক্তি করছি। আমার বিবৃতি আমার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়,—কিছুই যায় আসে না। আমার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করা হোক।

চব্বিশ

আওরংজেব-ভ্রাতা মুরাদ ও ডাঃ পারচুরে।

সাক্ষ্যপ্রসঙ্গে শ্রীযুত অটল বলেন যে, ১৯৩২ সাল থেকে তিনি রয়েছেন গোয়ালিয়র রাজসরকারে। গোয়ালিয়রের সকল জেলা-সাবজজই প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাসম্পন্ন। ১৯৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন তিনি।

১৯৪৮ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে গোয়ালিয়রের গোয়েন্দা ইনস্পেক্টার শ্রীযুত বালকৃষ্ণানের নিকট হতে একটি 'নোট' পান তিনি। তাতে ডাঃ পারচুরের এক স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করবার জন্যে অনুরোধ করা হয়েছিলো সাক্ষীকে। গোয়ালিয়রের পুলিশ-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীযুত থোরাট পাতিল ঐ 'নোট'খানা নিয়ে এসেছিলেন। সাক্ষী ঐ নোটের উপর লিখে দেন যে, ১৮ই ফেব্রুয়ারি স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে।

শ্রীযুত অটল পরদিন প্রাতে আসামীকে তাঁর কাছে উপস্থিত করবার জন্যে বলেছিলেন পুলিশকে। তাতে শ্রীযুত পাতিল বলেন যে, আসামীকে আদালতে আনা হলে একটা বিরাট হৈ-চৈ হতে পারে। তা ছাড়া আসামী

রয়েছেন সামরিক বিভাগের হেপাজতে। তাঁকে আদালতে হাজির করতে হলে অসুবিধা হতে পারে কিছু। আসামী এখন রয়েছেন গোয়ালিয়র দুর্গে।

পরদিন শ্রীযুত পাতিল সাক্ষীকে এসে জানান যে, দুর্গ-মধ্যে গিয়ে আসামীর স্বীকারোক্তি গ্রহণ ভিন্ন অন্য উপায় নেই। আদালতের সুমুখে জনতার সোরগোল এড়াবার জন্যেই দুর্গের ভেতর গিয়ে স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করতে রাজী হন তিনি।

মোটরে করে তিনি দুর্গের দিকে রওনা হন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন শ্রীযুত থোরাট পাতিল, জনাব খিজির মহম্মদ এবং আরো দু'-একজন পুলিশ-অফিসার। যাবার পথে তাঁরা দুর্গের কম্যাণ্ডিং-অফিসাব মেজর ছত্রেকেও গাড়িতে তুলে নেন।

মেজর ছত্রে প্রথমে 'সেলে' ঢুকে দু'-এক মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে আসেন। সাক্ষী তখন 'সেলে' প্রবেশ করে ডাঃ পারচুরেকে জিজ্ঞাসা করেন, "আপনি-যে স্বীকারোক্তি করবেন, এ-কথা কি সত্য ?"

পারচুরে উত্তর করেন, "হ্যাঁ"।

সাক্ষী তখন ডাঃ পারচুরেকে নিয়ে যান পেছনের বারান্দায়। সেখানে তখন রইলেন কেবল তাঁরা দু'জন।

শ্রীযুত অটল আরো বলেন, "গোয়ালিযর ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৩৬ ধারায় সমতুল্য ফৌজদারী-দণ্ডবিধির ১৬৪ ধারার ফলাফল সম্বন্ধে ডাঃ পারচুরেকে আমি যথাসাধ্য বোঝাতে চেয়েছিলাম। এ-ও বুঝিয়েছিলাম যে, তিনি যদি স্বীকারোক্তি করেন তবে তাঁর দণ্ড নিশ্চিত। তাঁকে বলেছিলাম, আইনে এমন কোনো বিধি নেই যাতে জোর করে তাঁকে স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য করা যেতে পারে। এর পরেও ডাঃ পারচুরে স্বীকারোক্তি করবার সঙ্কল্পে অটল রইলেন। যখন দেখলাম যে, স্বেচ্ছায় তিনি স্বীকারোক্তি করতে প্রস্তুত, তখন জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর বক্তব্য কি। তার বক্তব্য শেষ

হতে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট লেগেছিলো। তাঁর বক্তব্য শোনবার পরেও তাঁকে আর-একবার আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম যে, তিনি যেন স্বীকারোক্তি না করেন; অন্তত তা'র আগে বিষয়টা ভালো করে যেন চিন্তা করেন। ভাববার জন্যে তাঁকে সময় দিয়েছিলাম আধঘণ্টা।"

ইংরেজি অথবা হিন্দী—দু'টোর যে-কোন-একটায় ইচ্ছে করলে তিনি স্বীকারোক্তি করতে পারেন, এ-কথা বলা হয়েছিলো পারচুরেকে। তিনি ইংরেজিতেই বিবৃতি দেন। তিনি যেমন বিবৃতি দিয়েছিলেন, সাক্ষী হুবহু তাই লিখেছিলেন। পারচুরে যখন বিবৃতি দান করছিলেন, সাক্ষী তাঁকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নি। তিনি শুধু তারিখ-পরম্পরায় বিবৃতি দান করতে বলেছিলেন তাঁকে।

বিবৃতি লেখা শেষ হলে সাক্ষী সেটি পারচুরেকে পড়ে শুনান। পরে লেখাটি তাঁর হাতে দেন। লেখাটি পড়ে পারচুরে তাঁর প্রত্যেক পাতায় নিজের নাম স্বাক্ষর করেন। স্বীকারোক্তির সময় তৃতীয় ব্যক্তি কেউ ছিলো না।

শ্রীযুত দফ্‌তরি: স্বীকারোক্তিটি নিয়ে আপনি কি করলেন?

সাক্ষী: সেটি আমার কাছেই রেখে দিই। দু'-তিন দিন পর সেটিকে শীলমোহর করে পাঠিয়ে দিই ভারতীয় ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে। ৬ই এপ্রিল তারিখে স্বীকারোক্তিটিকে দেওয়া হয় গোয়ালিয়র সরকারের বৈদেশিক ও রাজনৈতিক বিভাগের সেক্রেটারির হাতে।

অতঃপর ডাঃ পারচুরেকে সনাক্ত করে সাক্ষী বলেন যে, ঐ ব্যক্তির স্বীকারোক্তিই লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি।

শ্রীযুত ইনামদারের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, গোয়ালিয়রের অধিবাসী হিসাবে ডাঃ পারচুরেকে ১৯৪৫ সাল থেকে তিনি জানেন। গোয়ালিয়র দুর্গ, গোয়ালিয়র-আদালতের ফৌজদারি-এলাকার সীমাভুক্ত। গোয়ালিয়রের মিউনিসিপ্যাল কমিটির সীমা নির্দ্দেশ করে ১৯১৭ সালের

২৯শে ডিসেম্বর তারিখে গোয়ালিয়র সরকার যে-বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছিলেন, বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি সাক্ষীকে সেটি দেখাবার পর সাক্ষী বলেন যে, বিজ্ঞপ্তিটির সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না।

শ্রীযুত ইনামদার: ১৭ই ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে শ্রীযুত থোরাট কি আপনাকে বলেছিলেন যে, আসামীকে আদালতে হাজির করতে তিনি অসমর্থ?

সাক্ষী: ১৮ই তারিখে আসামীকে আমার আদালতে হাজির করার অসুবিধার কথা বলেছিলেন শ্রীযুত থোরাট। বিচারাধীন বন্দীদের জন্যে নির্দ্দিষ্ট জেলখানা কোথায় অবস্থিত তা-ও বলতে পারেন নি তিনি। উক্ত জেলখানা সেন্ট্রাল জেলের মধ্যেই অবস্থিত কি না, তা-ও জানা ছিলো না তাঁর। আমার দুর্গে যাওয়ার চেয়ে আসামীকে উক্ত জেলখানায় নিয়ে গেলেই ভালো হয়, এ-সম্বন্ধে তাঁকে কোনো ইঙ্গিত আমি করি নি।

প্রশ্ন: কোনো আদালতে ডাঃ পারচুরের বিরুদ্ধে কোনো মামলা দায়ের আছে কি না, এ-সম্বন্ধে কি আপনি ১৭ই ফেব্রুয়ারি শ্রীযুত থোরাটের কাছে অনুসন্ধান নিয়েছিলেন?

উত্তর: গোয়েন্দা-ইনস্পেক্টার শ্রীযুত বালকৃষ্ণানের নোটেই উল্লেখ ছিলো যে, পারচুরের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের আছে।

প্রশ্ন: স্বীকারোক্তির কাগজপত্র থেকে এ-কথা বোঝা যায় না যে, আপনি গোয়ালিয়র দুর্গে গিয়েছিলেন। এ-সম্বন্ধে অন্য কোথাও আপনি কিছু উল্লেখ করছেন কি?

উত্তর: না।

পারচুরে, সাক্ষীকে বলেন নি যে, তাঁর জ্বর হয়েছে। আসামীর অঙ্গুষ্ঠ ফোলা ছিলো কি না, বা তাঁর ঘাড় শক্ত হয়ে ছিলো কি না, সাক্ষী তা লক্ষ্য করেন নি।

শ্রীযুত ইনামদার : আপনি কি জানেন যে, যে-কক্ষে পারচুরে ছিলেন তার অব্যবহিত নিকটেই ভূনিম্নস্থ অন্য একটি কক্ষে আওরংজেব তাঁর ভ্রাতা মুরাদকে বন্দী করে রেখে নির্মম যন্ত্রণা দিয়ে তাঁকে হত্যা করেছিলেন ?

সাক্ষী : আমি জানি না।

আদালত : এই প্রশ্নের কোনো প্রয়োজন আছে কি ?

শ্রীযুত ইনামদার : আসামীকেও একই প্রকার যন্ত্রণা দেওয়া হয়েছিলো, তা-ই আমি প্রমাণ করতে চাই।

প্রশ্ন : দুর্গে যাবার সময় গোয়েন্দা-ইনস্পেক্টার শ্রীযুত মণ্ডলিক আপনার সঙ্গে গিয়েছিলেন কি ?

উত্তর : আমি শ্রীযুত মণ্ডলিককে চিনি না।

প্রশ্ন : আদালতের শীলমোহর কি আপনি দুর্গে নিয়ে গিয়েছিলেন ?

উত্তর : না। শীলমোহর পরে এপ্রিল মাসের কোনো সময়ে দেওয়া হয়েছিলো। কারণ, স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করবার সময় শীলমোহর তৈরি হচ্ছিলো। স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধকারী ম্যাজিস্ট্রেটকে, প্রাথমিক মেমোরেণ্ডাম সম্পূর্ণ হলেই যে তাতে স্বাক্ষর করতে হবে, এমন কোনো বিধি নেই।

সাক্ষীকে স্বীকারোক্তিটি দেখিয়ে শ্রীযুত ইনামদার জিজ্ঞাসা করেন যে, স্বীকারোক্তির দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় নীচের দিকের কিছু অংশ খালি রাখবার কারণ কি ?

সাক্ষীর উত্তর : ঐ পৃষ্ঠার নীচের দিকে কেন যে আমি আসামীর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করি নি, সে-সম্বন্ধে কোনো বিশেষ কারণ দেখাতে পারবো না।

গান্ধী-হত্যার কাহিনী

পঁচিশ

উদ্যোগ-পর্ব্ব

২০শে জুলাই, ১৯৪৮ সাল।

এইদিনে সাক্ষ্য দিতে এলেন দিগম্বর রামচন্দ্র বাদগে। আগে তিনি ছিলেন গান্ধী-হত্যা মামলারই একজন আসামী। পরে হয়ে দাঁড়ান রাজসাক্ষী, লাভ করেন রাজানুকম্পা।

বাদগে একজন মারাঠি গোণ্ডালি। বয়স পঁয়ত্রিশ বৎসর। পুণার নারায়ণপেটের অধিবাসী তিনি। সেখানকার একটি "শস্ত্র ভাণ্ডার"-এর তিনি স্বত্বাধিকারী। ভাণ্ডারটি স্থাপিত হয় ১৯৪৭ সালের মাঝামাঝি। অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের সঙ্গে রিভলবার, কার্ত্তুজ, বোমা, স্টেন-গান ইত্যাদি বিক্রি করতেন তিনি। মূলত দোকানটি খোলা হয় ১৯৪২ সালে। সেই থেকে ১৯৪৭ সাল নাগাদ সেখানে বিক্রি হতো ছোরা, ছুরি, বাঘনখ, কলম-তরাস, কুড়াল ইত্যাদি। বইও বিক্রি করতেন তিনি।

১৯৪০ সালে হিন্দু মহাসভার কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করতেন তিনি। সেখানে বিক্রি করতেন অস্ত্রশস্ত্র আর বই। ঐ-সব অধিবেশনে "তাঁতিয়ারাও", ভোপৎকার এবং আরো অনেককে বক্তৃতা করতে তিনি শুনেছেন। মহারাষ্ট্রীয়গণের মধ্যে সাভারকর সাধারণত "স্বতন্ত্র বীর ব্যারিস্টার তাঁতিয়ারাও সাভারকর" বলেই পরিচিত।

১৯৪৪ কি ৪৫ সালে বোম্বাইয়ের এক জনসভায় সাভারকরের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। মহারাষ্ট্র-হিন্দু-সভার সদস্যগণ ঐ সভায় মানপত্র ও টাকার তোড়া উপহার দিয়েছিলেন। সভা শেষ হবার পর প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন লোকের সঙ্গে সাক্ষীও সাভারকরের বাসগৃহে গমন করেন। ঐ গৃহ "সাভারকর-সদন" নামে পরিচিত। একটি ঘরোয়া সভা হয় সেখানে। সাভারকর বক্তৃতা করেন সেই সভায়।

"শস্ত্র ভাণ্ডারে"র মালিক হিসাবে সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষীর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। সাক্ষীকে অভিনন্দিত করে তিনি বলেন যে, সাক্ষী ভালো কাজই করছেন, তিনি যেন সেই কাজ চালিয়ে যান।

চার-পাঁচ বছর যাবৎ তিনি আপ্তেকে জানেন। ১৯৪৪ সালে পুণার শিবাজী নগরে হিন্দু-রাষ্ট্রদল-শিবির প্রতিষ্ঠা করেন নাথুরাম গড্‌সে। আপ্তেও সঙ্গেই ছিলেন। গড্‌সেই আপ্তের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁর। নাথুরামকে তিনি জানতেন ১৯৪০—৪১ সাল থেকে।

১৯৪৬ সালের শেষে কি ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে বোম্বাইয়ের 'দাদার'এ ছবিলদাস হাইস্কুলে হিন্দু রাষ্ট্র দলের এক সভা হয়। ঐ সভার আগে কিংবা পরে চল্লিশ-পঞ্চাশজন লোকের সঙ্গে বাদগে গিয়েছিলেন সাভারকর-সদনে। নারায়ণ আপ্তে, নাথুরাম গড্‌সে, করকারে, পণ্ডিত বাখলে, শ্রীযুত পরমেকার, আপ্পা কাশার, সাভারকরের সেক্রেটারি গজানন্দ রাও দামলে, ইন্দোরের বাল ইঙ্গলে প্রভৃতি ছিলেন ঐ দলে।

সাভারকর এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা করেন সেই সভায়। বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, কংগ্রেসের নীতি হিন্দুদের পক্ষে ক্ষতিকর। অর্থনৈতিক দিক থেকে মুসলমানদের বর্জ্জন করতে হবে। মুসলমানরা যদি হিন্দুদের আক্রমণ করে তবে তা প্রতিহত করবার জন্যে এবং তাদের প্রতি-আক্রমণ করবার নিমিত্ত হিন্দুদের প্রস্তুত হতে হবে। তা ছাড়া অস্ত্র-ব্যবহার শিক্ষার জন্যে বিপুল সংখ্যায় সৈন্যদলেও যোগদান করতে হবে তাদের।

সাক্ষী গত দু'-তিন বছর ধরে করকারেকে জানেন। বদগাঁওকব নামক ব্যক্তিকেও জানেন তিনি।

১৯৪৭ সালে একবার কি দু'বার করে বাদগে বোম্বাইয়ে যেতেন। সেখানে গেলেই হিন্দু মহাসভার আপিসেও যেতেন তিনি। শ্রীপরমেকার ও পণ্ডিত বাখলের সম্পাদিত কাজ সম্পর্কে সাভারকর-সদনে যে-সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সে-সভার কথা তাঁর মনে আছে। সভায় বিশ-পঁচিশজন লোক যোগদান করেছিলেন। সেখানে পণ্ডিত বাখলে, শ্রীপরমেকার, সাভারকর, বাদগে প্রভৃতির একটি গ্রুপ ফটো তোলা হয়। ঐদিন রাত্রি আটটা কি সাড়ে আটটার সময় আপ্তে চলে গেলে, করকারে আরো তিনজন লোক সঙ্গে নিয়ে বাদগের কাছে আসেন। ঐ তিনজনকে বাদগে সেই প্রথম দেখেন। করকারে তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন তাঁদের,—একজন মদনলাল, একজন ওম্ প্রকাশ, আর-একজন চোপরা।

আপ্তেকে কয়েকবার অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছিলেন তিনি। অস্ত্র-শস্ত্রের জন্যে আপ্তে ও করকারে প্রথমবার তাঁর কাছে এসেছিলেন ১৯৪৭ সালের জুলাই কি আগস্ট মাসে। আপ্তে বলেন যে, কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি বাদগের কাছ থেকে অস্ত্রশস্ত্র নিতে চান। আপ্তে নিজে সাক্ষীর কাছে একটি স্টেনগান চেয়েছিলেন।

বাদগে বলেন: অতঃপর আপ্তে ও করকারে তাঁদের গাড়ি করে আমাকে নিয়ে যান যারবেদা জেলের পেছনে। পথে আমরা গুরুদয়াল সিংকে তুলে নিই। যারবেদা জেলের ওখানে পৌঁছে গুরুদয়াল সিং গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে একটি স্টেন-গান নিয়ে আবার ফিরে আসেন। তারপর আমাকে আবার "শস্ত্র ভাণ্ডারে" নামিয়ে দিয়ে আপ্তে ও করকারে চলে যান। ঐ স্টেন-গানটির জন্যে আপ্তে আমাকে বারো শো টাকা দিয়েছিলেন।

১৯৪৭ সালের জুলাই কি আগস্ট মাস থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আপ্তের কাছে তিনি প্রায় হাজার তিনেক টাকার অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করেছিলেন।

গান্ধী-হত্যার কাহিনী

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে সাক্ষী সপরিবারে 'ভোর স্টেটে' গিয়েছিলেন তীর্থভ্রমণে। তাঁরা যাচ্ছিলেন গরুর গাড়িতে। পথে যারন্দাবানে নামক স্থানে আপ্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। আপ্তে যাচ্ছিলেন মোটর সাইকেলে চড়ে।

আপ্তে সাক্ষীকে বলেন, আমরা কিছু 'জিনিষ' চাই। 'জিনিষ' অর্থে অস্ত্রশস্ত্র। বাদগে উত্তর দেন যে, তাঁর সঙ্গে তখন কোনো অস্ত্র নেই, তবে পুণায় ফিরে গিয়ে তার ব্যবস্থা করবেন তিনি। আট দশ দিন পরে তিনি পুণায় ফিরে এসে দু'-এক দিনের মধ্যেই অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করেন। পরে 'হিন্দু রাষ্ট্র' আপিসে গিয়ে আপ্তেকে জানান যে, অস্ত্রশস্ত্র যোগাড় করা হয়েছে, সেগুলি তাঁর চাই কি না। আপ্তে বলেন যে, দলের লোক সব বাইরে চলে গেছে; তারা ফিরে এলেই সেগুলো কেনা হবে।

ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে শস্ত্র-ভাণ্ডারে এসে আপ্তে জিজ্ঞাসা করেন, জিনিষগুলি পাওয়া যাবে কি না। বাদগে জবাব দেন, 'হ্যাঁ।' আপ্তে জানান যে, দু'-তিন দিনের মধ্যেই করকারে এসে সেগুলো নিয়ে যাবেন।

১৯৪৮ সালের ৯ই জানুয়ারি সন্ধ্যা ছ'টা কি সাড়ে ছ'টার সময় আপ্তে আবার বাদগের কাছে এসে বলেন যে, করকারে এবং আরো কয়েকজন পরে আসবেন, বাদগে যেন অস্ত্রশস্ত্রগুলি তাঁদের দেখান। পরে করকারে এসে জিনিষগুলি দেখতে চাইলে বাদগে তাঁর ভৃত্য শঙ্করকে সেগুলো নিয়ে আসতে বলেন। শঙ্কর অস্ত্রশস্ত্রগুলো নিয়ে এলে সেগুলো করকারে ও তাঁর সঙ্গীদের দেখানো হয়। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিলো গানকটন-খণ্ড, হাতবোমা, কার্তুজ, দু'টি পিস্তল ও ফিউজ তার। আপ্তের একজন সঙ্গী মদনলাল বলেন যে, অস্ত্রগুলোর ব্যবহার তিনি জানেন। অস্ত্রগুলো দেখে তাঁরা চলে যান।

পরদিন বেলা প্রায় দশটার সময় আপ্তে এসে সাক্ষীকে নিয়ে যান হিন্দু রাষ্ট্র দল আপিসে। গড্‌সে বসেছিলেন সেখানে। আপিসের বাইরে আপ্তে সাক্ষীকে জানান যে, দু'টি গান-কটন, দু'টি রিভলবার ও পাঁচটি হাতবোমার প্রয়োজন। বাদগে তাঁকে বলেন যে, তাঁর কাছে রিভলবার নেই, তবে গান-কটন ও হাতবোমা দিতে পারবেন তিনি। আপ্তে তা-ই নিতে স্বীকৃত হয়ে জানান যে, গান-কটন দু'টি ও হাতবোমা পাঁচটি বোম্বাইয়ে 'ডেলিভারি' দিতে হবে। বাদগে তখন বলেন যে, জিনিষগুলি বোম্বাইয়ে পৌঁছে দিতে তিনি রাজি আছেন, তবে এখনই নয়। সম্প্রতি তিনি চলিশগাঁও যাচ্ছেন তাঁর বাড়ী বিক্রি করতে, সেখান থেকে ফিরে এসে।

এই সব কথাবার্ত্তা শেষ হলে আপ্তে, গড্‌সেকে ডেকে বলেন যে, "বাদগে জিনিষগুলি বোম্বাইয়ে পৌঁছে দেবেন বলেছেন। আমাদের একটা কাজ শেষ হলো।"

আপ্তে ও গড্‌সে বলেছিলেন যে, ১৪ই জানুয়ারি সন্ধ্যার মধ্যে দাদারে হিন্দু মহাসভা আপিসে যাতে জিসিসগুলি পৌঁছায়, বাদগে যেন লক্ষ্য রাখেন সেদিকে।

১৪ই জানুয়ারি তারিখে দু'টি গান-কটন, দু'টি হাতবোমা, একটি ফিউজ তার, ডেটোনেটার ইত্যাদি একটি খাকি কাপড়ের ব্যাগে পুরে বাদগে ও শঙ্কর রওনা হন বোম্বাই। দাদারে নেমে তাঁরা গিয়ে উঠেন হিন্দু মহাসভার আপিসে। আপ্তে ও গড্‌সে তখন সেখানে ছিলেন না। খোঁজ নিয়ে জানা গেলো যে, তাঁরা শীগগীরই আসবেন। আধ ঘণ্টা অপেক্ষা করে চা খাবার জন্যে তাঁরা বাইরে যাচ্ছিলেন, এমন সময় সিঁড়িতে আপ্তের সঙ্গে তাঁদের দেখা হলো।

আপ্তে বললেন বাদগেকে, "ভালোই হলো, আপনি এসেছেন। জিনিষগুলি রাখবার ব্যবস্থা এখন করতে হবে। আসুন, যাওয়া যাক।"

বাদগে তখন শঙ্করের হাত থেকে থলে নিয়ে আপ্তের সঙ্গে রওনা হলেন। চার-পাঁচ পা যাবার পরেই গড্‌সের সঙ্গে দেখা হলো।

বাদগে : আপ্তে, গড্‌সে ও আমি তারপর শিবাজী পার্কে সাভারকর-সদনের দিকে অগ্রসর হই। শঙ্কর আমাদের সঙ্গে আসে নি। সে হিন্দু মহাসভার আপিসেই ছিলো। সাভারকর-সদনে পৌঁছে আপ্তে আমাকে বাইরে অপেক্ষা করতে বলে থলেটি আমার কাছ থেকে চেয়ে নেন। পরে আপ্তে ও গড্‌সে বাড়ীর ভেতর চলে যান। পাঁচ-দশ মিনিট পরেই তাঁরা ফিরে আসেন। তাঁরা যখন ফিরে আসেন তখন আপ্তের কাছে থলেটি ছিলো। সাভারকর-সদন থেকে আমরা তখন ফিরে আসি হিন্দু মহাসভার আপিসে।

এই সময়ে আসামীর কাঠগড়া থেকে শ্রীযুত সাভারকর দাঁড়িয়ে উঠে জিজ্ঞাসা করেন, "আপ্তে থলেটি নিয়ে ফিবে আসেন বলে বাদগে যা বললেন তা লিপিবদ্ধ কবা হয়েছে কি"?

বিচারপতি : হ্যাঁ।

হিন্দু মহাসভার আপিসে পৌঁছে আপ্তে একটি মোটর গাড়ি নিয়ে আসেন। তাবপর তাঁরা রওনা হন ভুলেশ্বরে দীক্ষিত মহারাজের বাড়ীর দিকে। দীক্ষিত মহারাজকে বাদগে জানতেন ১৯৪০-৪১ সাল থেকে।

বাদগে জবানবন্দীতে বলতে লাগলেন,—

"গাড়ি থেকে নেমে আমরা বাড়ীর ভেতর গেলাম। শঙ্করকে হলঘরে বসিয়ে সবাই অন্দরে ঢুকলাম। তখন রাত দশটা কি সাড়ে দশটা হবে। দীক্ষিত মহারাজেব একজন চাকর জানালে যে, মহারাজ ঘুমোচ্ছেন। চাকরের হাতে থলেটি দিয়ে বলা হলো যে, ওটি যেন বাড়ীতেই রেখে দেওয়া হয়; পরের দিন সকালে আমরা এসে নিয়ে যাবো। তারপর আমরা চলে আসি।

চলে আসি হিন্দু মহাসভার আপিসে। সেখানে পৌঁছবার পর শঙ্কর ও আমাকে গাড়ি থেকে নামতে বলা হয়। আপ্তে তখন গড্‌সের হাতে কিছু টাকা দেন। তা থেকে গড্‌সে আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে বলেন যে, টাকাটা দেওয়া হলো জিনিষের দাম হিসাবে নয়, আমার বোম্বাই আসার খরচ বাবদ।

"আপ্তে আমাকে হিন্দু মহাসভার আপিসেই রাত্রিবাস করতে বলেন।

"শঙ্কর এবং আমি মহাসভার আপিসে ঢুকবামাত্র কেউ বলে উঠলো, "বাদগে, কব্ আয়া?" আমি বললাম যে, আমি তাঁকে চিনি না। লোকটি বললেন যে, করকারের সঙ্গে তিনি অস্ত্রশস্ত্র দেখতে আমার দোকানে গিয়েছিলেন। তখন চিন্‌তে পারলাম, তিনি মদনলাল। আমি করকারের সংবাদ জিজ্ঞাসা করলাম তাঁকে। মদনলাল বললেন যে, করকারে থানায় গিয়েছেন। হয়তো তখুনি আসতে পারেন, না হয় পরের দিন সকালে।

"পরের দিন, অর্থাৎ ১৫ই জানুয়ারি, আপ্তে ও গড্‌সে হিন্দু মহাসভা আপিসে এসে আমাকে ও শঙ্করকে নিয়ে যান "অগ্রণী" প্রেসে। সেখানে পৌঁছে আপ্তে আমাদের বাইরে অপেক্ষা করতে বলেন। সেখানে গড্‌সে, আপ্তে, করকারে ও যোশী (অগ্রণী প্রেসের স্বত্বাধিকারী) বহুক্ষণ আলাপ-আলোচনা করেন। তারপর যোশী ছাড়া সকলেই আমরা ফিরে আসি মহাসভার আপিসে। সেখান থেকে মদনলালকে নিয়ে যাই দীক্ষিত মহারাজের বাড়ী। সেখানে গিয়ে আমি থলেটি আনতে বলি। প্রায় এক ঘণ্টা পরে থলেটি আনা হলে আমি সেটি খুলে আপ্তেকে ভেতরকার জিনিষগুলো দেখাই। তারপর থলেটি বন্ধ করে আপ্তের হাতে দিলে তিনি আবার সেটি দেন করকারের হাতে। করকারেকে বলেন, মদনলালকে নিয়ে তাঁর (করকারের) তখুনি

ফ্রন্টিয়ার-মেল বা পাঞ্জাব-মেলে দিল্লী যাত্রা করা কর্তব্য। করকারে তখন মদনলালের কাছে থলেটি দিয়ে সেটিকে বিছানার সঙ্গে বেঁধে ফেলতে বললেন। তারপর করকারে ও মদনলাল চলে গেলেন।

"তাঁরা চলে যাবার পরেই আপ্তে, দীক্ষিত মহারাজকে বললেন যে, বিশেষ জরুরি কোনো কাজেই তাঁরা (করকারে ও মদনলাল) রওনা হয়ে গেলেন। যাই হোক, দু'টো কিংবা একটা রিভলবার দীক্ষিত মহারাজের কাছ থেকে তাঁর (আপ্তের) চাই। মহারাজ জানালেন, তাঁর কাছে কোনো রিভলবার নেই, পিস্তল অবশ্য আছে একটি, তবে সেটি কাউকে দেবেন না। যেমন করে হোক একটি রিভলবার যোগাড় করে দেবার জন্যে আপ্তে অনুরোধ জানান দীক্ষিত মহারাজকে।

"তারপর আমরা বাইরে এসে দীক্ষিত মহারাজের মন্দির-প্রাঙ্গণে দাঁড়াই। আপ্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি তাঁদের সঙ্গে দিল্লী যেতে প্রস্তুত কি না। দিল্লী যাবার উদ্দেশ্য কি, আমি জিজ্ঞাসা করি তাঁকে। আপ্তে উত্তর করেন যে, "তাঁতিয়া রাও স্থির করেছেন, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জওহরলাল নেহ্‌রু ও জনাব সুরাবর্দিকে শেষ করে ফেলতে হবে।" আর এই কাজের ভার পড়েছে তাঁদের উপর। আমি জানাই যে, পুণায় না গিয়ে দিল্লী যেতে পারবো না আমি।

"তারপর আমরা মহাসভার আপিসে ফিরে আসি। পথে আপ্তে ও গড্‌সে পঁচিশ মিনিটের জন্যে কটন এক্সচেঞ্জ বিল্‌ডিংএ নেমেছিলেন।

"সেইদিন বিকেলে মহাসভার আপিসেই মদনলালের সঙ্গে আমার দেখা হয়। গাড়ি ধরতে না পারায় তাঁরা দিল্লী রওনা হতে পারেন নি সেদিন।

"শঙ্কর ও আমি সেদিনই পুণার দিকে যাত্রা করি। পুণায় পৌঁছে, দিল্লী যেতে হবে ভেবে, অন্যান্য অস্ত্রগুলো সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করি। গড্‌সে দু'বার আমার খোঁজ করেছেন শুনে হিন্দু রাষ্ট্র আপিসে তাঁর

সঙ্গে দেখা করতে যাই। তিনিও তখন পুণায় এসেছিলেন। গড্‌সে আমাকে জিজ্ঞাসা করেন, আমি যেতে রাজি আছি কি না। আমি বলি যে, আমি সম্মত। তখন তিনি আমাকে একটি পিস্তল দিয়ে তার বদলে একটি রিভলবার যোগাড় করে দিতে বলেন। হায়দ্রাবাদের শর্মা নামক একজন ব্যক্তির কাছে বত্রিশটি রিভলবার বিক্রি করেছিলাম আমি। তাঁর কাছে থেকেই পিস্তলটি আমি বদলে নিই। শর্মা আমাকে চারটি কার্তুজও দিয়েছিলেন।

"১৭ই জানুয়ারি তারিখে আমি বোম্বাই রওনা হই। স্টেশনে গড্‌সে ও আপ্তের সঙ্গে দেখা হয় আমার। তাঁরা কিছু টাকার যোগাড় করে দিতে বলেন আমাকে। আমি বোম্বাই ডাইং হাউসের মালিক শেঠ চরণ মথুরাদাসের বাড়ী গিয়ে গড্‌সে ও আপ্তেকে তাঁর সঙ্গে পরিচিত করে দিই। সেখান থেকে যাই মহাসভার আপিসে। সেখানে গড্‌সে প্রস্তাব করেন যে, যাত্রার পূর্ব্বে সাভারকরকে একবার 'দর্শন' করে যেতে হবে। তদনুযায়ী আমরা সাভারকরের গৃহে গমন করি। আমাকে বাইরের ঘরে রেখে গড্‌সে ও আপ্তে উপরে যান। কিছুক্ষণ পরে তাঁদের পিছু-পিছু সাভারকরও সিঁড়ি দিয়ে নেমে এসে বলেন, "সফল হয়ে ফিরে এসো।"

"সেখান থেকে ট্যাক্সি করে আমরা যাই রুইয়া কলেজের দিকে। পথে আপ্তে বলেন যে, তাঁতিয়া রাও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, মহাত্মা গান্ধীর শতায়ু শেষ হয়েছে। তাঁদের কাজ যে সফল হবেই, সে-সম্বন্ধে আর কোনো সন্দেহ নেই।

"পরে আমরা যাই আফজল পুকারের গৃহে। তিনি আমাদের একশো টাকা দান করেন।"

২০শে তারিখের জবানি এইখানেই শেষ হয়।

ছাব্বিশ

বিরাট-পর্ব

২১শে তারিখে বাদগের জবানবন্দী আরম্ভ হবার আগে মদনলালের কৌসুলি শ্রীযুত ব্যানার্জি আদালতে এক আবেদনপত্র পেশ করেন। তাতে বলা হয়েছে, গতকাল রাজসাক্ষী বাদগে সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, আপ্তে তাঁকে বলেছিলেন, সাভারকর নাকি স্থির করেছেন, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহ্রু ও জনাব সুরাবর্দ্দিকে শেষ করে ফেলতে হবে, ভবিষ্যদ্বাণীও না কি করেছেন তিনি যে, মহাত্মার শতায়ু শেষ হয়েছে এবং গান্ধী-হত্যার পরিকল্পনা সফল হবেই। বাদগের এই দু'টি বিবৃতি নিকৃষ্ট ধরণের জনশ্রুতি (hearsay of the third degree) বলেই তা অগ্রাহ্য।

আরো তিনটি আবেদন দাখিল করা হয়েছিলো আদালতে। একটি করেছিলেন শ্রীযুত ব্যানার্জি, একটি শ্রীযুত ইনামদার, একটি শ্রীযুত ওক।

শ্রীযুত ব্যানার্জির আবেদনে বলা হয়েছে, গান্ধীজীর শেষবার দিল্লীতে অবস্থানকালীন তাঁর বক্তৃতা ও প্রবন্ধসম্বলিত সংকলন-গ্রন্থ "দিল্লী ডায়েরি" সম্বন্ধে আগে তিনি যে-আবেদন করেছিলেন সে-সম্পর্কে এক্ষণে আদালতের স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। বিচারক মন্তব্য করেন, যথাসময়ে তিনি এ-ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুত ব্যানার্জিকে সমগ্র পুস্তকটি পড়ে প্রাসঙ্গিক অংশগুলি চিহ্নিত করে রাখবার জন্যে অনুরোধ জানান তিনি। ঐ অংশগুলিকে এই বিচার সম্পর্কে কেন আদালতে গ্রাহ্য হবে, সুস্পষ্টরূপে তার কারণ উল্লেখ করে আর-একটি পত্র পেশ করতেও বলেন।

শ্রীযুত গুক তাঁর আবেদনে, "গান্ধী-মুসলিম ষড়যন্ত্র" নামক পুস্তকটি গড্‌সের কাছে পৌঁছে দেবার জন্যে অনুরোধ জানিয়েছেন। তার কারণ-স্বরূপ কৌঁসুলি বলেছেন যে, নিজের বিবৃতি প্রস্তুত করবার জন্যে গড্‌সের ঐ পুস্তকটির প্রয়োজন। বিচারপতি, সরকারপক্ষের কৌঁসুলিকে উক্ত পুস্তক পড়ে, তাতে কি আছে না আছে, আদালতে জানাতে অনুরোধ করেন।

আগের দিনের জবানবন্দীর অনুবৃত্তি করে রাজসাক্ষী এদিনে বলেন,—

১৭ই জানুয়ারি বোম্বাইয়ে "বোম্বে ডাইং ওয়ার্কস" থেকে আপ্তে, শঙ্কর ও সাক্ষী ভুলেশ্বরে দীক্ষিত মহারাজের বাড়ী গিয়েছিলেন। মহারাজের বাড়ীতে শঙ্করকে হলঘরে বসিয়ে আপ্তে ও বাদগে চলে যান ভেতরে। আপ্তে, দীক্ষিত মহারাজকে বলেন যে, দাদা মহারাজ তাঁকে (আপ্তেকে) একটি রিভলবার দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, অতএব অস্ত্রটি তাঁকে দেওয়া হোক। দীক্ষিত মহারাজ কিন্তু অস্ত্রটি তাঁকে দিলেন না।

সেখান থেকে তাঁরা চলে যান জুহু বিমান-ঘাঁটিতে। সেখানে গিয়ে আপ্তে জানতে পারেন যে, দিল্লীগামী বিমান ছাড়ে শান্তা ক্রুজ বিমান-ঘাঁটি থেকে। তারপর তাঁরা অতি দ্রুত মোটর হাঁকিয়ে যাত্রা করেন শান্তা ক্রুজ বিমান-ঘাঁটি অভিমুখে।

সেখানে পৌঁছে আপ্তে সাক্ষীকে বলেন যে, সাড়ে তিনশো টাকা নিয়ে বাদগে আর শঙ্কর যেন ঐ রাত্রেই ট্রেনে দিল্লী রওনা হয়ে যান।

১৮ই জানুয়ারি সকালে শঙ্কর ও বাদগে যান দীক্ষিত মহারাজের বাড়ী। সেখানে মহারাজের সঙ্গে বাদগের কথাবার্তা হয়। সেখান থেকে তাঁরা বেলা আড়াইটার সময় আসেন ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে। মধ্যম শ্রেণীর দু'খানা টিকিট কিনে পাঞ্জাব-মেলে তাঁরা দু'জনেই দিল্লী যাত্রা করেন। দিল্লী পৌঁছেন তাঁরা ১৯শে জানুয়ারি রাত্রি প্রায় দশটার

সময়। স্টেশনে কেউ তাঁদের নিতে আসেন নি। তাঁরা তখন সোজা চলে যান নয়া দিল্লীর হিন্দু মহাসভা আপিসে। সেখানে মদনলাল ও অপর এক ব্যক্তি বসেছিলেন। মদনলালের কাছ থেকে সাক্ষী জানতে পারেন যে, অপর ব্যক্তি হচ্ছেন নাথুরামের ভাই, নাম গোপাল গড্‌সে। পরে নাথুরাম ও করকারেও এসেছিলেন আপিসে।

২০শে জানুয়ারি শঙ্কর ও বাদগেকে নিয়ে আপ্তে যান বিড়লা ভবনে। তাঁরা সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন, একটি চিরকুটে তাই লিখে দিয়ে দ্বাররক্ষীকে পাঠিয়ে দেন ভেতরে। আপ্তে তখন বিড়লা ভবনের একটি কক্ষ দেখিয়ে বলেন যে, ঐ কক্ষেই থাকেন জনাব সুরাবর্দ্দি। প্রার্থনা সভায় তিনি থাকেন গান্ধীজীর কাছে বসে। দ্বাররক্ষী ফিরে আসবার আগেই তাঁরা ভবনে প্রবেশ করে একস্থানে উপস্থিত হন। সেখানে একটি জায়গা দেখিয়ে আপ্তে বলেন যে, মহাত্মা গান্ধী ও সুরাবর্দ্দি প্রার্থনার সময় ঐখানে উপবেশন করেন। আপ্তে আরো বলেন যে, তাঁদের দু'জনকেই যদি শেষ করে ফেলা সম্ভব না হয় -তবে একজনকে শেষ করতেই হবে।

তারপর,—

বাদগের জবানীতেই বলি : "এগারোটা কি সাড়ে এগারোটার সময় বিড়লা ভবন থেকে আমরা হিন্দু মহাসভা আপিসে ফিরে আসি। সেখানে পৌঁছেই আপ্তে চলে যান। কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে এসে গোপাল গড্‌সেকে বলেন যে, গোপাল ও আমি যে-দু'টি রিভলবার সঙ্গে এনেছি তা পরীক্ষা করে দেখবার জন্যে আমাদের সকলেরই একটা জঙ্গলে যাওয়া উচিত। আপ্তের সঙ্গে তখন গোপাল, শঙ্কর ও আমি, হিন্দু মহাসভা আপিসের পেছন দিকে এক জঙ্গলে যাই। গোপাল যে-রিভলবারটি এনেছিলেন সেটি ছিলো ৩২ বোরের (bore) সার্ভিস রিভলবার। শঙ্করের হাতে যেটি ছিলো সেটি ২৮ বোর কি ৩২ বোরের হবে।

"পরীক্ষা করে দেখা গেলো গোপালের রিভলবারটি ঠিক নেই। আপ্তে তখন আমার রিভলবারটি বের করতে বলেন। শঙ্কর তখন রিভলবারটি নিয়ে একটি গাছের দিকে লক্ষ্য করে গুলী ছোড়ে। গুলী গাছ পর্যন্ত পৌঁছায় নি। আপ্তে বলেন, রিভলবারটা কোনো কাজের নয়। গোপাল বলেন যে, তাঁর রিভলবারটি মেরামত করবেন তিনি। শঙ্কর তখন মহাসভার আপিসে গিয়ে এক বোতল তেল ও একটি কলমকাটা ছুরি নিয়ে আসে।

"গোপাল তাঁর রিভলবার মেরামত করছিলেন, এমন সময় তিনজন বনরক্ষী এসে আমাদের জিজ্ঞাসা করে যে, আমরা সেখানে কি করছি। রক্ষীরা কাছে আসবার আগেই গোপাল তাঁর রিভলবারটি লুকিয়ে ফেলে-ছিলেন শালের তলায়। সেই শাল পেতেই বসেছিলেন তিনি। পাঞ্জাবী ভাষায় গোপাল তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন। তারা তখন চলে যায়। মনে হলো, উত্তর শুনে তারা সন্তুষ্ট হয়েছে। আপ্তে তখন বলেন যে, সেখানে বসে থাকা আর নিরাপদ নয়। আমরা ফিরে যাই মহারাজা ভবনে। সেখানে মদনলাল ও করকারের সঙ্গে দেখা হলো আমাদের। আপ্তে করকারেকে বলেন যে, করকারে ও মদনলাল যেন চলে যান ম্যারিনা হোটেলে, আমরাও যাবো পরে। তাঁরা দু'জন চলে যাবার পর আপ্তে, গোপাল, শঙ্কর এবং আমিও ম্যারিনা হোটেলের দিকে রওনা হই। আমাদের সঙ্গে ছিলো অস্ত্রশস্ত্র ভরা সেই থলেটি।

"গোপালের হাতে ছিলো সেই থলেটি। ম্যারিনা হোটেলে পৌঁছে আমরা তেতলায় যাই। সেখানে একটি ঘরে নাথুরাম শুয়েছিলেন। গোপাল থলেটি সেই ঘরে রেখে দিলেন। শঙ্কর এবং আমি দু'জনেই চলে গেলাম নীচে রেস্তোরাঁয়। বাকি সবাই রইলেন সেই ঘরে। খাওয়া-দাওয়ার পর ফিরে এসে দেখলাম, নাথুরামের ঘরে বসে গোপাল তাঁর রিভলবার মেরামত করছেন। ভিতর থেকে আমরা দরজা বন্ধ করে

ছিলাম। তারপর আপ্তে, মদনলাল, করকারে ও আমি,—এই চারজন ঢুকলাম স্নানের ঘরে। সেখানে আমরা গান-কটনে ও হাতবোমায় প্রয়োজনীয় ডেটোনেটার, প্রিমিয়ার ও ফিউজ তার লাগাতে সুরু করলাম। শঙ্কর এবং নাথুরামও এসেছিলেন সেখানে। নাথুরাম আমাকে বললেন, "বাদগে, এই আমাদের শেষ চেষ্টা। এ-কাজ আমাদের সম্পূর্ণ করতেই হবে। দেখবেন, সমস্ত ব্যবস্থাই যেন ঠিকমতো করা হয়।"

"আমাদের কাজ শেষ হলে আমরা নাথুরামের ঘরে ফিরে আসি। তারপর ঠিক হয়, কে কোন্ অস্ত্র নিয়ে যাবেন। আপ্তে বলেন, মদনলাল ও শঙ্কর প্রত্যেকের কাছেই থাকবে একটি করে গান-কটন ও একটি হাতবোমা। নাথুরাম, গোপাল ও করকারে,—প্রত্যেকের কাছে থাকবে একটি করে হাতবোমা। আপ্তে এবং আমি—ছ'জনে নেবো ছ'টি রিভলবার। গান-কটন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সৃষ্টি করতে হবে একটা গোলমালের। গড্‌সে ও আপ্তে সেখানে থেকে জানাবেন ইঙ্গিত। করকারে বললেন যে, মদনলাল যেই গান-কটনবিস্ফোরণ করবেন অমনি গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে আমাদের সকলকেই ছুড়তে হবে বোমা আর রিভলবার।

"তারপর আপ্তে প্রস্তাব করেন যে, মদনলাল প্রাচীরের কাছে গান-কটন বিস্ফোরণ করবেন আর আমি ফটোগ্রাফারের ভাণ করে নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকে রিভলবার থেকে গুলী ছুড়বো এবং হাতবোমা নিক্ষেপ করবো। এর জন্যে আপ্তে সঙ্কেত জানাবেন মদনলালকে, আর নাথুরাম আমাকে। অন্যান্য সকলে প্রার্থনা সভার জনতার সঙ্গে মিশে যাবেন।

"অতঃপর আপ্তের পরামর্শ অনুযায়ী আমরা ছদ্মনাম গ্রহণ করলাম। নাথুরাম গড্‌সের নামকরণ হলো 'দেশ পাণ্ডে', করকারের হলো 'ব্যাস', আপ্তে পরিবর্তিত হলেন 'কর্মকারে,' শঙ্কর রূপান্তরিত হলো 'তুকারামে', আর আমি ছদ্মান্বিত হলাম 'বন্দোপাধ্যে'। মদনলাল ও গোপাল গড্‌সে

যে কি নাম নিয়েছিলেন তা এখন আমার মনে পড়ছে না। শুধু নাম নয়, পোষাকও বদলে ছিলাম আমরা।

"নাম এবং পোষাক পরিবর্ত্তনের পর আপ্তে আমাদের মধ্যে অস্ত্রগুলো ভাগ করে দেন। মদনলালকে দেবার জন্তে করকারেকে দেওয়া হলো একটি গান-কটন ও একটি হাতবোমা। শঙ্করকে দেওয়া হলো একটি রিভলবার ও একটি হাতবোমা। আমাকেও দেওয়া হলো তা-ই।

"তারপর মদনলাল ও করকারে যাত্রা করলেন বিড়লা ভবনের উদ্দেশ্যে। পনেরো-বিশ মিনিট পরে আপ্তে, শঙ্কর, গোপাল এবং আমিও রওনা হই। নাথুরাম আমাদের বলেন যে, পনেরো-বিশ মিনিটের মধ্যে তিনিও আসছেন। ম্যারিনা হোটেলের নিকট থেকে আমরা একটা ট্যাক্সি করি। বাকি অস্ত্রশস্ত্র একটি থলেতে ভরে নিয়েছিলেন গোপাল গড্‌সে। থলেতে তখন ছিলো একটি গান-কটন, কিছু ফিউজ তার এবং কয়েটি কার্ত্তুজ।"

সাতাশ

সকলি বিফল ভেল

২২শে জুলাইয়ের কথা।

এই দিনও চলে বাদগের জবানবন্দীর পূর্ব্বানুবৃত্তি। তিনি সুরু করেন এই বলে,—

"মহাসভা ভবনের কাছে এসে একবার ট্যাক্সি থামালাম আমরা। গাড়ি থেকে নেমে গোপাল ও আমি গেলাম ভবনের ভেতরে। অস্ত্রশস্ত্রের থলেটি ছিলো গোপালের সঙ্গেই। সেটিকে তিনি রেখে দেন হল-ঘরেরই একটি ছোটো আলমারিতে। আমি সংগ্রহ করি একটি তোয়ালে।

তারপর আমরা ট্যাক্সিতে ফিরে এসে রওনা হই বিড়লা ভবনের দিকে।

"গাড়ি করে আমরা উপস্থিত হই বিড়লা ভবনের পেছন দিকে। সকালবেলা আপ্তে ঐ স্থানটিই দেখিয়েছিলেন আমাদের। ট্যাক্সিটিকে থামানো হয় দেয়ালের নিকটবর্তী গোলাকার স্থানের বাঁদিকে। গাড়ী থেকে নেমে কয়েক পা এগিয়েই দেখা হয় মদনলালের সঙ্গে। তারপর আমরা পাঁচজনেই অগ্রসর হই ভৃত্যাবাসের ফটকের দিকে।

"আপ্তে জিজ্ঞাসা করেন মদনলালকে, "তৈয়ার হ্যায় ক্যা?" মদনলাল উত্তর দেন, তিনি প্রস্তুত; গান-কটন নির্দিষ্ট স্থানেই রেখে দেওয়া হয়েছে, এখন আগুণ ধরিয়ে দিলেই হয়। আপ্তে জানান যে, সঙ্কেতমাত্রেই অগ্নিসংযোগ করতে হবে। পথে যেতে-যেতেই এই সব কথা হয়। ফটকের কাছে গিয়েই দেখলাম, করকারে আসছেন প্রার্থনা সভার দিক থেকে। তারপর দেখলাম, সকালে আপ্তে আমাদের যে-ঘরটি দেখিয়েছিলেন সেই দিকেই চলে গিয়ে কোনো লোকের সঙ্গে কথা কইতে লাগলেন তিনি। তারপর আমাদের দেখতে পেয়ে করকারে আমাদের কাছে চলে আসেন।

"করকারে এসে আপ্তেকে বলেন, মহাত্মাজী সভায় এসে গেছেন। প্রার্থনাও আরম্ভ হয়েছে। ঘরে যে-লোক থাকে তার সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেছে, একজন ফটোগ্রাফারকে ঘরে ঢুকতে দেবে সে। তারপর আমার দিকে ফিরে বললেন, ফটোগ্রাফার পরিচয় দিয়ে ব্যাগ নিয়ে সেই ঘরে ঢুকতে। এমন সময় নাথুরামও এসে পৌঁছলেন সেখানে।

"আমি সেই ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, দু'জন লোক ঘরের পাশে দাঁড়িয়ে আছে, আর ঘরের বাইরে খাটিয়ার উপর বসে আছে অপর একজন, তার একটি চোখ কাণা। ভয় পেয়ে গেলাম। ভাবলাম, ঘরের মধ্যে যাবার পরে যদি কিছু ঘটে তো আটকা পড়ে যাবো সেখানে।

"নাথুরাম বলেন, ভয় পাবার কিছু নেই, কারণ পালিয়ে যাবার ব্যবস্থাও হয়েছে। নাথুরাম, আপ্তে ও করকারে ঘরে ঢুকবার জন্যে আমাকে

পীড়াপীড়ি করতে থাকেন। আমি তাঁদের বললাম, ঘরের ভেতর ঢুকে আঘাত করার চেয়ে আমি সামনাসামনিই আঘাত করতে চাই। হ্যাঁ,—বাইরে থেকেই, মহাত্মার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আঘাত করবো তাঁকে। তাঁরা দু'জনেই তখন রাজি হন আমার প্রস্তাবে।

"শঙ্কর আর আমি ট্যাক্সির কাছে গিয়ে রিভলবারটি তুলে নিলাম। আমার রিভলবারটি তোয়ালে দিয়ে জড়িয়ে থলেতে পুরে থলেটি রেখে দিলাম ট্যাক্সিতে। হাতবোমাটি শঙ্করের হাতে দিয়ে বললাম যে, আমি না-বলা পর্য্যন্ত যেন সে কিছু না করে। তারপর আমরা অন্যান্য সকলের নিকট ফিরে এলাম। দু'টি হাতই ঢোকানো ছিলো আমার "কোর্ত্তা"র পকেটের ভেতর। আমি যে প্রস্তুত, আপ্তে ও গড্‌সের কাছে সেই ভাব দেখবার জন্যে ইচ্ছা করেই পকেটে হাত রেখেছিলাম। আমি প্রস্তুত কি না, আপ্তে শুধালেন আমাকে। বললাম, আমি তৈরি।

"শঙ্করকে নিয়ে আমি তখন প্রার্থনা সভার দিকে অগ্রসর হলাম। আপ্তে তখন মদনলালের কাঁধে হাত রেখে বললেন, 'চলো।' বিস্ফোরক যেখানে রাখা হয়েছিলো মদনলাল তখন সেদিকে এগিয়ে গেলেন, করকারে চললেন আমাদের পেছন-পেছন।

"প্রার্থনা সভায় পৌছে দেখলাম, বহু লোক সমবেত হয়েছে সেখানে। মহাত্মাজী বসে আছেন তাঁর নির্দ্দিষ্ট আসনে। তাঁর কাছেই রয়েছেন বিশ-ত্রিশজন মহিলা। আমি দাঁড়িয়েছিলাম মহাত্মার ডান দিকে একটু দূরে, আর করকারে ছিলেন আমার ডান দিকে। শঙ্কর ছিলো আরো একটু দূরে করকারের ডান দিকে।

"তিন-চার মিনিট পরেই এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ হলো। আমি দেখলাম মহাত্মার বাঁ দিক থেকে শাদা ধোঁয়া উঠছে। পাঁচ-ছ'জন লোক ছুটে গেলো সেই দিকে। মহাত্মা কিন্তু তাঁর হাত তুলে

জনতাকে শান্ত থাকতে বললেন। আমি তখন স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। কয়েক মিনিট পরেই দেখলাম, মদনলালকে ধরে পুলিশ-শিবিরের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তারপর দেখলাম, চার-পাঁচজন লোক, সম্ভবত পুলিশ, তাঁবু থেকে বেরিয়ে আমার দিকে আসছে। মদনলাল হয়তো পুলিশে আমার কথা বলে দিয়েছে, এই ভেবে আমি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। কিন্তু তারা আমার দিকে এলো না। কিছু লোক তখন প্রার্থনা সভা থেকে চলে যাচ্ছিলো। আমি ও শঙ্কর সেই ভিড়ে মিশে সদর ফটক দিয়ে বিড়লা ভবন থেকে বেড়িয়ে গেলাম।

"সেখান থেকে বেরিয়ে একটা টাঙ্গা করে গেলাম হিন্দু মহাসভা আপিসে। সেখানে পৌঁছে শঙ্করকে আপিসের পেছন দিককার জঙ্গলে হাতবোমাগুলি ফেলে দিয়ে আসতে বললাম। শঙ্কর বেরিয়ে যেতেই বিছানাপত্র বাঁধতে আরম্ভ করলাম আমি।

"ইতিমধ্যে নাথুরাম ও আপ্তে এসে পৌঁছলেন। আপ্তে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? আমি তাঁদের তিরস্কার করে বাইরে বেরিয়ে যেতে বললাম। বেরিয়েও গেলেন তাঁরা। শঙ্কর যখন ফিরে এলো ততোক্ষণে আমার বিছানা বাঁধা হয়ে গেছে। এই সময়ে আমার মনে পড়লো যে, গোপাল গড্‌সে অস্ত্রশস্ত্রের থলেটি রেখেছিলেন হলঘরের আলমারিতে। শঙ্করকে সেই থলেটিও ফেলে দিয়ে আসতে বললাম। শঙ্কর আমার আদেশ পালন করলে। কিন্তু খালি থলেটি সে ফিরিয়ে এনেছিলো। ছাদের উপর থলেটি ফেলে রেখে, বিছানাপত্র নিয়ে মহাসভা আপিস থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। তারপর বিড়লা মন্দিরের কাছে একটা টাঙ্গা ভাড়া করে রওনা হলাম নয়া দিল্লী রেলওয়ে স্টেশনের দিকে।

"স্টেশনে গিয়ে বোম্বাইয়ের তু'খানা তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটলাম। ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় দেখলাম, চারিদিকে পুলিশ

ঘোরাফেরা করছে। আমার মনে ভয় হলো, সন্দেহও জাগলো। তখন আর-একটি টাঙ্গা করে শঙ্করকে নিয়ে চলে এলাম পুরানো দিল্লী স্টেশনে। সেখান থেকে রাত সাড়ে ন'টা কি দশটার ট্রেনে যাত্রা করলাম বোম্বাই।

"২২শে জানুয়ারি বেলা সাড়ে এগারোটায় এসে নামলাম কল্যাণ স্টেশনে, সেখান থেকে আবার ট্রেনে চড়ে যখন পুণা পৌছলাম, বেলা তখন চারটে কি সাড়ে চারটে।

"৩১শে জানুয়ারি সকাল সাড়ে পাঁচটা কি ছ'টার সময় আমাকে গ্রেফ্‌তার করা হয়।"

মদনলাল ধৃত হবার পর তাঁর কাছ থেকে যে-হাতবোমাটি পাওয়া গিয়েছিলো সেটি, এবং হিন্দু মহাসভা ভবনের পেছন দিককার জঙ্গলে যে-তিনটি হাতবোমা পুঁতে বাখা হয়েছিলো সেগুলি,—সব মিলিয়ে চারটি হাতবোমাই বাদগে সনাক্ত করলেন আদালতে এই বলে যে, ২০শে জানুয়াবি ঐ বোমাগুলি তাঁরা নিয়ে গিয়েছিলেন বিড়লা ভবনে। কোত্থেকে সেগুলি সংগ্রহ কবা হয়েছিলো, প্রশ্ন করা হলে, বাদগে উত্তর দেন, "কিরকিব অস্ত্রাগার থেকে।"

শ্রীযুত দফ্‌তরি: সাধারণত কোত্থেকে অস্ত্রশস্ত্র পেতেন?

রাজসাক্ষী: কিরকির অস্ত্রাগারে কাজ করতো এমন কয়েকজন লোকের কাছ থেকেই আমি অস্ত্রশস্ত্র কিনতাম। তবে অস্ত্রগুলি কিরকিতেই তৈবি কি না, বলতে পারবো না।

প্রশ্ন: আপনি বলেছেন যে, ২০শে জানুয়ারি তারিখে আপনারা সকলেই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। এই ছদ্মনাম নেবার কারণ কি আপনি বলতে পারেন?

কৌঁসুলি শ্রীযুত ডাঙ্গে এই প্রশ্নে আপত্তি জানিয়ে বলেন, "সাক্ষী গতকালই বলেছেন যে, আপ্তের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা ছদ্মনাম ধারণ

করেছিলেন। আজ আবার সেই প্রশ্নেরই আবৃত্তি করে সরকারপক্ষের কৌস্থলি আমার মক্কেলকেও (করকারেকে) জড়াতে চাইছেন।"

বিচারপতি বলেন যে, প্রশ্নটি যদি অবান্তর অথবা অগ্রহণীয় হয়, কেবল তবেই শ্রীযুত ডাঙ্গের আপত্তিকে সমর্থন করতে পারবেন তিনি।

উক্ত প্রশ্নের উত্তরে বাদগে বলেন যে ম্যারিনা হোটেলে যখন তাঁদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ভাগ করে দেওয়া হচ্ছিলো করকারে তখন আপ্তেকে বলেছিলেন যে, তাঁরা সবাই যখন প্রার্থনা সভায় যাচ্ছেন তখন সেখানে পরস্পরকে পরস্পরের ডাকবার দরকার হতে পারে। এ-অবস্থায় আসল নাম ব্যবহার করলে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে।

বাদগে আরো বলেন যে, আপ্তে ও নাথুবাম দু'জনেই ছিলেন হিন্দু মহাসভার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। নাথুবাম তো মহাসভার একজন বিশিষ্ট নেতাই ছিলেন। তিনি যখনই হিন্দু মহাসভার বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করতেন, বাদগেকেও তাঁর সঙ্গে নিয়ে যেতেন। হিন্দু মহাসভার সঙ্গে বাদগেরও যোগ ছিলো। 'হিন্দু সংগঠনে'র জন্যে তিনি সংগ্রহ করতেন অর্থ, এবং হিন্দু মহাসভার জন্যে সভ্য।

শ্রীযুত দফ্‌তরি: আপ্তে ও নাথুরাম গড্‌সের সঙ্গে দিল্লী যেতে আপনি রাজি হয়েছিলেন কেন, বলতে পারেন?

উত্তরে বাদগে অনেকগুলি কারণ দেখালেন: (১) আপ্তে ও নাথুরামের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো; (২) আমরা সকলেই হিন্দু মহাসভার হয়ে কাজ করতাম; (৩) আমার 'শস্ত্র ভাণ্ডার' চালাবার জন্যে নাথুরাম ও আপ্তের কাছ থেকে মাঝে মাঝে সাহায্য পেতাম আমি; (৪) আমি মনে করেছিলাম যে, তাঁদের কাজে আমার সাহায্য করা উচিত; (৫) আপ্তের কাছ থেকে যখন জানলাম যে, এ-কাজে তাঁতিয়া রাওয়ের নির্দেশ রয়েছে, আমি আদেশ বলেই মেনে নিয়েছিলাম সেই নির্দেশকে; (৬) যখন থেকে আপ্তে ও গড্‌সের সঙ্গে আমার

পরিচয় হয়েছিলো তখন থেকে, তাঁরা যে-কাজ করতে বলতেন তাই করতাম।

এই সময়ে শ্রীযুত সাভারকর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে আদালতকে অনুরোধ করেন যে, সাক্ষী যে বলেছেন—আপ্তের কাছ থেকেই এ-কাজ সাভারকরের আদেশ বলে জেনেছিলেন তিনি, তাঁতিয়া রাওয়ের কাছ থেকে নয়,—এই কথাই লিপিবদ্ধ করা হোক। বিচারপতি জানান যে, সেইরূপই লেখা হয়েছে।

১৯৪৭ সালের ২৯শে মে তারিখে বাদগের কাছে করকারে যে-পত্রটি লিখেছিলেন, শ্রীযুত দফ্‌তরি তখন সেই পত্রটি আদালতে উপস্থিত করেন। দেড়শো টাকা মূল্যের বিনিময়ে দশটি "পুস্তক" অথবা "জিনিষ" বাদগেকে সরবরাহ করতে হবে, পত্রের এক স্থানে তার উল্লেখ আছে। পত্রটি সম্পর্কে বাদগে বলেন যে, করকারের সঙ্গে তাঁর বেচা-কেনা চলতো, তাঁর কাছে তিনি অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করতেন। পত্রে যে 'পুস্তক' ও 'জিনিষে'র উল্লেখ আছে, তা আর কিছুই নয়,—'বোমা'।

শ্রীযুত মঙ্গলে: করকারে ও বাদগের ব্যব-সম্পর্ক সম্বন্ধে এ-প্রশ্ন কি করে প্রাথমিক হতে পারে?

শ্রীযুত দফ্‌তরি উত্তরে বলেন যে, তিনি প্রমাণ করতে চান, করকারে ও বাদগের মধ্যে যে-পরিচয় বর্ত্তমান ছিলো তা শুধু সাধারণ পরিচয় নয়, তার সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র সংবাহনের (traffic in arms) সম্পর্কও জড়িত ছিলো। বাদগে সাক্ষ্যে বলেছেন যে, তিনি বহু লোককে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতেন। তাঁর বিবৃতির সমর্থনেই এই পত্র উপস্থিত করা হয়েছে। তিনি আরো দেখাতে চান যে, অস্ত্রশস্ত্র কেনা করকারের অভ্যাস ছিলো।

বিচারপতি প্রশ্নটিকে গ্রহণ করেন।

আটাশ

সভা ও সভাপতি

এইবার আরম্ভ হলো রাজসাক্ষীর জেরা।

হিন্দু মহাসভা সম্পর্কে বাদগে বলেন যে, মহাসভা একটি সর্ব্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান। প্রত্যেক প্রদেশে, জেলায় জেলায়, সহরে সহরে, শাখা-সমিতি আছে তার। প্রতিষ্ঠানের কার্য্যকরী সমিতি এবং সর্ব্বভারতীয় সমিতিও আছে। হিন্দু মহাসভার শেষ বার্ষিক অধিবেশন হয়েছিলো গোরখপুরে, ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসে। সে-অধিবেশনে সাভারকর যোগদান করেন নি। তিনি জানেন যে, গত তিন-চার বছর ধরে সাভারকরের স্বাস্থ্য ভালো যাচ্ছিলো না বলে হিন্দু মহাসভায় কোনো কার্য্যকরী অংশ তিনি গ্রহণ করেন নি। গত তিন বছর ধরে সাভারকর বাড়ী থেকে বেরোতেন না, একথা সত্য নয়। ১৯৪৬ সাল থেকে কোনো বড়ো সভায় তিনি যোগদান করতেন না বটে, কিন্তু তাঁর বাড়ীতে ও বাড়ীর কাছাকাছি ঘরোয়া সভা ও সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন।

১৯৪১ সাল থেকে বাদগে হিন্দু মহাসভার কর্ম্মী হিসাবে কাজ করেছিলেন। 'হিন্দু সংগঠন নিধি'র জন্যে তিনি অর্থ ও সদস্য সংগ্রহ করতেন। পারিশ্রমিক বাবদ তিনি পেতেন আদায়ীকৃত অর্থের এক চতুর্থাংশ। সদস্য-সংগ্রহ বাবদ কিছু তিনি পেতেন না, তবে প্রত্যেক মাসে হাত-খরচ পেতেন ত্রিশ টাকা থেকে পঁয়ত্রিশ টাকা।

মহাসভার অনুমতিক্রমে হিন্দু সংগঠন নিধি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো কি না, বলতে পারেন না তিনি। শ্রীযুত জি. ভি. কেটকর স্থাপন করেন এই প্রতিষ্ঠানটি। এই প্রতিষ্ঠানের অর্থভাণ্ডার থেকে হিন্দু-অনাথ-আশ্রমকে সাহায্য করা হতো, এবং বাদগের মতো প্রচার-কর্ম্মীরাও সেই ভাণ্ডার থেকে মাসিক একটা হাত-খরচ পেতেন। টাকাকড়ি সংক্রান্ত সমস্ত

ব্যাপারই শ্রীযুত কেটকরের অধীনে পরিচালিত হতো বটে, কিন্তু শ্রীযুত ভোপৎকার ও শ্রীযুত সাভারকরের অনুমতি না নিয়ে কিছু করবারও যো ছিলো না তাঁর। এ-খবর বাদগে জানতে পেরেছিলেন এই জন্যে যে, যখনই তাঁর অর্থের প্রয়োজন হতো, তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হতো "অন্ন সাহেব" ভোপৎকারের নিকট।

আরো প্রশ্নের উত্তরে বাদগে বলেন :

"এ-কথা সত্য যে, তাঁতিয়ারাও সাভাকর একজন উঁচুদরের কবি এবং মারাঠি ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। মারাঠি ও ইংরেজি ভাষার বক্তৃতায় সমগ্র ভারতে সাভারকরের যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ আছেন বলে তো মনে হয় না। হিন্দু সম্প্রদায়ের নেতা হিসাবেই যে শুধু তাঁকে শ্রদ্ধা করি, তাই নয়; আমি তাঁকে মূর্ত্তিমান দেবতা বলে মানি। ছ'বছর তিনি হিন্দু মহাসভার সভাপতি ছিলেন। তিনি ইংরেজি ও মারাঠি—দুই ভাষাতেই বহু পুস্তক রচনা করেছেন। মারাঠি ভাষায়-লেখা তাঁর বহু গ্রন্থ আমি পাঠ করেছি। আমার মতে তাঁতিয়ারাও সাভারকরের সমকক্ষ শ্রেণীর লেখক দ্বিতীয় নেই।

"সাভারকরের রচিত পুস্তক আমি বিক্রি করতাম। একই আদর্শ নিয়ে লিখিত অন্যান্য অনেক পুস্তকও বিক্রি করেছি আমি। হ্যাঁ, কংগ্রেসের বই আমি বেচি নি কোনোদিন। শুধু মহারাষ্ট্রে নয়, ভারতের সর্ব্বত্রই তাঁতিয়ারাও-এর বহু অনুরক্ত ভক্ত রয়েছেন। আমি কয়েকবার সাভারকর-সদনে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু একবারই মাত্র সাভারকরকে আমি দেখেছিলাম। তাঁতিয়ারাও বাস করতেন গৃহের দ্বিতলে।

"সাভারকরের জন্মতিথি-উৎসব অনুষ্ঠানের কথা মনে আছে আমার। দু'টি অনুষ্ঠান হয়েছিলো,—একটি পুণায়, অপরটি বোম্বাইয়ের গোয়ালিয়া ট্যাঙ্ক ময়দানে। পুণায় মারাঠিরা তাঁকে টাকার তোড়া উপহার দিয়েছিলেন। বোম্বাইয়ের উৎসবেও টাকার তোড়া উপহার দেওয়া হয়ে-

ছিলো। আমি শেষোক্ত উৎসবে যোগদান করেছিলাম। আমার যে একটি শস্ত্র ভাণ্ডার আছে,তাঁতিয়ারাও তখন তা জানতেন কি না, বলতে পারি না। প্রতি বৎসরই সাভারকরের জন্মতিথি-উৎসব পালিত হতো।

"হিন্দু মহাসভা কর্তৃক প্রবর্তিত পতাকাকে বলা হতো 'ভগোয়া ঝাণ্ডা', তার গায়ে আঁকা থাকতো একটি তরবারি ও 'কুণ্ডলিনী'র চিত্র। আমি জানি যে, গত ১৫ই আগস্টের স্বাধীনতা-দিবস-উৎসব উপলক্ষে সাভারকর তাঁর গৃহে হিন্দু মহাসভার পতাকা ও জাতীয় পতাকা—দুই-ই উত্তোলন করেছিলেন। সাভারকরের দু'জাতীয় পতাকা উত্তোলনকে হিন্দু মহাসভা-পন্থীগণ ভালো চোখে দেখেন নি। নাথুরাম, আপ্তে এবং আমি নিজেও এজন্যে অসন্তুষ্ট হয়েছিলাম। নাথুরাম ও আপ্তের সঙ্গে এ নিয়ে আমার আলাপ-আলোচনাও হয়েছিলো।

"হিন্দু মহাসভার নীতি ছিলো এই যে, ভারত বিভাগ হবে না। এমন কি, এখনো তাঁদের নীতি এই যে, খণ্ডিত ভারতকে পুনরায় এক করতে হবে। ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় যে ভারতীয় ডোমিনিয়ন সরকারের একজন মন্ত্রী, তা আমি জানি।"

শ্রীযুত ভোপৎকার: আপনি কি জানেন যে, সাভারকরের অনুমতি নিয়েই ডাঃ মুখার্জি মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছিলেন?

শ্রীযুত দফ্‌তরি: তা উনি কি করে বলবেন? ও তো শোনা কথা।

বিচারপতি: (বাদগেকে) আপনি কি জানেন?

বাদগে বলেন যে, মন্ত্রী-সভায় যোগদানের জন্যে ডাঃ মুখার্জি তাঁতিয়া-রাওয়ের অনুমতি নিয়েছিলেন।

শ্রীযুত ভোপৎকার: আপনি কি জানেন যে, তিনি শ্রীযুত এল. বি. ভোপৎকারের অনুমতিও নিয়েছিলেন?

বাদগে: তিনি শ্রীযুত ভোপৎকারের অনুমতিও নিয়েছিলেন নিশ্চয়।

বাদগে বলেন যে, শ্রীযুত ভোপৎকারও হিন্দু মহাসভার সভাপতি

ছিলেন। নেহ্রু-মন্ত্রী-সভাকে শক্তিশালী করাই ছিলো তখন হিন্দু মহাসভার নীতি। গত ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বর মাসে 'বারশি'তে মহা-রাষ্ট্রীয় প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভার অধিবেশনে, সভাপতিরূপে শ্রীযুত ভোপৎকার, হিন্দু মহাসভার নীতি সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব পাঠ করেন। প্রস্তাবে বলা হয়েছিলো যে, কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে মহাসভা কাজ করবেন এবং নেহ্রু-সরকারকে সমর্থন করবেন। নাথুরাম গড্‌সে ও আপ্তে এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। এমন কি, শ্রীযুত ভোপৎকারকে মারবার জন্যে নাথুরাম একটি ছোরা পর্য্যন্ত বের করে-ছিলেন। বাদগে বলেন, "আমরা সেখানে না থাকলে ভোপৎকারকে সেদিন ছুরি মারা হতো। আমরাই তাঁকে বাঁচাই।"

১৯৪২ সালের নববর্ষের দিন, কি দশহরার দিন, বাদগে শস্ত্র-ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তখন তাঁর মূলধন ছিলো পঁচাত্তর থেকে একশো টাকার মধ্যে। শঙ্কর কাজে নিযুক্ত হয় ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর কি অক্টোবর মাসে।

বাদগে বলেন যে, হিন্দুদের উপকারেব জন্যেই বে-আইনীভাবে তিনি অস্ত্রশস্ত্র কেনা-বেচা করতেন। ১৯৪০ কি ৪১ সালে দীক্ষিত মহারাজের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি একজন ধর্ম্মগুরু ও সনাতনী। তিনি কংগ্রেসপন্থী কি না, সাক্ষী জানেন না। তিনি সময়-সময় দীক্ষিত মহা-রাজের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন। কারণ মহারাজ তাঁর কাছ থেকে অস্ত্রাদি ক্রয় করতেন। মহারাজ যে কেন অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করতেন, সাক্ষী তা কোনোদিন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন নি। তবে তাঁর ধারণা হয়েছিলো যে, হিন্দুদের জন্যেই মহারাজ অস্ত্রাদি কিনতেন।

শ্রীযুত ভোপৎকার: আপনি যখন জানেন না, দীক্ষিত মহারাজ কেন অস্ত্র ক্রয় করতেন, তখন আপনি কেন বলছেন যে, তিনি হিন্দুদের জন্যেই অস্ত্রাদি কিনতেন?

সাক্ষী: যখনই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে তখনই মহারাজ অস্ত্রাদি ক্রয় করেছেন। তা থেকেই আমি ধরে নিয়েছিলাম যে, তিনি হিন্দুদের জন্যেই অস্ত্রশস্ত্র কিনতেন। আমিও কেবলমাত্র হিন্দুদের কাছেই অস্ত্রাদি বিক্রি করতাম। আমি ছ' ইঞ্চি থেকে ন' ইঞ্চি লম্বা ছোরা, বাঘনখ ইত্যাদি, যা অস্ত্র-আইনের ধারায় পড়ে না এরূপ, অস্ত্র বিক্রি করতাম।

এই সময়ে বিচারপতি, শ্রীযুত ভোপৎকারকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বাঘনখ অস্ত্র কি প্রকার, এবং সাধারণত তা ব্যবহৃত হয় কি না। উত্তরে শ্রীযুত ভোপৎকার বলেন যে, আত্মরক্ষার জন্যেই ঐ অস্ত্র ব্যবহৃত হয়। ঐ বাঘনখ দিয়েই শিবাজী, আফজল খাঁকে হত্যা করেছিলেন।

বাদগে তারপর বলেন যে, ১৯৪৭ সাল থেকেই দীক্ষিত মহারাজকে তিনি অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করতেন। এক-একটি ১৫০৲ টাকা হিসাবে কিছু হাতবোমা, ২০০৲ টাকায় একটি গানকটন স্ল্যাব, শতকরা ১৫০৲ টাকা হিসাবে এক হাজার ডেটোনেটার, কয়েক প্যাকেট বিস্ফোরক ও ৫০০৲ টাকায় একটি পিস্তল তিনি দীক্ষিত মহারাজের কাছে বিক্রি করেছিলেন। দীক্ষিত মহারাজের ভাই দাদা মহারাজ হচ্ছেন বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের একজন গুরু। পুণায় হিন্দু রাষ্ট্র আপিসের উদ্বোধনকালে দাদা মহারাজের নিকট তিনি চল্লিশ প্যাকেট বিস্ফোরক দ্রব্য বিক্রি করেছিলেন। দীক্ষিত মহারাজ ঐ প্যাকেটগুলির দাম ১২৮০৲ টাকা সাক্ষীকে মিটিয়ে দিয়েছিলেন। সাক্ষী জানতেন যে, দাদা মহারাজ একজন সনাতনী, তবে তিনি কংগ্রেস-পন্থী ছিলেন কি না, বলতে পারেন না। অহিংসাপন্থী কংগ্রেসীরা কখনও বাদগের কাছ থেকে অস্ত্রাদি ক্রয় করেন নি।

উনত্রিশ

হত্যার উদ্দেশ্যে

আদালতে আসবার সময় আসামীপক্ষের কৌশুলিদের দেহ-তল্লাসীর নিয়ম আছে। তার প্রতিবাদে শ্রীযুত ব্যানার্জি কয়েকদিন আগে একটি দরখাস্ত দাখিল করেছিলেন আদালতে। ২৬শে জুলাইর শুনানির প্রাক্কালে সেই দরখাস্তের কথা উঠলো। শ্রীযুত ব্যানার্জি বললেন যে, এই কারণেই তিনি আসামীপক্ষের মামলা পরিচালনার জন্যে প্রয়োজনীয় আইন পুস্তক আদালতে আনছেন না।

শ্রীযুত দফ্তরি বলেন, নিরাপত্তার জন্যে ভারত সরকার কতকগুলো ব্যবস্থা অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, আদালতের সীমানার মধ্যে যাতে কোনো অননুমোদিত ব্যক্তি না আসতে পারে কিংবা কোনো অননুমোদিত বস্তু, যেমন ছড়ি লাঠি, অথবা কোনো ছলে হাতবোমা, ছুরি ইত্যাদি আনীত না হয়, তাই দেখবার জন্যে পুলিশকে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে থাকতে হবে। ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে এই নির্দ্দেশ যথারীতি নিয়মিত পালিত হয়ে থাকে। শ্রীযুত ব্যানার্জিকে এই আশ্বাস তিনি দিচ্ছেন যে, ব্যাগ প্রভৃতি আনীত বস্তুর মধ্যে কি আছে, তা দেখাই পুলিশের উদ্দেশ্য। এর মধ্যে অশোভন বা অন্যায় কিছু নেই। অতীতের অভিজ্ঞতার জন্যেই সতর্কতার আবশ্যক। সাক্ষীর কাঠগড়ায় উঠবার সময় একবার একজন পুলিশ-ইনস্পেক্টরের পিঠে ছোরা মারা হয়েছিলো। বাঙলা দেশে একজন রাজসাক্ষীকে গুলী করা হয়েছিলো। আর-এক স্থলে গুলী করে একজন রাজসাক্ষীকে গুরুতর ভাবে জখম করা হয়েছিলো। এক স্থানে বিচারকের মাথায় কাঠের টুকরা ছুড়ে মারা হয়েছিলো একটি। এখানে সরকারপক্ষের কৌশুলিদের দেহও তল্লাস করা হচ্ছে। বর্ত্তমানে রাজসাক্ষী সাক্ষ্য দিচ্ছেন আদালতে। তাঁর

বাড়ী পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর হত্যার অব্যবহিত পরে আরো কয়েকজন প্রধানতর ব্যক্তির বাড়ী আক্রান্ত হয়েছিলো। তাঁদের জীবনও বিপন্ন হয়েছিলো। আসামীদের উপরেও যে আক্রমণ হবে না, একথা মনে করবার কোনো হেতু নেই।

বিচারপতি: আমি একটি বেনামী চিঠি পেয়েছি। আমার প্রাণনাশ করা হবে বলে চিঠিতে ভয় দেখানো হয়েছে।

শ্রীযুত দফ্‌তরি: এরূপ চিঠি পূর্ব্বে আরো কতকগুলো পাওয়া গেছে।

শ্রীযুত ব্যানার্জি: আমরাও এরকম চিঠি পেয়েছি।

তারপর শ্রীযুত দফ্‌তরির কথার উত্তরে শ্রীযুত ব্যানার্জি বললেন যে, তাঁর দরখাস্তের উদ্দেশ্য শুধু নীতিগত প্রশ্ন উত্থাপন। কৌসুলিদেরকে বিশ্বাস করা উচিত। নিজের দেহ-তল্লাসীতে সম্মত হতে তাঁদেরকে অনুরোধ করা উচিত নয়। আসামীপক্ষের কোনো কৌসুলি কোথাও কোনো হিংসাত্মক কাজ করেছেন, এমন ঘটনার কথা তিনি কখনো শোনেন নি।

বিচারক মন্তব্য করলেন,—নিরাপত্তা রক্ষার ব্যবস্থা শিথিল করা যেতে পারে না। তাঁর দেহ-তল্লাস করা হবে বলেই যদি শ্রীযুত ব্যানার্জি সঙ্গে কোনো পুস্তক আনতে চক্ষুলজ্জা বোধ করেন তবে তাঁর প্রয়োজনীয় পুস্তকের কথা পূর্ব্বাহ্নে আদালতকে জানালে বিচারক তাঁর জন্যে ঐ সব পুস্তক আগে থেকেই আদালতে আনিয়ে রাখবেন।

শ্রীযুত ভোপৎকারের জেরা আবার আরম্ভ হলো।

জেরার উত্তরে বাদগে বললেন, ১৯৪৬ সালের শেষে কি ১৯৪৭ সালের গোড়ায় তিনি হিন্দু রাষ্ট্র দলের সদস্য তালিকাভুক্ত হয়েছিলেন। পুণায় নাথুরাম গড্‌সে ও আপ্তে পরিচালিত হিন্দু রাষ্ট্র দলের শিবিরে তিনি যোগদান করেন নি; তবে অস্ত্রাদি বিক্রি করবার জন্যে একটি দোকান খুলেছিলেন তিনি সেখানে। 'অগ্রণী' আপিসেও তিনি প্রায়ই যেতেন। দু'বার অগ্রণী-র জামিন তলব করা হয়েছিলো। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে

সাহায্য করবার জন্যে গড্‌সে ও আপ্তে অনুরোধ জানিয়েছিলেন তাঁকে। বাদগে নিজে কোনো অর্থসাহায্য করেছিলেন কি না, স্মরণ নেই তাঁর। অগ্রণী পরে লিমিটেড কোম্পানিতে পরিবর্তিত হয়েছিলো কি না, সাক্ষী তা জানেন না। তিনি জানতেন, কয়েকজন লোক কিছু অর্থ সংগ্রহ করে "হিন্দু রাষ্ট্র" প্রকাশ করতে সুরু করেন। নাথুরাম ছিলেন সেই পত্রিকার সম্পাদক, আপ্তে ছিলেন ম্যানেজিং ডিরেক্টার।

শ্রীযুত ভোপৎকার: বেআইনীভাবে অস্ত্রশস্ত্র বেচাকেনার ব্যবসা আরম্ভ করবার আগে আপনি কি হাতবোমা, গান-কটন স্ল্যাব, পিস্তল ইত্যাদির ব্যবহার সম্পর্কে প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন ?

সাক্ষী: নিয়মিত কোনো শিক্ষা আমি গ্রহণ করি নি। তবে যাঁরা আমার কাছে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করতেন তাঁরাই বলে দিতেন, কি করে অস্ত্রের ব্যবহার করতে হয়।

প্রশ্ন: আপনি কি কখনো পলতেযুক্ত কোনো বোমা নিক্ষেপ করেছেন, বা কোনো বিস্ফোরক ব্যবহার করেছেন ?

উত্তর: আমি নিজে কোনো বোমা বা বিস্ফোরক ব্যবহার করি নি।

বাদগে তারপর বলেন যে, পিস্তল বা রিভলবার-পিছু পঞ্চাশ টাকা এবং গানকটন বা হাতবোমা-পিছু পঁচিশ টাকা করে ব্যবসায়ে লাভ করতেন তিনি। করকারের কাছে তিনি একটি স্টেনগান বেচেছিলেন। তাতে তাঁর লাভ হয়েছিলো একশো টাকা। তাঁর ক্রেতাদের মধ্যে কেউ-কেউ তাঁকে এমন প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে, পুলিশ যদি তাঁকে গ্রেফ্‌তার করে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা আনে তবে সেই ক্রেতারাই তাঁর পক্ষ-সমর্থনের ব্যয়ভার বহন করবেন।

আপ্তের কাছে যখন তিনি অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করতেন তখন লাভসহ পুরাপুরি দামই আদায় করতেন। সুতরাং দালালির কোনো প্রশ্নই উঠে না। আপ্তে কয়েকবার তাঁকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন, একথা স্মরণ

করে কখনো কখনো জিনিষের জন্যে আপ্তের কাছে কোনো দামই চাইতেন না। অস্ত্রাদি বিক্রির জন্যে নাথুরাম ও আপ্তে তাঁকে বহু লোকের কাছে নিয়ে যেতেন। সময় সময় তাঁরাও আর্থিক সাহায্য করতেন বাদগেকে।

১৯৪৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি আপ্তে তাঁকে নিয়ে গিয়েছিলেন হিন্দু রাষ্ট্রের আপিসে। গানকটন ও হাতবোমার প্রয়োজন ছিলো তাঁর (আপ্তের)। গড্‌সেকে আপ্তে বলেছিলেন, "আমাদের একটা কাজ শেষ হয়েছে।" বাদগে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "অপর কাজটি কি?" আপ্তে উত্তর করেছিলেন, পরে তিনি বাদগেকে জানাবেন।

শ্রীযুত ভোপৎকার: জিনিষগুলো পুণায় না নিয়ে বোম্বাইয়ে নেওয়া হবে কেন, এ-সম্পর্কে আপ্তেকে আপনি কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

সাক্ষী: আমি জানতাম, আপ্তে নিজে জিনিষগুলো বোম্বাইয়ে বয়ে নিয়ে যাবেন না। কিন্তু তাঁকে কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করবার প্রধান কারণ হচ্ছে এই যে, আমি কখনো আপ্তের নির্দ্দেশ অমান্য করতাম না।

প্রশ্ন: ১০ই জানুয়ারি আপ্তেকে যে-জিনিষগুলি (দু'টি গানকটন ও পাঁচটি হাতবোমা) সরবরাহ করতে আপনি স্বীকৃত হয়েছিলেন তার মূল্য কতো?

উত্তর: আনুমানিক ১১৫০৲ টাকা।

প্রশ্ন: ১৪ই জানুয়ারি রাত্রি সাড়ে ন'টা কি দশটার সময় যখন আপনি দীক্ষিত মহারাজের বাড়ী গিয়ে তাঁর ভৃত্যের হাতে থলেটি দিয়েছিলেন তখন, থলের মধ্যে কি ছিলো তা কি আপনি তাকে জানিয়েছিলেন?

উত্তর: এরূপ জিনিষ আমি প্রায়ই সেখানে নিয়ে যেতাম। সুতরাং থলেতে যে কি থাকতে পারে, ভৃত্যের কাছে তা অজানা ছিলো না নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন: এ-কথা কি সত্য যে, ভৃত্য থলেটি নিতে চায় নি, এবং বলেছিলো যে, দীক্ষিত মহারাজকে সে ঘুম থেকে ডেকে তুলবে

উত্তর : না। দীক্ষিত মহারাজকে জাগাতে চাকরটিকে আমি নিষেধ করেছিলাম, এ-কথাও সত্য নয়।

প্র : এ-কথা কি সত্য নয় যে, ভৃত্যের প্রতিবাদ সত্ত্বেও আপনি থলেটি থানে রেখে চলে গয়েছিলেন ?

উত্তর : না, এ-কথা সত্য নয়। ১৫ই জানুয়ারি তারিখে যখন গড্‌সে আপ্তে, মদনলাল, করকারে ও আমি দীক্ষিত মহারাজের বাড়ী গিয়েছিলাম তখন ভৃত্য সেই থলেটি আনলে। আমি থলেটি খুলে আপ্তেকে দেখাবার জন্যে ভেতরকার জিনিষপত্র বের করি। হাতবোমা কি করে ব্যবহার করতে হয়, আপ্তেকে যখন তাই বোঝাচ্ছিলাম তখন দীক্ষিত মহারাজও আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন।

অতঃপর সাক্ষী বলেন যে, ১৫ই তারিখে দীক্ষিত মহারাজের ওখান থেকে বেরিয়ে প্রাঙ্গণের বাইরে এসে আপ্তে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন যে, সাক্ষী তাঁদের সঙ্গে দিল্লী যাবেন কি না।

শ্রীযুত ভোপৎকার : এ-কথা কি সত্য নয় যে, দীক্ষিত মহারাজকে আপনি আপনার দিল্লী যাবার কথা বলেছিলেন ?

সাক্ষী : না। ১৫ই জানুয়ারি করকারে ও মদনলাল জিনিষগুলো নিয়ে চলে যাবার পর আমরা দীক্ষিত মহারাজের সঙ্গে তাঁর ঘরেই বসেছিলাম। আপ্তে তখন মহারাজকে বলেছিলেন যে, আমরা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের জন্যে বাইরে চলে যাচ্ছি। পরে ১৭ই জানুয়ারি তারিখে আপ্তে এবং আমরা যখন আবার দীক্ষিত মহারাজের বাড়ী গিয়েছিলাম, আপ্তে তাঁকে বলেছিলেন যে, আমরা ত্রিশ হাজার থেকে চল্লিশ হাজার টাকার মতো গোলাবারুদ সংগ্রহ করে কাশ্মীর যাচ্ছি। সেদিন আপ্তে একটি কি দু'টি রিভলবার চেয়েছিলেন দীক্ষিত মহারাজের কাছে। তার পরেই কাশ্মীর যাবার ক

১৬ই জানুয়ারি শঙ্করকে সঙ্গে নিয়ে বাদগে যান পুণায়। বোম্বাইয়ে

ফিরেন ১৭ই তারিখ সকালে। তারপর নাথুরাম, আপ্তে ও বাদগেতে মিলে যাত্রা করেন সাভারকর-সদনে। বাদগেকে নীচের তলায় রেখে আপ্তে ও গড্‌সে উপরে উঠে যান। সাভারকর-সদন থেকে তাঁরা যান বোম্বে ডাইং ওয়ার্কস-এ। চরণদাস নামে একজন লোকের সঙ্গে গড্‌সে ও আপ্তের কথাবার্ত্তা হয় সেখানে।

প্রশ্ন: আপনি মধ্যম শ্রেণীর যাত্রী হয়ে দিল্লী গিয়েছিলেন। তখন আপনার সঙ্গে ছিলো সাড়ে তিনশো টাকা। তবে কুরলায় নিজের জন্যে আরো চারশো টাকা কেন আপনি সংগ্রহ করেছিলেন?

উত্তর: যদি দিল্লীতে কোনো ফ্যাসাদে পড়ি, আর আপ্তে কিংবা দলের অন্য কেউ যদি আমায় সাহায্য না করেন, তখন খরচের জন্যে আমার টাকার দরকার হতে পারে, এই ভেবেই পটবর্দ্ধনের কাছ থেকে চারশো টাকা ধার করেছিলাম আমি।

বাদগে তারপর বলেন যে, ২০শে জানুয়ারি তারিখে সকলের মধ্যে অস্ত্রাদি ভাগ করা হয়ে যাবার পর যখন তাঁরা ম্যারিনা হোটেল ছেড়ে চলে আসেন তখনও শঙ্করের কাছে তিনি মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার সমগ্র পরিকল্পনাটি বলেন নি।

বাদগে বলেন, "সেদিন সন্ধ্যায় শঙ্করকে বলেছিলাম যে, কোনো লোকের উপর আমি হাতবোমা ছুড়বো, তুমিও ঠিক তারই উপর তোমার হাতবোমা ছুড়বে; আমি যখন কোনো লোককে গুলী করবো, তুমিও ঠিক তাকেই গুলী করবে। আমি আরো বলেছিলাম যে, যাকে মারতে হবে সেই বুড়ো লোকটি 'গান্ধী' নামে পরিচিত।"

শ্রীযুত ভোপৎকার: ২০শে জানুয়ারি জনাব সুরাবর্দ্দিও কি প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়েছিলেন?

সাক্ষী: প্রার্থনা সভায় আমি তাঁকে দেখি নি।

প্রশ্ন: এ-কথা কি সত্য যে, আপনি আপনার হাতবোমাটি শঙ্করের

হাতে দিয়ে দিয়েছিলেন ; ভেবেছিলেন, যদি তল্লাসী হয় তবে শঙ্করকেই গ্রেফ্তার করা হবে, আর আপনি রেহাই পেয়ে যাবেন ?

উত্তর : আমরা যখন প্রার্থনা সভায় গিয়েছিলাম তখন,—করকারে, গোপাল গড্সে ও মদনলাল—প্রত্যেকের হাতেই এক-একটি হাতবোমা ছিলো। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা যখন হাতবোমা ছুড়বেন তখন শঙ্করকে আমি দু'টি হাতবোমাই ছুড়বার জন্যে সঙ্কেত জানাতে পারবো—এই ভেবেই আমি তা করেছিলাম।

প্রশ্ন : যখন আপনি ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে স্বীকৃত হয়েছিলেন তখন কি স্বতই আপনার মনে ভবিষ্যৎ-আশঙ্কার উদয় হয় নি ?

উত্তর : আমি যখন ষড়যন্ত্র অনুযায়ী কাজ করেছিলাম ঠিক তখনই এরূপ চিন্তা আমার মনে জেগেছিলো।

প্রশ্ন : আপনি ট্যাক্সিতে পিস্তল দু'টি রেখে দিয়েছিলেন। হাতবোমা দু'টিও কেন সেখানে রাখেন নি ?

বিচারপতি : সাক্ষী সেখানে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার উদ্দেশ্য নিয়েই গিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে, যখন করকারে ও অন্যান্য সবাই তাঁদের হাতবোমা ছুড়বেন তখন শঙ্করকেও তিনি তাই করবার জন্যে সঙ্কেত জানাবেন।

প্রশ্ন : একথা কি সত্য যে, ভয় পেয়েই আপনি রিভলবার দু'টি ট্যাক্সিতে রেখে দিয়েছিলেন ?

উত্তর : রিভলবারের কোনো প্রয়োজন ছিলো না। যে-কাজ আমরা করতে চেয়েছিলাম, হাতবোমা ছুড়েই তা করা যেতো। প্রয়োজন ছিলো না বলেই রিভলবার দু'টি আমি ট্যাক্সিতে রেখে দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : যদি মনে করেছিলেন যে, হাতবোমা ছুড়েই হত্যাকাণ্ড সাধিত হতে পারে তবে ম্যারিনা হোটেল থেকে প্রার্থনা সভায় কেন রিভলবার সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিলেন ?

উত্তর : ম্যারিনা হোটেলে এরূপ ধারণা আমার মনে জাগে নি। প্রার্থনা সভায় পৌছেই একথা আমার মনে হয়েছিলো।

শ্রীযুত ভোপৎকার : ১৪ই থেকে ১৮ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত আপনারা সকলেই প্রথমে বোম্বাই ও পরে দিল্লীতে কর্ম্মব্যস্ত ছিলেন। তখন কি আপনি জানতেন যে, মহাত্মা গান্ধী অনশন আরম্ভ করেছিলেন ?

সাক্ষী : আমি জানতাম যে, পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দেওয়ার ব্যাপারেই তিনি অনশন করেছিলেন।

আদালত এই প্রশ্নে আপত্তি জানান।

শ্রীযুত ভোপৎকার : (আদালতকে) গান্ধীজীর এক . । বছর বেঁচে থাকবার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে না, আমার মক্কেল শ্রীযুত সাভারকর এরূপ মন্তব্য করেছিলেন বলে আদালতে বলা হয়েছে। আমি প্রমাণ করতে চাই যে—

আদালত : সাক্ষীর ঐ উক্তি গ্রহণযোগ্য নয়, কারণ তা জনশ্রুতির পর্য্যায়ে পড়ে।

বাদগে আরো বলেন যে, ৩১শে জানুয়ারি ভোর সাড়ে পাঁচটায় তাঁকে গ্রেফ্তার করে নিয়ে যাওয়া হয় ফরাসখানা থানায়। একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিলেন থানায়। তারপর আরো কয়েকজনের সঙ্গে সাক্ষীকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ক্যান্টনমেণ্ট থানায়। শঙ্করকে তাঁর সঙ্গে গ্রেফ্তার করা হয় নি। ফেব্রুয়ারি মাসের সাত কি আট তারিখে বাদগে জানতে পারেন যে, শঙ্করকে গ্রেফ্তার করা ৩শে যে সাক্ষীকে আনা হয় দিল্লীতে। রাজানুগ্রহ লাভ করেন তিনি ২১শে জুন।

সাক্ষীকে একটি বিবৃতি দেখানো হয়। হিন্দু রাষ্ট্রের জন্যে তিনি কি-কি কাজ করেছিলেন তার উল্লেখ রয়েছে ঐ রিপোর্টে। রিপোর্টটি সাক্ষীর নিজেরই রচনা। ঐ রিপোর্টের এক স্থানে লেখা ছিলো যে, ১৯৪৩ সালের ২৬শে এপ্রিল দু'জন পুলিশ-দারোগা এসে তাঁকে হঠাৎ

মারপিট করেছিলেন। পরে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, সাক্ষীর নিকট বিনা লাইসেন্সে পিস্তল ও রিভলবার ছিলো বলে পুলিশ খবর পায়, এবং হঠাৎ তাঁকে মারপিট না করলে তিনি রিভলবার ব্যবহার করতে পারেন বলেই পুলিশ তাঁকে মারধর করেছিলো।

প্রশ্ন : ১৯৪৩ সালেও তা হলে আপনি বে-আইনী ভাবে পিস্তল ও রিভলবারের ব্যবসা করতেন ?

উত্তর : আমি যে সে-ব্যবসা করতাম না, শুধু তা নয়, তখন অবধি আমি পিস্তল কিংবা রিভলবার চোখেও দেখি নি। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি ঐ বস্তুটি আমি প্রত্যক্ষ করি। ১৯৪৩ সালে আমি এমন-সব অস্ত্র বেচা-কেনা করতাম যার জন্যে কোনো লাইসেন্সের দরকার হতো না।

প্রশ্ন : ৭ঠা ফেব্রুয়ারি যখন আপনাকে বোম্বাইয়ে আনা হয় তখন থেকে পুলিশের কাছে বিবৃতি দেওয়া পর্য্যন্ত, পুলিশ আপনার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করেছিলো ?

উত্তর : আমার সঙ্গে ভালো ব্যবহারই করা হয়েছে।

এরপর আদালত আসামী নাথুরাম গডসের এক আবেদন মঞ্জুর করে এই মর্ম্মে নির্দ্দেশ দিয়েছেন যে, নিজের বিবৃতি প্রস্তুত করবার জন্যে "হিন্দু রাষ্ট্র দর্শন" পুস্তকটি প্রত্যহ মধ্যাহ্ন-ভোজের সময়ে আধ ঘণ্টার জন্যে আসামীকে দেওয়া যেতে পারে। পুস্তকটি নাথুরামেরই। নাথুরামকে গ্রেফতার করবার পর, দিল্লী জংশন রেলওয়ে স্টেশনের প্রথম শ্রেণীর বিশ্রাম-কক্ষ থেকে নাথুরামের অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে ঐ পুস্তকটিও পুলিশ উদ্ধার করেছিলো।

ত্রিশ

বেতার-ঘোষণা ও রেকর্ড

শ্রীযুত ভোপৎকারের পর সাক্ষীকে জেরা করতে আরম্ভ করেন কৌসুলি শ্রীযুত ওক।

জেরার উত্তরে বাদগে বলেন যে, বহুবার তিনি নাথুরাম গড্‌সের বাড়ী গিয়েছেন। গোপাল গড্‌সেকে তিনি চিনতেন না, তবে নাথুরাম ও তাঁর ভাই দত্তাত্রেয় গড্‌সেকে সেখানে তিনি দেখতে পেতেন। (দত্তাত্রেয় গড্‌সে এই মামলায় জড়িত নন, সাক্ষ্যপ্রসঙ্গে বাদগে শুধু তাঁর নাম উল্লেখ করেছেন)।

অতঃপর বাদগে বলেন যে, ২০শে জানুয়ারি মধ্যাহ্ন-ভোজের পর তিনি নাথুরাম গড্‌সের ঘরে গিয়ে দেখলেন, নাথুরাম বিছানায় শুয়ে আছেন। সেদিনের মধ্যে ওই প্রথম তাঁর সঙ্গে সাক্ষীর দেখা হয়।

হিন্দু মহাসভা ভবন থেকে ম্যারিনা হোটেলে যাবার সময় তিনি নিজে কোনো "জিনিষ" বয়ে নিয়ে যান নি।

একথা সত্য যে, বিড়লা ভবনের দিকে রওনা হবার সময় নাথুরাম তাঁকে ও অন্যান্য সকলকেই বলেছিলেন যে, তাঁর মাথা ধরেছে, তিনি পরে সেখানে যাবেন। নাথুরাম গড্‌সের ঘরে দরজা বন্ধ করে গোপাল গড্‌সে যখন রিভলবার মেরামত করছিলেন এবং তাঁরা হাতবোমা ও গানকটনে ডোটোনেটার ইত্যাদি লাগাচ্ছিলেন তখন নাথুরাম ছিলেন তাঁদের কাছেই দাঁড়িয়ে। শঙ্করও ছিলো সেখানে।

২০শে জানুয়ারি সন্ধ্যায় বিড়লা ভবনে শঙ্কর তার পকেটে একটি রিভলবার ও একটি হাতবোমা রেখেছিলো। ট্যাক্সির কাছে গিয়ে বাদগে যখন শঙ্করের কাছ থেকে রিভলবারটি চেয়ে নেন তখন, মদনলাল পরে যেখানে বোমা বিস্ফোরণ করেছিলেন সেইখানে কেবল দু'তিন জন লোক দাঁড়িয়ে ছিলো।

২০শে জানুয়ারির আগে তিনি কখনো মহাত্মা গান্ধীর কোনো প্রার্থনা সভায় যোগদান করেন নি। প্রায় আঠারো মাস আগে পুণার এক সভায় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে আপ্তে বলেছিলেন যে, নয়া দিল্লীর ভাঙ্গী পল্লীতে মহাত্মা গান্ধীর এক প্রার্থনা সভায় তিনি বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন। আপ্তে সেই বক্তৃতায় এ-ও বলেছিলেন যে, তিনি একটি বিরাট শোভাযাত্রা পরিচালনা করবার পর মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে গিয়েছিলেন ভাঙ্গী পল্লীতে। তাঁকে দেখে "মহাত্মা গান্ধী ভয়ে ভেতরে চলে যান।"

শ্রীযুত ওক্বের পর জেরা আরম্ভ করেন শ্রীযুত মঙ্গলে।

তাঁর জেরার উত্তরে বাদগে বলেন যে, ১৯৪৭ সালে তিনি "বীর সাভারকর বচনালয়" (লাইব্রেরি) প্রতিষ্ঠা করেন। কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মতবাদ জানবার জন্যে তিনি মারাঠি দৈনিক পত্রিকা পড়তেন। দেশের রাজনৈতিক ব্যাপার সম্বন্ধে আগ্রহ ছিলো তাঁর।

নাথুরাম ও আপ্তে ছিলেন তাঁর বন্ধু।

কয়েকজন লোকের কাছ থেকে তিনি বিস্ফোরক দ্রব্যাদি কিনতেন। তাঁদের একজনের নাম গুরুদয়াল সিং। প্রায় দশ হাজার টাকার বিস্ফোরক গুরুদয়াল সরবরাহ করেছিলেন তাঁকে।

কিরকি কারখানার কর্ম্মচারী কংসের সঙ্গেও পরিচয় ছিলো তাঁর। কংসও তাঁকে গানকটন, কার্ত্তুজ, ফিউজ তার, হাতবোমা, ডেটোনেটার ও বিস্ফোরক দ্রব্যের প্যাকেট সরবরাহ করতেন। সে-সব জিনিষ কিরকি কারখানায় ছিলো কি না, সাক্ষী তা জানতেন না।

হরবন সিং নামে একজন সাক্ষীকে প্রায় হাজার টাকার গানকটন, রিভলবার, পিস্তল ও কার্ত্তুজ সরবরাহ করেছিলেন। কিরকি কারখানার অপর এক মাদ্রাজী কর্ম্মচারী কৃষ্ণ সিংকেও জানতেন তিনি। কংস ও কৃষ্ণ সিং তাঁকে যে-মাল সরবরাহ করেছিলেন তার দাম হবে প্রায় চোদ্দ কি পনেরো হাজার টাকা।

শ্রীযুত মঙ্গলে : এ-কথা কি সত্য যে, ১৫ই জানুয়ারি বোম্বাইয়ে হিন্দু মহাসভা ভবনে আপ্তে আপনাকে বলেছিলেন যে, ভারত সরকার পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দেবেন না বলে স্থির করেছেন ?

সাক্ষী : না এ-কথা সত্য নয়।

প্রশ্ন : এ-কথা কি সত্য যে আপ্তে বলেছিলেন, ভারত সরকারকে পাকিস্তানের হাতে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিতে বাধ্য করবার জন্যেই মহাত্মা গান্ধী ১৩ই জানুয়ারি থেকে অনশন সুরু করেছেন ?

উত্তর : এ-কথা সত্য নয়।

প্রশ্ন : এ-কথা কি সত্য যে, আপ্তে বলেছিলেন,মহাত্মা গান্ধীর এই কার্য্যের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যে দিল্লী যাওয়ার প্রয়োজন।

উত্তর : না।

বাদগে বলেন যে, ২০শে জানুয়ারি বেলা প্রায় দশটার সময়, শঙ্কর ও তাঁকে নিয়ে আপ্তে ট্যাক্সি করে বিড়লা ভবনে গিয়েছিলেন। সেখানে আপ্তে একটি গবাক্ষজালের মাপ নেন। তাতে দু'তিন মিনিট সময় লেগেছিলো। সে-সময়ে বিড়লা ভবন বা অন্য কোনো স্থান থেকে কোনো লোক তাঁদের কাছে আসে নি।

শ্রীযুত মঙ্গলে : একটি হাতবোমার ব্যাস কতোখানি, আপনি জানেন ?

সাক্ষী : না।

প্রশ্ন : আপনি হাতবোমা ছুড়তে জানেন ?

একটি হাতবোমা আদালতে দেখানো হলে, হাতবোমার ব্যবহার কিরূপে করতে হয়, সাক্ষী তা দেখিয়ে দেন।

শ্রীযুত মঙ্গলের পর জেরা করতে উঠলেন শ্রীযুত ডাঙ্গে।

প্রথমেই তিনি প্রশ্ন করলেন : আপনি সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছেন কি ?

আদালত : এই প্রশ্ন করে আপনি কি সাক্ষীকে উপহাস করবার চেষ্টা করছেন, না আর কিছু ?

শ্রীযুত ডাঙ্গে : পরে আমি এই প্রসঙ্গে আসবো।

তারপর জেরার উত্তরে বাদগে বলেন, প্রথমে তিনি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। কংগ্রেসের আদর্শ ও নীতি তাঁর ভালো না লাগায় ১৯৩৪সালের শেষে কি ১৯৩৫ সালের গোড়ার দিকে ইচ্ছা করেই তিনি কংগ্রেসের সদস্য-পদ পরিত্যাগ করেন। চার-পাঁচ বছর ধরে কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন তিনি। পরে তিনি হিন্দু মহাসভার সদস্য হয়েছিলেন। রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘের কাজে কোনো অংশ গ্রহণ করেন নি তিনি।

শ্রীযুত ডাঙ্গে : পুণায় 'মহারাষ্ট্রীয় ব্যাসমণ্ডল' প্রতিষ্ঠান ভারতীয় সৈন্য-বাহিনীর জন্যে কমিশন-প্রাপ্ত-অফিসার সংগ্রহ করতো, এ-কথা কি আপনি জানেন?

সাক্ষী : হ্যাঁ, প্রতিষ্ঠানটির কথা আমি জানি।

এ-প্রশ্ন প্রাসঙ্গিক কি না, আদালত জিজ্ঞাসা করলে শ্রীযুত ডাঙ্গে উত্তর করেন যে, কতকগুলি প্রতিষ্ঠান যুবকদের অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার শিক্ষা দিচ্ছিলো বলে সাক্ষী যে-উক্তি করেছেন, আমি প্রমাণ করতে চাই যে, তাঁর সেই উক্তি বিকৃত; ঐ প্রতিষ্ঠানগুলি যুদ্ধ ব্যাপারে গবর্নমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতা করতো বলেই তাদের অস্ত্রশিক্ষা দেওয়া হতো।

বাদগে বলেন যে, যুদ্ধপ্রচেষ্টায় হিন্দু মহাসভা, গবর্নমেণ্টকে সমর্থন করেছিলেন।

অন্য প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন, করকারে তাঁর কাছ থেকে একশোটি ছোরা ও একটি বর্ম্মাচ্ছাদন কিনেছিলেন। সেটি ছিলো ছুরির আঘাত প্রতিহত করবার উপযোগী। দাম ছিলো তার পঞ্চাশ টাকা। পরে তিনি আরো এমন বর্ম্মাচ্ছাদন বিক্রি করেছিলেন যেগুলো ছোটোখাটো বুলেটের আঘাত প্রতিহত করবার ক্ষমতা রাখতো। সেই বর্ম্মগুলোর এক-একটির দাম ছিলো পঁচাত্তর থেকে দেড়শো টাকা।

আপ্তের কাছে বারোশো টাকায় যে-স্টেন-গানটি তিনি বিক্রি

করেছিলেন তার দাম কিছু দিয়েছিলেন আপ্তে, আর কিছু দিয়েছিলেন করকারে। তাঁর ধারণা ছিলো যে, করকারের জন্যেই আপ্তে কিনেছিলেন সেই স্টেন-গানটি। আপ্তে ও করকারের কাছে তিনি তিন হাজার টাকার অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ বিক্রি করেছিলেন। তাঁদের কে, কি ভাবে সেগুলো ভাগ করে নিয়েছিলেন, বলতে পারেন না তিনি।

অনশনহেতু ১৭ই জানুয়ারি তারিখে মহাত্মা গান্ধীর জীবনাশঙ্কা ঘটেছিলো, বাদগে এ-কথা জানতেন।

এ-সম্বন্ধে বাদগের প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিলো না, এই কারণে আদালত এই প্রশ্নটি অগ্রাহ্য করেন। শ্রীযুত ডাঙ্গে বলেন যে, ঘটনাটির সত্যতা প্রমাণে বেতার-ঘোষণাকে বিশ্বাস করা যেতে পারে। বিচারপতি মন্তব্য করলেন, বেতারে যা শোনা যায় তাই সত্য হয় না।

এই সময়ে শ্রীযুত ব্যানার্জি প্রস্তাব করেন যে, গান্ধীজীর কণ্ঠস্বরসম্বলিত রেকর্ডকে সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। ন্যুরেমবার্গ মামলায় হিটলারের কণ্ঠস্বরসম্বলিত রেকর্ড বাজানো হয়েছিলো, এ-কথার উল্লেখ করেন শ্রীযুত ব্যানার্জি।

গান্ধীজীর অনশন সম্পর্কে বাদগের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হোক, এই বলে শ্রীযুত ডাঙ্গে বারবার অনুরোধ জানাতে থাকেন আদালতকে। বিচারপতি তাঁকে এ-সম্বন্ধে একটি আবেদন করতে বলেন। শ্রীযুত ডাঙ্গেও রাজি হন তাতে।

বাদগে স্বীকার করেন যে, তিনি তাঁর দৈনন্দিন কার্য্যাবলীর একটি ডায়েরি রাখতেন, কিন্তু তাঁর দোকান যখন পুড়িয়ে দেওয়া হয় তখন সেটিও তার সঙ্গে ভস্মীভূত হয়। বে-আইনী আদান-প্রদানের কোনো কথা ডায়েরিতে লিখতেন না তিনি।

শ্রীযুত ডাঙ্গে: ৩১শে জানুয়ারি থেকে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত পুণার পুলিশ-হাজতে থাকাকালে আপনি কি সুস্থ ছিলেন?

সাক্ষী : আমি বেশ সুস্থ ছিলাম।

প্রশ্ন : গ্রেফ্‌তারের পর আপনার কি কোনো চিকিৎসার প্রয়োজন হয়েছিলো ?

উত্তর : আমি কি একবারও অসুস্থ হয়েছিলাম ?

বিচারপতির নির্দ্দেশ অনুযায়ী ২৯শে জুলাই তারিখে শ্রীযুত ডাঙ্গে একটি আবেদনপত্র পেশ করলেন আদালতের সমুখে। তার মর্ম্ম এই যে,—গত কালের জেরায় রাজসাক্ষী বাদগে বলেছেন যে, ১৯৪৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি অনশনব্রতী মহাত্মার অবস্থা সঙ্কটজনক ছিলো বলে তিনি আপ্তের কাছ থেকে জেনেছিলেন (আপ্তে এ-সংবাদ জেনেছিলেন সংবাদ-পত্র থেকে),—এই কথা আদালত কর্ত্তৃক লিপিবদ্ধ করা হোক।

বিচারপতি বলেন, শ্রীযুত ডাঙ্গে আজ যে-লিখিত আপত্তি উত্থাপন করেছেন, কালকের আপত্তি থেকে সেটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। তারপর কৌঁসুলিকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, "আপ্তে যদি তাঁকে কিছু বলে থাকেন আমি তা লিপিবদ্ধ করতে প্রস্তুত। কিন্তু আপনি যদি চান (বাদগের সাক্ষ্য থেকে) যে, গান্ধীজী আমৃত্যু অনশনব্রত অবলম্বন করেছিলেন—এ-কথা আমি নিজেই ধরে নিই, তবে আমার পক্ষে তা করা সম্ভব হবে না।"

বিচারপতি পুনরায় বাদগেকে ঐ প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করবার জন্যে অনুরোধ জানান। তদনুসারে তিনি প্রশ্ন করেন, "১৯৪৮ সালের ১৭ই জানুয়ারি তারিখে আপনি কি আপ্তের কাছ থেকে একথা শুনেছিলেন যে, মহাত্মা গান্ধী অনশন করছিলেন এবং তাঁর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন ছিলো ?"

বাদগে : আপ্তে যে আমাকে এরূপ বলেছিলেন, এ-কথা সত্য নয়।

ঐ একই আবেদনে শ্রীযুত ডাঙ্গে আরো জানিয়েছেন যে, বাদগের কাছে করকারের লিখিত একটি পত্র আদালতে প্রদর্শিত হয়েছে। সাক্ষ্য সম্পর্কে সেই পত্রটি অগ্রাহ্য করা হোক। কারণ, পত্রটিকে টুকরো টুকরো

করে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছিলো ; তাকে পূর্ণাঙ্গ করতে, পরে সেই ছিন্ন খণ্ড-গুলো একটা কাগজের উপরে সেঁটে দিতে হয়েছে। তা ছাড়া বাড়গে তাঁর জেরায়ও বলেছেন যে, তাঁর নির্দ্দেশ অনুসারে পত্রের ছেঁড়া টুকরো-গুলি কাগজের উপর জুড়ে দেওয়া হয় নি। অতএব পত্রটি একটি ছেঁড়া দলিল, এবং ছেঁড়া দলিলের আইনত মূল্য নেই। এই মামলায় সেটিকে আইনত মূল্যবান কোনো প্রমাণ স্বরূপ গণ্য করা যেতে পারে না।

বিচারপতি : পত্রটি ইতিপূর্ব্বেই গৃহীত হয়েছে, সুতরাং এ-বিষয়ে আপনার যা কিছু বলবার, সওয়াল জবাবের সময়ে বললেই ভালো হয়।

অতঃপর কৌঁসুলি শ্রীযুত ব্যানার্জি সাক্ষীকে জেরা করতে আরম্ভ করেন।

শ্রীযুত ব্যানার্জি : আপনি যদি কারো উপর একটি হাতবোমা ছুঁড়েন তবে সেই লোকের কি মৃত্যু হতে পারে ?

সাক্ষী : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : মদনলাল যখন গানকটনের সাহায্যেই বিস্ফোরণ ঘটাবে ঠিক ছিলো, তখন তাঁর হাতে আবার বোমা দেওয়া হয়েছিলো কেন ?

উত্তর : স্থির হয়েছিলো যে, মদনলাল যেইমাত্র বিস্ফোরণ ঘটাবে অমনি মদনলালসহ আমরা সবাই এক সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীকে লক্ষ্য করে হাতবোমা ছুড়বো।

প্রশ্ন : এ-কথা কি সত্য যে, ২০শে জানুয়ারি সকালে ঠিক হয়েছিলো যে, জাফরির ফাঁক দিয়ে আপনাকেই হাতবোমা ছুড়তে হবে ?

উত্তর : না। ম্যারিনা হোটেলেই সে-কথা স্থির হয়।

প্রশ্ন : এ-কথা কি সত্য যে, আপনি ও শঙ্কর বোম্বাই থেকে দিল্লীতে এই চারটি (আদালতে প্রদর্শিত) হাতবোমা নিয়ে এসেছিলেন ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : বোম্বাই থেকে আপনি দু'টি রিভলবার ও গানকটন দিল্লীতে নিয়ে এসেছিলেন, এ-কথা সত্য ?

উত্তর : না। আমি কেবল একটি ছোটো রিভলবার ও তদুপযুক্ত চারটি কার্তুজ এনেছিলাম।

প্রশ্ন : এ-কথা কি সত্য যে, আশ্রয়প্রার্থীদের কাছে বিক্রি করবার জন্যে আপনি মদনলালকে একটি হাতবোমা ও একটি গানকটন দিয়েছিলেন ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : এ-কথা কি সত্য যে, মদনলাল কাউকে আঘাত করতে অনিচ্ছাপ্রকাশ করেছিলো এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যে সে কেবলমাত্র বহু দূরে একটি বিস্ফোরণ ঘটাতে চেয়েছিলো ?

উত্তর : না।

অতঃপর শ্রীযুত মেহ্‌তা জেরা করেন বাদগেকে।

শ্রীযুত মেহ্‌তা : যেদিন আপনাকে গ্রেফ্‌তার করা হয় সেদিন থেকেই আপনি মুক্তি পাবার জন্যে চেষ্টা করছেন,—না ?

বাদগে : কৃত কার্য্যের জন্যে ফলভোগ করতে প্রস্তুত ছিলাম আমি। মানসিক দুশ্চিন্তা আমার ছিলো। মুক্তির লক্ষ্য আমার ছিলো না।

প্রশ্ন : এ-কথা কি সত্য যে,২০শে জানুয়ারি সকালে আপনি ভীত হয়ে শঙ্করকে কোনো নিরাপদ স্থানে অস্ত্রশস্ত্রগুলি পুঁতে রাখতে বলেন ?

উত্তর : না, এ সত্য নয়।

প্রশ্ন : এ-কথা কি সত্য যে, ২০শে জানুয়ারি আপনি একলা উত্তেজিত অবস্থায় ফিরে আসেন এবং শঙ্করকে বলেন, দেরি না করে জিনিষপত্র গুছিয়ে আপনার সঙ্গে পুণায় ফিরে যেতে ?

উত্তর : না।

একত্রিশ

প্রভু-ভৃত্যে

৩০শে জুলাইর শুনানি এই মামলার একটি স্মরণীয় ঘটনা। আপনার-নিযুক্ত কৌসুলির পরিবর্তে আসামী শঙ্কর কিস্তায়া নিজেই এ-দিনে জেরা করেন রাজসাক্ষীকে। প্রভু-ভৃত্যের বাকযুদ্ধ অবাকজলপানের মতোই মজাদার লেগেছে আমাদের মন-রসনায়।

কিন্তু মন মজাবার আগে একটা গুরুতর সমস্যার কথা বলে নিই আপনাদের কাছে। শুনানির আগে ডাঃ পারচুরে ও গোপাল গড্‌সের পক্ষের কৌসুলি শ্রীযুত ইনামদার একটি দরখাস্ত দাখিল করলেন আদালতে। তাতে গুরুতর একটি প্রশ্নের অবতারণা করা হয়েছে। সেটি হচ্ছে এই যে, ২০শে জানুয়ারির ঘটনা সম্পর্কে (বিড়লা ভবনে একটি গানকটন বিস্ফোরণ) এই মামলায় যতোজন সাক্ষ্য দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রাজসাক্ষী বাদগেকে প্রায় সকলের শেষে আদালতে উপস্থিত করা হয়েছে। অথচ তাঁর (বাদগের) সাক্ষ্যের সমর্থনকারী সাক্ষীদের হাজির করা হয়েছে সকলের আগে। তার ফলে ঐ সমর্থক-সাক্ষীদের জেরার ব্যাপারে তাঁর মক্কেলের ক্ষতি হয়েছে। গত ২২শে জুন বাদগে রাজসাক্ষী হন। সঙ্গে সঙ্গে যদি তাঁকে আদালতে হাজির করা হতো তবে তাঁর মক্কেলের পক্ষে ভালো হতো। রাজসাক্ষীকে আগে হাজির না করবার কোনো কারণ থাকতে পারে না। শ্রীযুত ইনাম্‌দারের উদ্দেশ্য প্রতিবাদ জ্ঞাপন।

অতঃপর শ্রীযুত ইনামদার বাদগেকে জেরা করতে উদ্যত হবামাত্রই আসামী শঙ্কর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে উঠে বলেন যে, গতকাল বাদগেকে কয়েকটি প্রশ্ন করবার জন্যে তিনি অনুরোধ করেছিলেন তাঁর কৌসুলিকে, কিন্তু কৌসুলি সে-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন নি। অতএব নিজেই তিনি বাদগেকে জেরা করতে চান, এবং তার জন্যে আদালতে অনুমতি প্রার্থনা করেন।

আদালত সে-অনুমতি দান করেন।

শঙ্করের প্রশ্নের উত্তরে বাদগে বলেন যে, ২০শে জানুয়ারি যখন সাক্ষী ও শঙ্কর ম্যারিনা হোটেলে গিয়েছিলেন তখন তাঁরা দু'জনে কথা কয়েছিলেন মারাঠি ভাষায়।

শঙ্কর: ম্যারিনা হোটেলে যখন সকলকেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো আপনি কি তখন আমায় মারাঠি ভাষায় কোনো নির্দেশ দিয়েছিলেন?

বাদগে: 'জিনিষগুলো' কি করে ভাগ করে দেওয়া হবে এবং কিরূপেই বা সেগুলো ব্যবহার করতে হবে, এ নিয়ে যখন ম্যারিনা হোটেলে আলোচনা চলছিলো তখন, সেগুলো কি করে ভাগ করে দেওয়া হবে—সে-সম্বন্ধে শঙ্করকে আমি কিছুই বলি নি। ম্যারিনা হোটেল থেকে বিড়লা ভবনে যাবার সময়েই শঙ্করকে বলেছিলাম যে, কি কাজ তাকে করতে হবে।

শঙ্কর: গানকটনে ও হাতবোমায় যখন ডেটোনেটার লাগানো হচ্ছিলো তখন কি আমি তাতে সাহায্য করেছিলাম?

বাদগে: না, শঙ্কর তা করে নি। সে দাঁড়িয়েছিলো মাত্র।

শঙ্কর: হিন্দু মহাসভা ভবনের পেছনে জঙ্গলে যখন আমাকে গুলী করতে বলা হয়, তখন আমি কোথায় দাঁড়িয়েছিলাম

বাদগে: শঙ্কর তখন নিকটেই দাঁড়িয়েছিলো। আপ্তে তাকে ডেকে গুলী ছুড়তে বলেন।

শঙ্কর: আমি কি নিজেই গুলী করেছিলাম, না কেউ আমাকে করতে বলেছিলেন।

বাদগে: শঙ্কর নিজে কোনো গুলী করতে চায় নি। আপ্তে তাকে কেবল রিভলবারের ঘোড়াটি টিপতে বলেছিলেন।

শঙ্কর: ২০শে জানুয়ারি সকালে যখন আমরা বিড়লা ভবনে গিয়েছিলাম, তখন আপনি আমাকে কিছু করতে বলেছিলেন কি?

বাদগে: আমি শঙ্করকে কোনো নির্দেশ দিই নি।

শঙ্কর: এসব কি ব্যাপার, তা নিয়ে আপনাকে আমি কখনো কি কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলাম ?

বাদগে: শঙ্কর আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে নি। আমি নিজেই তাকে বলেছিলাম।

শঙ্কর: ২০শে জানুয়ারি বিড়লা ভবনে গিয়ে আমি কোথায় দাঁড়িয়েছিলাম ?

বাদগে: শঙ্কর মহাত্মা গান্ধীর বাঁ দিকে দাঁড়িয়েছিলো।

শঙ্কর: সেখানে যখন আপনি আমাকে ট্যাক্সির কাছে যেতে বলেছিলেন তখন আমি কোথায় দাঁড়িয়েছিলাম ?

বাদগে: যখন আমি শঙ্করকে ট্যাক্সির কাছে যেতে ইঙ্গিত করি তখন সে ফটকের কাছে আমার নিকটেই দাঁড়িয়ে ছিলো।

শঙ্কর: যখন আপনি আমার হাতে হাতবোমাটি দিয়েছিলেন তখন কি আমাকে কিছু করতে বলেছিলেন আপনি ?

বাদগে: আমি তাকে বলেছিলাম যে, আমার নির্দ্দেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত সে যেন হাতবোমা দিয়ে কিছুই না করে।

শঙ্কর: আপনি যখন আমায় বলেছিলেন যে, আমরা দিল্লী যাচ্ছি, তখন, কেন সেখানে যাচ্ছি, এ-প্রশ্ন কি আমি আপনাকে করেছিলাম ?

বাদগে: আমি শঙ্করকে বলেছিলাম যে, নাথুরাম গড্‌সে ও আপ্তের সঙ্গে আমরা দিল্লী যাচ্ছি। সে আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করে নি।

শঙ্কর: বোম্বাইয়ে শিবাজী পার্কে যখন আমরা সাভারকর-সদনে গিয়েছিলাম, তখন আমাকে আপনারা কোন জায়গায় ছেড়ে দিয়েছিলেন ?

বাদগে: বাড়ীর বাইরে ট্যাক্সির কাছেই শঙ্করকে রেখে গিয়েছিলাম।

শঙ্কর: যখন আপনারা মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করেন তখন কি তা আমি জানতাম ?

শ্রীযুত ডাঙ্গে : এটি ডবল জেরা। জেরাতে দু'টি প্রশ্ন একসঙ্গে করা হয় না।

বিচারপতি প্রস্তাব করেন যে, প্রশ্নটি দু'ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে :—

(১) গান্ধীজীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র হয়েছিলো কি ?

(২) শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত আমি কি তা জানতে পেরেছিলাম ?

শ্রীযুত দফ্‌তরি প্রস্তাব করেন যে, প্রশ্নটি এইরূপে করা যেতে পারে, "ষড়যন্ত্র করা হয়েছিলো, এ-কথা ধরে নিলেও শেষ পর্য্যন্ত কি আমি তা জানতে পেরেছিলাম ?"

শঙ্কর : মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র হয়েছিলো এ-কথা ধরে নিলেও, পুণা ও দিল্লীতে আপনাদের সঙ্গে ঘোরাফেরা করা সত্ত্বেও কি সেই ষড়যন্ত্রের কথা আমি জানতে পেরেছিলাম ?

বাদগে : বোম্বাইয়ে কিংবা দিল্লীতে শঙ্কর এ-ষড়যন্ত্রের বিষয় কিছুই জানতে পারে নি। ২০শে জানুয়ারি বেলা প্রায় চারটের সময় যখন আমরা ম্যারিনা হোটেলে গিয়েছিলাম তখন তাকে আমি এ-কথা বলেছিলাম।

এইখানে শঙ্কর তাঁর জেরা শেষ করেন।

তারপর বাদগেকে জেরা করেন শ্রীযুত ইনামদার।

জেরার উত্তরে বাদগে বলেন যে, ১৯শে জানুয়ারি তিনি দিল্লীতে এসেছিলেন। বাস করেছিলেন হিন্দু মহাসভা ভবনের হলঘরে। সেখানে তাঁর মতো কোনো দাড়িওয়ালা লোককে তিনি দেখেন নি। পরদিন তিনি ঘুম থেকে উঠেছিলেন ভোর সাড়ে চারটে কি পাঁচটায়। হলঘরে তিনি ছাড়া মদনলাল, গোপাল গড্‌সে এবং শঙ্করও ছিলেন।

২০শে জানুয়ারি প্রত্যুষে তিনি লক্ষ্য করেন যে, গোপাল গডসের স্টীল ট্রাঙ্ক ও বিছানা একটি 'দড়ি' দিয়ে জড়ানো রয়েছে।

প্রশ্ন: আপনি কি পুলিশের কাছে বলেছিলেন যে, দুপুরে মদনলাল ও করকারে যখন ম্যারিনা হোটেলে যান তখন তাঁরা তাঁদের মালপত্র, বয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে বাদগে 'শমন' (Saman) শব্দটি ব্যবহার করেন। শব্দটির অর্থ গান-কটন স্ল্যাব, মালপত্র নয়। বিচারপতি এ-কথা লিপিবদ্ধ করে রাখেন।

বাদগের জবানবন্দী ও জেরা আপাতত এইখানেই শেষ।

বত্রিশ

গুলী-তত্ত্ব

আগস্ট মাসের দু' তারিখে যে-ক'জন সাক্ষ্য দেন তাঁদের মধ্যে প্রথম হলেন পূর্ব্ব-পাঞ্জাব বিভাগের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের অধিকর্ত্তা ডাঃ ডি. এন. গোয়েল। যে-পিস্তলের গুলীতে গান্ধীজীকে হত্যা করা হয়েছিলো বলে এই মামলায় বলা হয়েছে সেই পিস্তল, মহাত্মার হত্যার দিনে প্রার্থনা সভায় কুড়িয়ে-পাওয়া দু'টি খালি কার্ত্তুজ ও দু'টি বুলেট এবং নাথুরাম গড্‌সেকে গ্রেফ্‌তার করবার সময় তাঁর হাতে যে-পিস্তল ছিলো তার ভেতরকার চারটি গুলী সম্পর্কে শ্রীযুত গোয়েল যে-সাক্ষ্য দিয়েছেন, গান্ধী-হত্যার মামলায় তা এক গুরুত্বপূর্ণ আলোকপাত করেছে। আসল সমস্যার অন্ধকার তাতে কতোটা কাটবে, মামলা শেষ না হলে তা বুঝতে পারা যাবে না। কিন্তু বোঝাবুঝির পালা আমার কাজ নয়, সোজাসুজি কাহিনী বলতেই বসেছি আমি। অতএব—

কিন্তু একটু রসভঙ্গ করে তার আগে খানিকটা নীরস কথা বলতে হবে। তবে আইনের ব্যাপারি যাঁরা তাঁদের কাছে তা আদা-জাহাজের ব্যাপারের

মতো অতোটা অবাস্তব মনে হবে না, বরং আদা-চায়ের মতোই বন্ধু-বৈঠকে তা তাঁদের তার্কিক কণ্ঠকে আরো জোরালো করে তুলবে। আর যাঁরা তা নন, আবশ্যক বলেই, সুর শোনবার আগে যন্ত্রের বেসুরো কান-মলার মতোই—ব্যাপারটাকে সহ্য করতে হবে তাঁদের।

এই মামলার শুনানির প্রায় প্রত্যহই একটা আবেদনপত্র পেশ করা হচ্ছে আদালতে। এই দিনেও তার ব্যতিক্রম হলো না। মদনলালের কৌঁসুলি এক দরখাস্ত দাখিল করলেন।

দরখাস্তে বলা হয়েছে :

১৯৪৮ সালের ২১শে জুন অপরাহ্নের শেষ দিকে আদালতের এক অধিবেশন হয়েছিলো। সেই অধিবেশনে আসামী দিগম্বর রামচন্দ্র বাদগের অপরাধ ক্ষমা করা যেতে পারে কি না, তাই নিয়ে আলোচনা হয়। তৎকালে কোনো আসামী বা তাঁদের কৌঁসুলিদের মধ্যে কেউ উপস্থিত ছিলেন না আদালতে। অপরাধ ক্ষমা সম্পর্কিত আবেদনটির একতরফা শুনানি হয় সেখানে, দরখাস্তটি করা হয় মঞ্জুর, এবং বাদগের প্রতি প্রদর্শিত হয় রাজানুকম্পা।

যে-অর্ডিন্যান্সে (১৯৪৮ সালের ১৪ নম্বর অর্ডিন্যান্স) আদালতকে অপরাধ ক্ষমা করবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা অর্ডিন্যান্সজারীকারক কর্তৃপক্ষের অধিকারের বাইরে।

কোনো অর্ডিন্যান্সবলে মূল আইনের পরিবর্ত্তন করা যেতে পারে না ; কিংবা অর্ডিন্যান্স জারি করবার আগে থেকে আদালতে যদি আসামীর বিরুদ্ধে কোনো মামলা মুলতুবি থাকে তবে সেই মামলার আসামীত্বও কোনোরূপেই ক্ষুণ্ণ হতে পারে না।

অতএব আবেদনকারীর প্রার্থনা এই, রাজসাক্ষী বাদগের অপরাধ আইনত ক্ষমার্হ নয়, এবং তাঁর দেওয়া এই আদালতের জবান-

বন্দীও প্রামাণ্য বলে গৃহীত হতে পারে না,—আদালত এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করুন।

অতঃপর শ্রীযুত গোয়েল আসেন সাক্ষ্য দিতে। তার মর্ম্ম এই :

ফৌজদারি মামলা সম্পর্কে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ পরীক্ষা করে দেখাই তাঁর প্রধান কাজ। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে পূর্ব্ব-পাঞ্জাব গোয়েন্দা-বিভাগের বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারের ভার তাঁকে দেওয়া হয়। তার আগে ১৯৩৫ সাল থেকে ঐ একই বিভাগের বৈজ্ঞানিক গবেষণা-গারের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা ছিলেন তিনি।

১৯৪৮ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখে দিল্লীর ডি. আই. জি. থেকে পুলিশের সহকারী-দারোগা শ্রীযুত ধান্নুরাম তাঁর কাছে একটি চিঠি ও শীলমোহর-করা চারটি পার্সেল নিয়ে আসেন। পার্সেলে ছিলো একটি পিস্তল, দু'টি ব্যবহৃত কার্ত্তুজ, দু'টি বুলেট, একটি কার্ত্তুজের খোল, চারটি তাজা কার্ত্তুজ। ঐ জিনিষগুলোকে পরীক্ষা করে দেখবার জন্যেই পাঠানো হয়েছিলো। পত্রটির পাদদেশে পুলিশ ট্রেনিং স্কুলের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ডি. ও. লালের স্বাক্ষর ছিলো। শ্রীযুত লাল এক্ষণে জলন্ধরেব পুলিশ-বিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর জেনারেল।

প্রেরিত পিস্তলটি থেকে যে-গুলী ছোড়া হয়েছিলো, খালি কার্ত্তুজগুলো তারই কি না, তাই পরীক্ষা করবার জন্যে অনুরোধ জানানো হয়েছিলো তাঁকে। পার্সেলের সবগুলো জিনিষই পরীক্ষা করবার পর নিজের রিপোর্ট সহ সেগুলোকে শ্রীযুত ধান্নুরামের মারফতই তিনি ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন যথাস্থানে। খালি ও তাজা—সব কার্ত্তুজই ছিলো একই ক্যালিবারের (Calibre); আকার-প্রকারও ছিলো একই শ্রেণীর।

তুলনামূলক অনুবীক্ষণের সাহায্যে ব্যবহৃত-কার্ত্তুজ পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্ত করেন তিনি যে, পিস্তল (প্রদর্শিত) থেকেই ওগুলো নিক্ষিপ্ত

হয়েছিলো। দু'টি বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র থেকে একই ক্যালিবারের দু'টি গুলী ছুড়লেও কার্তুজের উপর একই রকম দাগ পড়তে পারে না। তিনি দেখতে পান যে, তিনটি কার্তুজের খোলে ঠিক একই রকমের দাগ রয়েছে। যে-পিস্তলটি তাঁর কাছে পাঠানো হয়েছিলো তা দিয়েই প্রেরিত তাজা কার্তুজ থেকে ক'টি গুলী ছুড়েও তিনি দেখতে পান যে, তাঁর ব্যবহার-করা দু'টি খালি কার্তুজের গায়েও পূর্ব্বোক্ত তিনটি খালি কার্তুজের উপকার দাগের মতো একই রকমের দাগ পড়েছে। দাগগুলির আনু-বীক্ষণিক চিত্রও তুলেছিলেন তিনি। দু'টি পার্সেলে ব্যবহৃত-যে-চারটি বুলেট ছিলো তাও তুলনা করে তিনি দেখেন। দু'টি পার্সেলের বুলেটে একই রকম চিহ্ন দেখতে পাওয়া যায়। বিভিন্ন আগ্নেয়াস্ত্র থেকে বুলেট ছোড়া হলে তাদের গায়ে একই রকম চিহ্ন পড়তে পারে না।

মার্চ মাসের তেসরা তারিখে দারোগা শ্রীপরশরামের কাছ থেকে তিনি একটি পত্র ও একটি পার্সেল পেয়েছিলেন। পার্সেলে ছিলো তিন টুকরো কাঠ। সেগুলোকেও পরীক্ষা করে তিনি এই সিদ্ধান্ত করেন যে, কাষ্ঠখণ্ডগুলোতে যে-দাগ রয়েছে, বুলেট ছুড়েও সে-রকম দাগ করা যায়। কাঠের গায়ে যে-ছেঁদা ছিলো তা থেকে কোনো বুলেট পাওয়া যায় নি। কাঠের টুকরোগুলোতে-যে সীসা ও নাইট্রেটের অস্তিত্ব আছে, আনু-বীক্ষণিক পরীক্ষায় তা জানতে পারেন তিনি। ও-দু'টি বস্তুর যুগ্ম স্থিতি বুলেটের দাগেই সম্ভব।

শ্রীযুত ওকের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, দশ-এগারো ফুট দূর থেকে কোনো গাছের উপর রিভলবারের গুলী ছুড়লে গাছের গায়ে পোড়া দাগ হতেও পারে, আবার না-ও হতে পারে।

শ্রীযুত ওক: মনে করুন, একটি মরিচারোধক (anti-corrosive) সীসাসংযুক্ত পেরেক কোনো গাছের কাণ্ডে ঢুকিয়ে দেওয়া হলো; তাতে কি সীসার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে?

সাক্ষী : মরিচারোধক পেরেকে যদি সীসা থাকে তবে তা নিশ্চয়ই ধরা পড়বে।

প্রশ্ন : পেরেকটি ঢোকাবার আগে যদি সেটিকে তাতিয়ে নেওয়া যায় তবে তাতে নাইট্রেট পাওয়া যাবে কি ?

সাক্ষী : নাইট্রেট পাওয়া যাবে না।

শ্রীযুত মঙ্গলের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, রিভলবার ও পিস্তলের কার্ত্তুজ এক নয়। দু'টি পরস্পর স্বতন্ত্র। ·৩২ পিস্তলের কার্ত্তুজ ·৩২ রিভলবার থেকে ছোড়া যায় না।

অতঃপর বিচারপতি অন্য একটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করে আসামী শঙ্করকে বলেন যে, তাঁর কৌঁসুলি শ্রীযুত হংসরাজ মেহ্‌তা একটি আবেদন জানিয়েছেন আদালতে। গত শুক্রবার শঙ্কর নিজে বাদগেকে জেরা করেছিলেন, তার বিরুদ্ধে আপত্তি জানানো হয়েছে ঐ আবেদনে। এ-অবস্থায় শঙ্করের কি ইচ্ছা ? তিনি কি চান যে, শ্রীযুত মেহ্‌তা তাঁর পক্ষে আর ওকালতি না করুন। অথবা চান যে, তিনি শঙ্করের হয়েই কাজ করুন ?

শঙ্কর জানান যে, তাঁর ইচ্ছা—শ্রীযুত মেহ্‌তাই তাঁর পক্ষের কৌঁসুলির কাজ করেন। তবে যখনই তাঁর কৌঁসুলি মামলা সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন তখনই তাঁর দোভাষী শ্রীযুক্তা কমলাম্মার উপস্থিতিও সেখানে বাঞ্ছনীয়।

বিচারপতি সেই মর্ম্মেই নির্দ্দেশ দেবেন বলে জানিয়ে দেন।

তেত্রিশ

হোটেলে-হোটেলে

ডাঃ গোয়েলের পরবর্ত্তী সাক্ষীর নাম শ্রীসত্যবান ভিবাজী র‍্যালে। বোম্বাইয়ের "সী গ্রীন হোটেলে"র ম্যানেজার তিনি। তাঁর সাক্ষ্যের মর্ম্ম হলো এই যে, গত ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে আসামী নারায়ণ আপ্তে, নারায়ণ রাও ভি নামে পরিচয় দিয়ে তাঁর হোটেলে এসে দু'টি-বিছানাযুক্ত একটি ঘর ভাড়া করতে চেয়েছিলেন। একটি বিছানা তাঁর জন্যে, অপরটি তাঁর বন্ধু ভি. কৃষ্ণজীর জন্যে। হোটেল-রেজিস্টারি বইয়ে তাঁদের স্বাক্ষরও রয়েছে। পরের দিন তিনি হোটেলে নারায়ণ রাওয়ের সঙ্গে একজন মারাঠি মহিলাকেও দেখতে পান। ঐদিনই বেলা প্রায় সোয়া এগারোটার সময় নারায়ণ রাও হোটেল ছেড়ে চলে যান। ভদ্রলোক বলেছিলেন যে, সেখান থেকে তিনি যাচ্ছেন আর্য্য-পথিকাশ্রমে।

৩রা আগস্ট তারিখে সাক্ষ্য দেন পাঁচজন। প্রথম সাক্ষীর নাম কুমারী শান্তা ভাস্কর মোদক। তিনি বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্র্যাজুয়েট। তাঁর অন্য পরিচয়, তিনি একজন ছায়াচিত্রাভিনেত্রী। পর্দ্দায় তিনি "বিম্বা" নামেই পরিচিতা।

তিনি বলেন যে, গত ১৪ই জানুয়ারি পুণা-এক্সপ্রেসে করে বোম্বাই যাবার পথে ট্রেনে নাথুরাম ও আপ্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। বোম্বাইয়ের দাদার স্টেশনে নেমে দু'জনকেই তিনি তাঁর ভাইয়ের জীপ গাড়ি করে সাভারকর-সদনের কাছে নামিয়ে দিয়েছিলেন। আপ্তে ট্রেনে তাঁকে 'বিম্বা' বলে চিনতে পেরেছিলেন। তাঁদের কথাবার্ত্তা থেকে তিনি জানতে পেরেছিলেন যে, দু'জনেই যাবেন শিবাজী পার্কে সাভারকর-সদনে।

শ্রীযুত ওকের জেরার উত্তরে তিনি বলেন যে, সাভারকর-সদনেই তাঁরা দু'জন প্রবেশ করেছিলেন কি না, তা তিনি দেখেন নি।

দ্বিতীয় সাক্ষীর নাম শ্রীকাশ্মীরীলাল, বোম্বাইয়ের এক হোটেলের অংশীদার। তাঁর বক্তব্য এই যে, গত জানুয়ারি মাসে আপ্তে, আর-একজন সঙ্গীসহ তাঁর হোটেলে বাস করেছিলেন। ২৭শে জানুয়ারি তাঁরা হোটেল ছেড়ে চলে যান।

তৃতীয় সাক্ষীর নাম শ্রীনরসিং দুর্গাজী ভাগাজী,—পুণার সদাশিবপেটের একটি ধোপাখানার মালিক। আদালতে তাঁকে কতকগুলি কাপড়চোপড় দেখানো হলে তিনি সেগুলোকে নাথুরামের বলে সনাক্ত করেন। নাথুরাম তাঁর খদ্দের ছিলেন। খদ্দেরদের কাপড়-জামা যাতে ওলট-পালট না হয়ে যায় সেজন্যে কাপড়ের উপর তাঁদের নামের আদ্যক্ষরের ছাপ মেরে দেবার নিয়ম আছে তাঁর দোকানের।

প্রদর্শিত বস্ত্রের উপর ধোবার মার্কা সনাক্ত করে সাক্ষী বলেন যে, ঐ "এন. ভি. জি." অক্ষরগুলো তিনি নিজেই কালি দিয়ে লিখেছিলেন। নাথুরামকেও সনাক্ত করেন তিনি।

সাক্ষী আরো বলেন যে, "এন. ভি. জি." মার্কা-দেওয়া কাপড় নাথুরাম গড্‌সে ছাড়া আর কারো কাছ থেকে আসতো না।

জেরাপ্রসঙ্গে শ্রীযুত ওক প্রশ্ন করেন: এন. ভি. গ্যাডগিল নামক কারো কাপড়-চোপড়ও এসে থাকতে পারে?

সাক্ষী উত্তর করেন: না। ও-নামে কারো কাপড় আসতো না।

পরবর্ত্তী সাক্ষী হলেন আর্য্য-পথিকাশ্রম হোটেলের ম্যানেজার শ্রীগয়াপ্রসাদ দুবে। গত দেড় বছর ধরেই আপ্তের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। মাঝে মাঝে তিনি তাঁর হোটেলে এসে থাকতেন। গত ২৩শে জানুয়ারি একজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে আপ্তে তাঁর হোটেলে এসে একটি গোটা ঘর ভাড়া নেন। পরদিন একজন মহিলা এসে আপ্তের সঙ্গে হোটেলে সেই কামরায় বাস করেন। ২৫শে তারিখ তাঁরা দু'জনেই হোটেল ছেড়ে চলে যান।

এর পর সাক্ষ্য দিতে আসেন বোম্বাইয়ের এলফিনস্টোন হোটেলের বেয়ারা গোবিন্দ মালেকর। সে বলে যে, গত ২৪শে জানুয়ারি থেকে ২৭শে জানুয়ারি নাগাদ দু'জন যাত্রী এসে বাস করেছিলেন হোটেলে। সে-ক'দিন তার ডিউটির সময় তাঁদের ফাইফরমাস খেটেছিলো সে।

নাথুরাম ও আপ্তেকে ঐ দু'জন যাত্রী বলে সে সনাক্ত করে। গোপাল গড্‌সেকেও সনাক্ত করে সে বলে যে, ঐ ব্যক্তি এবং অন্য একজন মহিলা হোটেলে পূর্ব্বোক্ত যাত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন একদিন।

গত ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে আপ্তে এবং করকারেও এসে বাস করেছিলেন সেই হোটেলের পাঁচ নম্বর ঘরে।

৪ঠা আগস্ট প্রথম সাক্ষ্য দিতে এলেন বোম্বাই পার্কস্‌ হোটেলের অভ্যর্থনা-কেরাণী ক্যাণ্ডিডো পিণ্টু।

তাঁরও বক্তব্য এই যে, আপ্তে ও করকারে যথাক্রমে আর. বিষ্ণু ও এন. কাশীনাথ ছদ্মনামে পার্কস্‌ হোটেলে কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন। গত ১৪ই ফেব্রুয়ারি পুলিশ তাঁদের গ্রেফ্‌তার করে।

ঐদিন বেলা প্রায় এগারোটার সময় দু'জন পুলিশ-কর্ম্মকর্তা হোটেলে এসে অপেক্ষা করতে থাকেন। আপ্তে কি করকারে কেউ তখন হোটেলে ছিলেন না। আপ্তে ফিরে এলেন বিকেল প্রায় পৌণে ছ'টার সময়। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে গ্রেফ্‌তার করা হয়।

রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় করকারে ফিরে এলেও তেমনিভাবেই গ্রেফ্‌তার করা হয় তাঁকে। তাঁদের ঘরে যে-সব জিনিষপত্র ছিলো, রাত্রি প্রায় দশটার সময় দু'জন যাত্রীর সুমুখেই সেগুলোর একটি পাঁচনামা তৈরি করা হয়।

বোম্বাই ম্যাজেস্টিক হোটেলের পরিদর্শক মাইকেল প্যাট্রিক কেরি-ও আপ্তে এবং করকারের সম্বন্ধে হোটেল সম্পর্কিত জবানবন্দী দান করেন।

চৌত্রিশ

পঞ্চান্ন কোটি ?

৪ঠা আগস্টের প্রধান সাক্ষী হলেন বোম্বাইয়ের রামনারায়ণ রুইয়া কলেজের অধ্যাপক শ্রীজগদীশচন্দ্র জৈন। অধ্যাপক জৈনের কথা পূর্ব্বেও আমরা উল্লেখ করেছি। জৈনদের ধর্ম্মশাস্ত্র যে-ভাষায় লিখিত (Arthama Gathi) সেই ভাষা ও হিন্দী ভাষার অধ্যাপক তিনি। শ্রীযুত জৈন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. এবং বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পি-এইচ-ডি।

অধ্যাপক জৈন বলেন যে, গত অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে মদনলাল নামক কোনো আশ্রয়প্রার্থী যুবকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। গুপ্ত পদবীধারী জনৈক ব্যক্তি মদনলালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেন।

মদনলাল তাঁকে একটি চাকরির যোগাড় করে দিতে অনুরোধ জানান। কিছু চেষ্টা করেও অধ্যাপক তা যোগাড় করতে পারেন নি। চাকরির সন্ধান কিছু হলো কি না, তাই জানবার জন্যে মদনলাল দু'-একবার তাঁর বাড়ীতেও গিয়েছিলেন। তারই এক সময়ে আনন্দ সিং নামে জনৈক ব্যবসায়ীও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। মদনলাল পিয়নের চাকরি করতেও প্রস্তুত ছিলেন। আনন্দ সিং তাঁকে তরিতরকারী বিক্রির ব্যবসা করতে পরামর্শ দেন। কিন্তু ব্যবসা করবার মতো অর্থ মদনলালের কাছে ছিলো না। অধ্যাপক জৈন তখন তাঁকে স্বরচিত (জৈন-প্রণীত) পুস্তক বিক্রি করবার পরামর্শ দেন। বলেন, তাতে শতকরা পঁচিশ টাকা হারে কমিশন পেতে পারেন মদনলাল। মদনলাল রাজি হন তাতে।

২৬শে অক্টোবর থেকে মদনলাল বই বিক্রি করতে আরম্ভ করেন। দশদিন ধরে নিয়মিতভাবে তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যান। এই দশদিন ধরে প্রত্যহ একবার করে অধ্যাপকের বাড়ী এসে মদনলাল নিয়মিতভাবে

তাঁর (জৈনের) প্রাপ্য তাঁকে দিয়ে যেতেন। দেওয়ালীর অব্যবহিত পূর্ব্বে মদনলাল তাঁকে বলেন যে, বই বিক্রি করে তেমন আয় কিছু হচ্ছে না, তাই তিনি পট্‌কা (cracker) বিক্রি করবেন বলে ঠিক করেছেন। আবার কয়েকদিন পরে এসে বলেন যে, আমেদনগরে গিয়ে ফলের ব্যবসা করবার ইচ্ছা হয়েছে তাঁর। অধ্যাপক তাঁকে বলেন যে, আমেদনগরে যাবার পথে ইচ্ছা করলে তিনি (মদনলাল) তাঁর কিছু বই বিক্রি করতে পারেন। মদনলাল ও তাঁর সঙ্গী শ্রীযুত সুদ-কে অধ্যাপক জৈন তাঁর রচিত পুস্তকের প্রত্যেকটির ত্রিশখানা করে কপি দিয়েছিলেন।

তারপর কিছুকাল আর মদনলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নি তাঁর।

জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষ দিকে মদনলাল আবার অধ্যাপক জৈনের সঙ্গে দেখা করে বলেন যে, আমেদনগরে দু'টি ফলের দোকান করেছেন তিনি; রোজগারও বেশ ভালো হচ্ছে। মদনলালের সঙ্গে একজন লোক ছিলেন। মদনলাল তাঁর পরিচয় সম্পর্কে শুধু বলেছিলেন যে, সেই ভদ্রলোক আমেদনগরের একজন শেঠ। ফলের দোকানগুলির মালিক তিনিই। মদনলাল কেবল তাঁর কর্ম্মচারী। মদনলাল আরো জানিয়েছিলেন যে, তাঁরা সেখানকার মুসলমান ফলওয়ালাদের তাড়িয়ে দিয়েছেন এবং ব্যবসাটি তাঁদেরই একচেটিয়া হয়েছে।

তারই দু'তিন দিন পরে অধ্যাপকের বাড়ীতেই আবার মদনলালের আবির্ভাব হয়। সে-সময়ে পূর্ব্বোক্ত আনন্দ সিংও উপস্থিত ছিলেন সেখানে। তাঁদের সুমুখে মদনলাল তাঁর আমেদনগরের কার্য্যকলাপের কাহিনী বলেন। প্রসঙ্গত মদনলাল বলেন যে, রাও সাহেব পটবর্দ্ধন যখন হিন্দু-মুসলিম-মিলন সম্পর্কে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন মদনলাল তখন তাঁকে মারপিট করেন। হিন্দু মনোভাবাপন্ন ছিলো বলে পুলিশও কিছু করে নি। পটবর্দ্ধনকে যখন তিনি প্রহার করেছিলেন তখন মদনলালের সঙ্গে একটি ছুরি ছিলো। মদনলাল এ-ও বলেছিলেন যে, হিন্দু শরণার্থীদের জন্যে

একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেছেন তিনি। সেই বাহিনী অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করে জঙ্গলে লুকিয়ে রাখছে। মদনলালের আমেদ-নগরের কাহিনী শুনে হিন্দু মহাসভার সাভারকর তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে তাঁর পিঠ চাপড়ে নাকি বলেছিলেন, এমনি ভাবেই কাজ করে যাও।

তারপর মদনলাল বলেন যে, তাঁর দল কয়েকজন নেতার প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করছে। সাক্ষী সেই নেতাদের নাম জিজ্ঞাসা করেন। মদনলাল প্রথমে নাম বলতে রাজি হন নি। পরে তিনি মহাত্মা গান্ধীর নাম উল্লেখ করেন। গান্ধীজীর নাম শুনে অধ্যাপক জৈন বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে যান। মদনলালকে বলেন যে, মূর্খের মতো কাজ করা তাঁর উচিত নয়।

শ্রীযুত দফ্‌তরি: মদনলালের বক্তব্যের উপর আপনি কি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন?

অধ্যাপক জৈন: মোটেই না।

প্রশ্ন: তার কোনো বিশেষ কারণ আছে?

উত্তর: আমি তাঁর কথার বিশেষ গুরুত্ব দিই নি। কারণ, ঐ সময়ে আশ্রয়প্রার্থীরা সাধারণত গান্ধীজী ও কংগ্রেসকে গালাগালি করতেন।

কয়েক দিন পরে মদনলাল পুনরায় অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করে বল্লেন যে, কোনো বিশেষ কাজে তিনি দিল্লী চলে যাচ্ছেন, সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা করবেন।

মদনলাল দিল্লী চলে যাবার দু'-তিন দিন পর অধ্যাপক জৈন একটি সভায় গিয়েছিলেন। সেখানে বক্তৃতা করেছিলেন শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ। সভার শেষে তিনি শ্রীযুত জয়প্রকাশের সঙ্গে দেখা করে, মদনলালের কাছে যা শুনেছিলেন তা জানাতে চেষ্টা করেন। তিনি শুধু এইটুকু তাঁকে জানাতে পেরেছিলেন যে, দিল্লীতে সম্ভবত একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের আয়োজন চলেছে। চারিদিকে জনতার ভিড় ছিলো বলে তার বেশি আর কিছু জানাতে পারেন নি। শ্রীযুত জয়প্রকাশ, পরের দিন,

অধ্যাপক জৈনকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেছিলেন। কিন্তু সেদিন তিনি তাঁর ছেলেকে নিয়ে হাসপাতালে গিয়েছিলেন বলে শ্রীযুত নারায়ণের সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করতে পারেন নি।

২১শে জানুয়ারি সংবাদ-পত্র পড়ে তিনি জানতে পারেন, যে, মহাত্মার প্রার্থনা সভায় বোমাবিস্ফোরণ ঘটেছে এবং সেই সম্পর্কে মদনলালকে গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে। তৎক্ষণাৎ তিনি ভারতের উপমহামন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র-সচিব সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে টেলিফোনে সব কথা জানাবার চেষ্টা করেন। সর্দ্দারজী তখন বোম্বাইয়ে ছিলেন। ফোন করে জানতে পারেন যে, সর্দ্দারজী বোম্বাইয়ে নেই। তারপর তিনি বোম্বাই প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত পাতিলকেও এ-সংবাদ জানাতে চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হন। অতঃপর অপরাহ্ন চারটের সময় বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী শ্রীযুত বি. জি. খের ও স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত মোরারজী দেশাইর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, মদনলাল সম্বন্ধে যা জানতেন সমস্তই খুলে বলেন।

জবানবন্দী শেষ হলে শ্রীযুত ভোপৎকার জেরা করতে আরম্ভ করেন সাক্ষীকে।

শ্রীযুত ভোপৎকার: শ্রীযুত জয়প্রকাশ ঠিক কোন তারিখে আপনাদের কলেজে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, আপনার মনে আছে?

সাক্ষী: না।

প্রশ্ন: মদনলাল যেখানে থাকতেন আপনি সেখানে কখনো গিয়েছিলেন কি?

উত্তর: না, কখনো সেখানে যাই নি।

প্রশ্ন: আপনি কখন পুলিশের সংস্পর্শে আসেন?

উত্তর: পুলিশ যখন আমার জবানবন্দী নিতে এসেছিলো তখন।

প্রশ্ন: ষড়যন্ত্র উদঘাটনে সাহায্য করতে প্রস্তুত আছেন বলে আপনি

শ্রীযুত খের ও শ্রীযুত মোরারজী দেশাইকে জানিয়েছিলেন,—এমন কথা কি ম্যাজিস্ট্রেটকে আপনি বলেছিলেন ?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : কোন অধিকারে আপনি তা করতে চেয়েছিলেন ?

উত্তর : একজন নাগরিক হিসাবে।

প্রশ্ন : তাঁরা কি আপনার সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন ?

উত্তর : শ্রীযুত দেশাই জানিয়েছিলেন যে, এ-সম্পর্কে তদন্ত চলছে ; প্রয়োজন হলে আমাকে জানাবেন।

প্রশ্ন : পুলিশের কাছে যে-বিবৃতি দিয়েছিলেন তাতে কি শ্রীযুত খের ও শ্রীযুত দেশাইয়ের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করেছিলেন ?

উত্তর : হ্যাঁ, করেছিলাম।

প্রশ্ন : মদনলাল আপনাকে যা বলেছিলেন, আপনি কি তা লিখে রেখেছিলেন ?

উত্তর : না।

শ্রীযুত ভাঙ্গের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, মদনলাল আশ্রয়প্রার্থী ছিলেন বলেই তাঁর প্রতি অধ্যাপক জৈনের বিশেষ আগ্রহ ছিলো। তিনি একজন কংগ্রেসী লোক, এমন কথা মদনলাল বা করকারে কাউকেই তিনি বলেন নি। আমেদনগরে যে-দল গঠিত হয়েছে বলে মদনলাল তাঁকে বলেছিলেন সে-দলের বিশদ বিবরণ জানবার জন্যে মদনলাল বা করকারেকে কোনো প্রশ্ন তিনি করেন নি। ব্যাপারটার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি বলেই পুলিশকেও এ-সম্বন্ধে কিছু জানান নি।

শ্রীযুত ব্যানার্জির জেরার উত্তরে অধ্যাপক জৈন বলেন যে, তিনি জৈন-ধর্ম্ম সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করেছেন বটে, কিন্তু তাঁর অধিকাংশ রচিত গ্রন্থই রাজনীতির ও অর্থনীতির। তন্মধ্যে একটি গ্রন্থের নাম "আজাদী কি লড়াই।"

একজন মুসলমানের হাত থেকে পুষ্প নাম্নী কোনো বালিকাকে বাঁচিয়েছেন,—এই হিসাবেই শ্রীযুত গুপ্ত মদনলালের সঙ্গে সাক্ষীর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। ব্যাপারটায় জটিলতা ছিলো বলেই তিনি বালিকাটিকে শ্রদ্ধানন্দ আশ্রমে পাঠানো সম্পর্কে কোনো সাহায্যই করেন নি।

শ্রীযুত ব্যানার্জি : ১৯৪৮ সালের ১৯শে জানুয়ারি সর্দ্দার প্যাটেল বোম্বাইয়ে এক বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সে-সভায় কি আপনি যোগদান করেছিলেন ?

অধ্যাপক জৈন : বোম্বাইয়ে শিবাজী পার্কের সভায় সর্দ্দার প্যাটেল যে-বক্তৃতা দিয়েছিলেন আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম।

প্রশ্ন : ঐ বক্তৃতা থেকেই কি আপনি জানতে পারেন যে, মহাত্মা গান্ধীর জীবন রক্ষার জন্যেই ভারত-সরকার পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিয়েছিলেন ?

বিচারপতি : আপনার এই সিদ্ধান্ত একেবারেই অবাস্তর এবং সম্পূর্ণরূপে গ্রহণের অযোগ্য।

শ্রীযুত ব্যানার্জি : পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দান সম্পর্কে সর্দ্দার প্যাটেলের বক্তৃতা আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলো,—না ?

সাক্ষী : আমার মনে নেই।

প্রশ্ন : কোনো ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে কোনো কথা প্রকাশ করতে হলে জয়প্রকাশ নারায়ণের কাছে না গিয়ে পুলিশের কাছেই যাওয়া উচিত ছিলো, এ-কথা জানতেন কি ?

উত্তর : আমি কোনো পুলিশ-কর্ম্মচারীকেই চিনতাম না।

প্রশ্ন : সমগ্র বোম্বাই প্রদেশের মধ্যে একজন পুলিশ-অফিসারকেও আপনি চিনতেন না ?

উত্তর : সব সময়ে পুলিশকে বিশ্বাস করা নিরাপদ নয়।

প্রশ্ন : জয়প্রকাশ নারায়ণকে ষড়যন্ত্রের কথা জানাবার সময় আপনি কি মনে করেছিলেন যে, তিনি তা মহাত্মা গান্ধীকে কি দিল্লী-পুলিশকে জানাবেন ?

উত্তর : আমি ভেবেছিলাম যে, তিনি দিল্লী-কর্তৃপক্ষকে তা জানাবেন।

প্রশ্ন : পুলিশকে এ-কথা জানান নি কেন, শ্রীযুত দেশাই কি সোজাসুজি আপনাকে এ-প্রশ্ন করেন নি ?

উত্তর : আমি তাঁকে বলেছিলাম যে, আমি সর্দ্দার প্যাটেল, শ্রীযুত পাতিল ও শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণকে এ-কথা জানাতে চেষ্টা করেছিলাম।

প্রশ্ন : শ্রীযুত খের অথবা শ্রীযুত দেশাই আপনার বিবৃতি লিখে নিয়েছিলেন কি ?

উত্তর : না, তাঁরা লিখে নেন নি।

প্রশ্ন : মদনলাল কি আপনাকে বলেছিলেন যে, রাও সাহেব পটবর্দ্ধন, কাশ্মীর সম্পর্কে বলতে গিয়ে, শেখ আবদুল্লার প্রশংসা করেছিলেন বলেই তাঁকে তিনি প্রহার করেছিলেন ?

উত্তর : না।

অধ্যাপক জৈন আরো বলেন যে, পটবর্দ্ধন সম্পর্কিত ঘটনার দিনে আমেদনগর রেলওয়ে স্টেশনে মদনলালের সঙ্গে কারো বচসা হয়, এমন কথা মদনলাল তাঁকে বলেন নি। তাঁর (মদনলালের) মাথায় ছুরির আঘাত ছিলো, কিংবা তাঁকে পুলিশ-হাসপাতালে ভর্ত্তি করা হয়েছিলো—তেমন কথাও বলেন নি মদনলাল। জঙ্গলে কি পরিমাণ অস্ত্র ও গোলা-বারুদ তাঁরা লুকিয়ে রেখেছিলেন তা-ও মদনলাল সাক্ষীকে জানান নি; সাক্ষীও সে-সম্পর্কে বিরুদ্ধ কোনো ধারণা করেন নি।

প্রশ্ন : মদনলাল কি আপনাকে বলেছিলেন যে, পাকিস্তানে মুসলমান

সৈন্তেরা হিন্দুদের গুলী করে মারছে, ভারতেও তাদের মারছে পুলিশ আর মিলিটারিরা ?

উত্তর : পাকিস্তানে হিন্দুদের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে সাধারণ কথাবার্ত্তাই হয়েছিলো আমাদের মধ্যে।

প্রশ্ন : "ভারত ছাড়ো" আন্দোলনের ব্যাপারে আপনার অভিজ্ঞতার বিষয় কিছু বলেছিলেন মদনলালকে ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আমেদনগর থেকে কতোজন মুসলমান-ফলওয়ালাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিলো, মদনলাল তার কোনো নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা আপনাকে বলেছিলেন ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : আপনি পূর্ব্বাহ্নেই কেন সংশ্লিষ্ট-কর্ত্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানান নি, শ্রীযুত মোরারজী দেশাই কি এ-প্রশ্ন আপনাকে করেছিলেন ?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : আপনি কি উত্তর দিয়েছিলেন ?

উত্তর : আমি বলেছিলাম যে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার জন্যেই আমি বিষয়টিকে গুরুতর বলে মনে করি নি।

প্রশ্ন : আপনি শ্রীযুত মোরারজী দেশাইকে যা বলেছিলেন, ২১শে জানুয়ারির "টাইম্‌স্‌ অব ইণ্ডিয়া"য় যা পড়েছিলেন তারই উপর তার ভিত্তি ছিলো, তা কি সত্য ?

উত্তর :, এ-কথা সত্য নয়।

প্রশ্ন : মদনলালের বিবৃতিসম্পর্কে "টাইমস অব ইণ্ডিয়া"য় যা লেখা হয়েছিলো আপনি তা পড়েছিলেন ?

উত্তর : আমি যতোদূর জানি, সব কাগজেই ঐ ব্যাপার নিয়ে জল্পনা-কল্পনা প্রকাশিত হয়েছিলো।

প্রশ্ন : আচ্ছা, কাগজ পড়ে কি আপনার ধারণা হয়েছিলো যে, মদনলাল পুলিশের কাছে কোনো বিবৃতি দিয়েছেন ?

উত্তর : না, এমন ধারণা আমার হয় নি।

মদনলাল এমন কথা সাক্ষীকে বলেন নি যে, পাঞ্জাবের হিন্দুদের দুঃখদুর্দ্দশার জন্যে কংগ্রেসই দায়ী।

শ্রীযুত ইনামদার : মদনলাল ২৬শে অক্টোবর থেকে আপনার বই বিক্রি করতে সুরু করেন, ঐ তারিখটি আপনি কেমন করে মনে রেখেছেন ?

সাক্ষী : ও-কথা আমি একটা বাজে খাতায় টুকে রেখেছিলাম।

প্রশ্ন : সে-খাতা কি পুলিশকে আপনি দেখিয়েছিলেন ?

উত্তর : না।

অধ্যাপক জৈনের পরে সাক্ষ্য দেন বোম্বাইয়ের কোলাবা অঞ্চলের ফ্রেডারিক হোটেলের সহকারী ম্যানেজার মিঃ জন্ ক্রিটাস্।

পঁয়ত্রিশ

তোষণ-নীতির প্রতিক্রিয়া

অতঃপর বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণজী মহারাজের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। তিনি সাক্ষ্য দেন গুজরাটি ভাষায়।

পরম ভাগবত বল্লভাচার্য্যের বংশধর বলে বোম্বাইয়ের মোতা মন্দিরের তিনি মোহান্ত। সেই সঙ্গে একটি বিরাট ধর্ম্মসম্প্রদায়ের গুরুও বটেন। কাশীর সরকারি সংস্কৃত কলেজ থেকে ন্যায়শাস্ত্রের উপাধি পেয়েছেন তিনি। বিমানচালকরূপে একটি লাইসেন্সও আছে তাঁর। ১৯৪২ সাল থেকে তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের একজন সদস্য। দু'টি জনসভায় শ্রীযুত

সাভারকরকে তিনি দেখেছেন। শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছে তাঁর। তবে শ্রীযুত ভোপৎকারকে তিনি দেখেন নি। আপ্তেকেও তিনি জানতেন।

শ্রীযুত দফ্‌তরি : আপ্তের সঙ্গে কি ভাবে আপনার পরিচয় হলো?

সাক্ষী : কোনো লোক আপ্তের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন।

এক ব্যক্তি সাক্ষীকে বলেছিলেন যে, দিল্লীতে পাকিস্তান গণপরিষদের যে-অধিবেশন হবে আপ্তে তা ধ্বংস করবেন বলে স্থির করেছেন। আপ্তের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কয়েও সাক্ষীর ঐ ধারণাই হয়েছিলো। আপ্তে তাঁকে বলেছিলেন যে, সে-কাজ সম্পন্ন করবার মতো লোকবল তাঁর আছে, কিন্তু অস্ত্রবল নেই। আপ্তে তাঁকে মোরটারের (Morter) কথাও বলেছিলেন। কিন্তু তা কেনবার মতো অর্থ সাক্ষীর ছিলো না।

অক্টোবর মাসে আপ্তে সাক্ষীর বাসভবনে এসে দু'টি পিস্তল দিয়ে, পরিবর্ত্তে দু'টি রিভলবার চান। পিস্তল দু'টির একটি দেন তিনি তাঁর ছোটো ভাই দীক্ষিত মহারাজকে, অপরটি ফিরিয়ে দেন আপ্তেকে। যোগাড় করতে পারেন নি বলে সেদিনই আপ্তেকে তিনি কোনো রিভলবার দিতে পারেন নি।

শ্রীযুত দফ্‌তরি : আপ্তেকে কবে আপনি রিভলবার দিয়েছিলেন?

সাক্ষী : স্বাধীনতা-দিবসের পূর্ব্বে।

সাক্ষীকে আপ্তে বলেছিলেন যে, অস্ত্রাদিপূর্ণ একটি ট্রেন পাকিস্তানে যাচ্ছে, আপ্তে সেই গাড়িকে অগ্নিবর্ষী গোলা (flame thrower) দিয়ে উড়িয়ে দিতে চান। আপ্তে আরো বলেন যে, এ-কাজে দশ হাজার টাকার প্রয়োজন, কিন্তু তাঁর (আপ্তের) কাছে আছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। সাক্ষী তাঁকে বলেন যে, তাঁর কাছে দেবার মতো অর্থ নেই। আপ্তে তখন বলেন যে, একটা মোটর গাড়ি পেলে তিনি হায়দ্রাবাদ সীমান্তে গিয়ে টাকা লুট করে আনতে পারতেন।

অস্ত্রাদিসহ পাকিস্তানে ট্রেন যাবার কথা ছিলো ১৬ই অক্টোবর তারিখে। সাক্ষী আপ্তেকে বুঝিয়ে বলেছিলেন যে, অগ্নিবর্ষী গোলা না দেখা পর্য্যন্ত কোনো অর্থ-সাহায্যই তিনি করতে পারবেন না। আপ্তের সঙ্গে সাক্ষী কিরকি এবং আরো নানা জায়গায় ঘুরেও সেই গোলা সংগ্রহ করতে পারেন নি। তখনই বিস্ফোরকের কথা উঠে, এবং এই সম্পর্কে বাদগে সেখানে আসেন। বাদগের কাছ থেকে সাক্ষী চল্লিশ প্যাকেটের ৮০৮টি বিস্ফোরক কিনে আপ্তেকে দান করেন। জিনিষের দাম তখন ঠিক হয় নি, পরে দীক্ষিত মহারাজের মারফৎ বাদগেকে সাক্ষী প্যাকেট-গুলির মূল্য বাবদ বারো শো টাকা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে নাথুরাম গড্‌সের সঙ্গেও আসামীর পরিচয় হয়েছিলো। আপ্তের সঙ্গে তিনিও দু'একবার এসেছিলেন সাক্ষীর কাছে।

স্বামী-নারায়ণ-মন্দিরে প্রবেশ করবার জন্যে হরিজনেরা যে-সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেছিলো তার বিরোধিতা করবার জন্যেই ১৭ই জানুয়ারি সাক্ষী আমেদাবাদে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তিনি বোম্বাইয়ে ফেরেন ১৯শে তারিখ।

প্রশ্ন : আপ্তে ও গড্‌সেকে এর পর আপনি আবার কখন দেখেন ?

উত্তর : ২৬শে জানুয়ারি সকালে তাঁরা দু'জনেই আমার বাড়ীতে এসে একটি রিভলবার চেয়েছিলেন। রিভলবারের প্রয়োজন সম্বন্ধে আমাকে কিছুই তাঁরা বলেন নি। আপ্তে শুধু বলেছিলেন যে, রিভলবার দিয়ে কি করা হবে তা আমি পরে জানতে পারবো। আপ্তে বড়ো বেশি কথা বলতেন, কাজে কিছুই করতেন না বলে তাঁর উপর আমার কোনো বিশ্বাসই ছিলো না। আমি তাঁকে রিভলবার দিতে রাজি হই নি।

দীক্ষিত মহারাজ সাক্ষীকে ডাকতেন "দাদা ভাই" বলে। সম্ভবত সেই থেকেই সাক্ষীর নাম হয়ে থাকবে—"দাদা মহারাজ।"

শ্রীযুত ভোপৎকার জেরাপ্রসঙ্গে প্রশ্ন করেন : কোন দিন স্বাধীনতা-দিবস পালিত হয়, জানেন ?

সাক্ষী : ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট।

প্রশ্ন : স্বাধীনতা-দিবসের পূর্ব্বে আপনি দিল্লীতে এসেছিলেন, স্মরণ আছে ?

উত্তর : দিল্লীতে নিখিল-ভারত-হিন্দু-মহাসভার অধিবেশনে যোগদান করবার জন্যে বোধ করি ১৯৪৭ সালের ৯ই আগস্টের কাছাকাছি কোনো সময়ে দিল্লীতে গিয়েছিলাম। সেই অধিবেশনে শ্রীযুত সাভারকর ছিলেন সভাপতি।

শ্রীযুত সাভারকরের সভাপতিত্বে বোম্বাইয়ে হিন্দী-সাহিত্য-পরিষদের যে-সভা হয় সাক্ষী তাতেও যোগদান করেছিলেন।

প্রশ্ন : ঐ পরিষদে নেহ্‌রু গভর্নমেণ্টের সমর্থনে যে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো, আপনার মনে আছে ?

উত্তর : নেহ্‌রু গভর্নমেণ্টের সমর্থনে কোনো প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো কি না, আমার মনে নেই। আমি পরিষদে একটি বক্তৃতা করেছিলাম।

প্রশ্ন : আপনি নেহ্‌রু গভর্নমেণ্টকে সমর্থন করেছিলেন কি ?

উত্তর : আমার বক্তৃতায় নেহ্‌রু গভর্নমেণ্টকে সমর্থন করি নি আমি। আজো সমর্থন করি না। নেহ্‌রু গভর্নমেণ্ট তার বর্ত্তমান নীতির পরিবর্ত্তন সাধন না করলে, ভবিষ্যতেও সমর্থন করবো না।

প্রশ্ন : কেন আপনি নেহ্‌রু গভর্নমেণ্টকে পছন্দ করেন না ?

উত্তর : পাকিস্তানের প্রতি নেহ্‌রু গভর্নমেণ্টের তোষণ-নীতি আমি পছন্দ করি না।

১৯৪৭ সালের ৯ই আগস্ট দিল্লী সম্মেলনে শ্রীযুত সাভারকরের অভিভাষণ সাক্ষী শুনেছিলেন। সাভারকর এই মত পোষণ করতেন যে, হিন্দুদের শক্তিশালী, স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসিদ্ধ হতে হবে। এ-কথা সত্য যে,

তিনি জোর দিয়েই বলেছিলেন, স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে বিভেদ ও মতানৈক্য ভুলে রাষ্ট্র ও জাতীয় সরকারকে শক্তি-শালী করে তোলবার জন্যে সচেষ্ট হতে হবে। একথা বোম্বাইয়ের হিন্দী-সাহিত্য-পরিষদেও বলেছিলেন সাভারকর।

সাক্ষী আরো বলেন যে, বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত মোরারজী দেশাইকে তিনি বলেছিলেন, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে মুসলমানদের উপর যারা আক্রমণ চালাতে চায় তাদের কাউকে তিনি (সাক্ষী) সাহায্য করবেন না।

প্রশ্ন : শ্রীযুত দেশাইয়ের কাছে আপনার এরূপ প্রতিশ্রুতি দেবার হেতু ?

উত্তর : আমি শুনেছিলাম যে, শ্রীযুত দেশাই আমার কার্য্যকলাপে সন্দেহ পোষণ করেন। তাঁর ঐ ধারণা দূর করবার জন্যেই তাঁর কাছে গিয়েছিলাম আমি।

আপ্তেকে তিনি, জনাব জিন্না ও জনাব লিয়াকৎ আলি খাঁকে হত্যা করতে বলেছিলেন,—এমন কথা তিনি শ্রীযুত দেশাইকে বলেন নি।

প্রশ্ন : বাদগের নিকট থেকে যা পেতেন তা ছাড়াও অন্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছিলেন আপনি ?

উত্তর : হ্যাঁ। আমি হাতবোমা, ডেটোনেটার, দেশী বোমা, পিস্তল ও রিভলবার সংগ্রহ করতাম। ডিনামাইট সংগ্রহের চেষ্টাও করেছিলাম, পাই নি। বোম্বাইয়ে আমি এ-সব অস্ত্রাদি সংগ্রহ করতাম, পরে বোম্বাই ও অন্যান্য প্রদেশের নানা লোকের মাঝে সেগুলি বিলিয়ে দিতাম। কখনো জিনিষের দাম নিতাম, কখনো বিনা মূল্যেই দিতাম।

জেরাপ্রসঙ্গে শ্রীযুত ওক জিজ্ঞাসা করেন যে, মেটা মন্দিরের যে-জনসভায় সাক্ষী সভানেতৃত্ব করেছিলেন তাতে, পাকিস্তানকে ভারত সরকারের পঞ্চান্ন কোটি টাকা দানের কথা উল্লেখ করে জনৈক বক্তা কি বলেছিলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর এ-কাজ বিশ্বাসঘাতকের কাজ ?

সাক্ষী : এমন কথা সভায় শুনেছিলাম বলে আমার স্মরণ নেই।

প্রশ্ন : গান্ধীজীর নীতিকে মুস্লিম-তোষণ-নীতি বলা যায় কি ?

উত্তর : গান্ধীজী ছিলেন ভারত বিভাগের বিরোধী। পণ্ডিত নেহ্‌রু ও তাঁর সহকর্ম্মীরা ছিলেন ভারত বিভাগের পক্ষে। নীতিগত পার্থক্য তাঁদের ছিলো। অবশ্য মহাত্মাজী অধিকতর মুসলমান-পক্ষপাতী ছিলেন,—সেটাই আমি ভালো মনে করতাম না।

শ্রীযুত মঙ্গলে : আপ্তে আপনাকে যে-পিস্তল দিয়েছিলেন তার পরিবর্ত্তে আপনি কি তাঁকে কোনো রিভলবার দিয়েছিলেন ?

সাক্ষী : আমি, আপ্তে বা দীক্ষিত মহারাজ, কাউকেই কোনো রিভলবার দিই নি। পিস্তলও ফিরিয়ে দিই নি, বা পিস্তলের মূল্য বাবদ কোনো টাকাও দিই নি, যদিও ধর্ম্মত আমার তাই দেওয়া উচিত ছিলো।

প্রশ্ন : কে আপ্তের সঙ্গে আপনার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন ?

উত্তর : স্বর্গত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের পুত্র শ্রীযুত মুকুন্দ মালব্য। শ্রীযুত মালব্য আমাকে বলেছিলেন যে, আপ্তে পাকিস্তান-গণপরিষদ-ধ্বংসকামী।

শ্রীযুত ডাঙ্গের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তিনি ভাগবদ্গীতা পাঠ করেছেন।

আদালত : (শ্রীযুত ডাঙ্গেকে) একেবারে গোড়াতেই আপনি হিন্দু-ধর্ম্ম ও তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন। আপনি কি বলতে চান ?

শ্রীযুত ডাঙ্গে : একথা বিদিত যে, অতীতে হিন্দুধর্ম্ম নিয়ে যথেষ্ট মতানৈক্য ঘটেছে, এবং কোরাণের আবৃত্তি শত্রুধর্ম্মী বলেই বহু হিন্দুর মনে প্রতিক্রিয়া এনেছে। আমি সেই প্রতিক্রিয়ার কথাই প্রমাণ করতে চাইছি।

আদালত: তাঁদের কোনো কোনো কার্য্যকলাপের পশ্চাতে যে উদ্দেশ্য ছিলো—তা-ই প্রমাণ করতে চাইছেন আপনি?

শ্রীযুত ডাঙ্গে: হ্যাঁ।

হিন্দু-আশ্রয়প্রার্থীদের সেবাকার্য্যে সাক্ষীর যথেষ্ট আগ্রহ ছিলো। করকারেও এ-ব্যাপারে আগ্রহান্বিত ছিলেন কি না, তিনি জানেন না। সাক্ষী বলেন যে, পূর্ব্বেও তিনি হরিজনের মন্দির-প্রবেশের বিরোধী ছিলেন, এখনো তা-ই আছেন।

আদালতের একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুত ডাঙ্গে বলেন: আমি দেখাতে চাই যে, মুস্লিম-পক্ষপাতিত্বের নীতি ও হরিজনের মন্দির-প্রবেশ-এর ব্যাপারে অনেকেরই মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটেছিলো।

শ্রীযুত ব্যানার্জি: মন্দির-সীমানার মধ্যে কোরাণ-আবৃত্তি কি হিন্দুর ধর্ম্ম-বোধকে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ করে?

উত্তর: আমার ভাই নিজে কোরাণ আবৃত্তি করেন।

শ্রীযুত ইনামদারের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, ১৯৪৬ সালে দীপালীর পর তিনি নোয়াখালি গিয়েছিলেন। প্রায় চার হাজার হিন্দুকে তিনি ইসলাম ধর্ম্ম থেকে পুনরায় হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষিত করেন।

শ্রীযুত ইনামদার: নোয়াখালি প্রবাসকালে আপনি কি সেখানে জনাব সুরাবর্দ্দি ও তাঁর গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে কোনো অসন্তোষের প্রকাশ দেখেছিলেন?

আদালত: জনাব সুরাবর্দ্দির কথা টেনে এনে কি প্রমাণ করতে চান আপনি?

শ্রীযুত ইনামদার: আমি নিহতের (মহাত্মা গান্ধীর) সঙ্গে জনাব সুরাবর্দ্দির সংস্রব প্রমাণ করতে চাই।

এই সময়ে নাথুরাম গড্‌সে উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, সাক্ষীকে দিয়ে তিনি বলাতে চান যে. সুরাবর্দ্দির বিরুদ্ধে তখন বিক্ষোভ জেগেছিলো এবং

নোয়াখালির হত্যাকাণ্ডের জন্যে সুরাবর্দ্দিই দায়ী। এই বিক্ষোভ ও অসন্তোষ সত্ত্বেও মহাত্মা গান্ধী, জনাব সুরাবর্দ্দিকে সমর্থন করতেন; এবং নোয়াখালি-হত্যাকাণ্ডের জন্যে তাঁকেও সমভাবে দায়ী করা উচিত।

পরবর্ত্তী সাক্ষী বোম্বাইয়ের "ওরিয়েণ্টাল সিকিউরিটি লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানি"র ডেপুটি অ্যাকচ্যুয়ারি শ্রীযুত শ্রীধরনারায়ণ বৈদ্য। তাঁর সাক্ষ্যে জানা যায় যে, নাথুরাম গড্‌সের দু'টি পলিসি অনুসারে তিন হাজার ও দু' হাজার টাকার জীবন-বীমা আছে।

১৩ই আগস্ট তারিখে প্রথমে সাক্ষ্য দেন এয়ার ইণ্ডিয়া বিমান কোম্পানীর কর্ম্মচারিণী মিস্ লোর্না বেনব্রিজ। সাক্ষ্যদানপ্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, ১৯৪৮ সালের ২৭শে জানুয়ারি ডি নারায়ণ রাও ও এন্. বিনায়ক রাও নামে দু'জন যাত্রী বোম্বাই থেকে বিমানযোগে দিল্লী গিয়েছিলেন। তিনি আপ্তে ও নাথুরামকে ঐ দু'জন যাত্রী বলে সনাক্ত করেন। ঐদিনের বিমানযাত্রার যে-"প্যাসেঞ্জার সিটিং চার্ট" রচিত হয়েছিলো, মিসেস বেনব্রিজ বলেন যে, ঐটি তাঁর নিজের হাতে লেখা। ঐ চার্টে উক্ত দু'জন যাত্রীরই নাম আছে।

অতঃপর সাক্ষ্য দেন শ্রীযুত অঙ্গদ সিং।

তিনি বলেন যে, অধ্যাপক জৈনের সঙ্গে গত দু'বছর ধরে তাঁর পরিচয়। গত বছরের শেষের দিকে, সপ্তাহে দু'তিন দিন তিনি অধ্যাপকের বাড়ীতে যাতায়াত করতেন। মদনলালকে সনাক্ত ক'রে তিনি বলেন যে, গত ২৬শে অক্টোবর অধ্যাপক জৈনের বাড়ীতেই মদনলালকে তিনি প্রথম দেখেন। অধ্যাপক, সাক্ষীকে মদনলালের জন্যে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে বলেছিলেন।

তারপর সাক্ষী যা বলেন তার সঙ্গে অধ্যাপক জৈনের বিবৃতির মিল রয়েছে। অতএব পুনরায় তার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। শুধু দু'একটি প্রধান বিষয় আমরা উল্লেখ করবো এখানে।

সাক্ষী বলেন : "জানুয়ারি মাসের ১০ই কি ১১ই তারিখে মদনলাল অধ্যাপকের কাছে বলেছিলেন যে, তিনি একটি জনসভায় গিয়েছিলেন। সেখানে রাও সাহেব পটবর্দ্ধন বক্তৃতা করেছিলেন। পটবর্দ্ধন যখন বক্তৃতায় বলছিলেন যে, হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়কে ভাই-ভাই হয়ে বাস করতে হবে, মদনলাল তখন বক্তার কাছে এগিয়ে গিয়ে একটি ছোরা বের করে বক্তার জামার 'কলার' ধরে তাঁকে বলেন যে, ঐকথা আর-একবার উচ্চারণ করবার সাহস তাঁর আছে কি না। পুলিশ মাঝে পড়ে মদনলালকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

"অধ্যাপক আমাকে বলেছিলেন যে, মদনলালের দল জনৈক নেতাকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করেছেন। পীড়াপীড়ির পর মদনলাল তাঁকে জানিয়েছেন যে, সেই নেতা হলেন গান্ধীজী। এই উদ্দেশ্যে সেই দল আমেদনগরে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করছেন। সাভারকরও (ব্যারিস্টার) আছেন দলের পেছনে। মদনলালকে অধ্যাপক এরূপ কাজ থেকে বিরত হবার জন্যে অনেক বুঝিয়েছিলেন।"

সাক্ষীকে অধ্যাপক বলেছিলেন যে, সাভারকর যখন ষড়যন্ত্রের পেছনে রয়েছেন তখন ষড়যন্ত্র সত্য হতেও পারে। এ-অবস্থায় কর্ত্তৃপক্ষকে বিষয়টি তাঁদের জানানো উচিত।

২১শে জুন তারিখে খবরের কাগজে দিল্লীর বোমাবিস্ফোরণের কথা তিনি পড়েছিলেন। অধ্যাপক সেদিন তাঁকে বলেন যে, মদনলাল যা বলেছিলেন তা এবারে সত্যে পরিণত হয়েছে। তাঁরা বিষয়টি সর্দ্দার প্যাটেলকে জানাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সর্দ্দারজী তখন বোম্বাইয়ে ছিলেন না বলে তা আর সম্ভবপর হয়ে উঠে নি। শ্রীযুত পাতিলকেও জানাবার চেষ্টা করে ব্যর্থকাম হন তাঁরা। পরে শ্রীযুত বি. জি. খেরের সঙ্গে এ-বিষয়ে টেলিফোনে কথা কন। শ্রীযুত খের বিকেল চারটের সময় সেক্রেটারিয়েটে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। কিন্তু বিশেষ

কাজ থাকায় সাক্ষী ঐ সময়ে অধ্যাপক জৈনের সঙ্গে সেখানে যেতে পারেন নি।

শ্রীযুৎ ভোপৎকারের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, আট-ন' বছর তিনি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সালে সমাজতন্ত্রী-দলের সঙ্গে তিনিও কংগ্রেস ত্যাগ করেন। বর্তমানে বোম্বাই সমাজতন্ত্রী-দলের একজন সদস্য তিনি।

প্রশ্ন: পুলিশের কাছে কি আপনি করকারের নাম করেছিলেন?

উত্তর: আমার মনে নেই।

প্রশ্ন: পুলিশকে কি বলেছিলেন যে, শেঠ করকারে আমেদনগরের দলকে অর্থ-সাহায্য করছেন? মুসলমানদের দোকানগুলিও অধিকার করেছেন তিনি?

উত্তর: মনে হয়, বলেছিলাম।

ছত্রিশ

"দিল্লী-ডায়েরি"

১৬ই তারিখের অধিবেশনের প্রারম্ভেই বিচারপতি শ্রীযুত আত্মাচরণ ঘোষণা করেন যে, "দিল্লী-ডায়েরি"কে আইনগত মর্য্যাদা দেবার জন্যে শ্রীযুত ব্যানার্জি ইতিপূর্ব্বে যে-আবেদন করেছিলেন সেটিকে না-মঞ্জুর করেছেন তিনি।

শ্রীযুত ব্যানার্জি বলেন: "দিল্লী-ডায়েরি"কে আইনগত মর্য্যাদা দিলে আমাদের কাজের অনেক সংক্ষেপ হবে। নচেৎ শ্রীযুত দেবদাস গান্ধী, শ্রীমতী আভা গান্ধী, কুমারী মানু গান্ধী এবং আরো বহু

সাক্ষীকে আসামীপক্ষ থেকে আদালতে হাজির করতে হবে। অনশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গান্ধীজী স্বয়ং তাঁর প্রার্থনান্তিক ভাষণে কিছু বিবৃতি দিয়েছেন। তাঁর সেই বক্তৃতা ও কার্য্যাবলী সংবাদপত্রে বিশদভাবে প্রকাশিত হয়েছে, ভা·তীয় বেতারকেন্দ্র থেকেও ঘোষিত হয়েছে সে-কথা; অতএব সেগুলোর আইনগত মর্য্যাদা দেওয়া যেতে পারে।

উত্তরে শ্রীযুত দফ্তরি বলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনান্তিক ভাষণ বলে কথিত কয়েকটি বক্তৃতা কোনো ব্যক্তি "দিল্লী-ডায়েরি" নামক পুস্তকে প্রকাশিত করেছেন। গান্ধীজী স্বয়ং ঐ বক্তৃতাবলী লিপিবদ্ধ করেন নি। সে-ক্ষেত্রে এই আদালত কি করে মহাত্মা গান্ধীর-প্রদত্ত-বক্তৃতা-বলে-কল্পিত 'দিল্লী-ডায়েরি'র সঙ্কলিত-বক্তৃতাবলীকে আইনগত মর্য্যাদা দেবেন?

মহাত্মার অনশন হয়তো মন্ত্রীসভার দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তন করেছিলো। এ-পরিবর্ত্তনের ব্যাপার মহাত্মার অনুমানও হতে পারে। কারো কোনো অনুমানকে আদালত আইনগত মর্য্যাদা দিতে পারেন না।

বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলি বলেছেন যে, মহাত্মা গান্ধী নিজে তাঁর প্রার্থনান্তিক ভাষণ সংশোধন করে দিতেন। কিন্তু পুস্তকের কোথাও তার উল্লেখ নেই। ঐ পুস্তকে প্রকাশিত বক্তৃতাবলী যদি গান্ধীজী কর্ত্তৃক সংশোধিত বলে প্রমাণিত হতো, কেবলমাত্র তখনই উহাকে আইনগত মর্য্যাদা দেওয়া যেতে পারতো।

আদালত: মহাত্মা গান্ধী হয়তো তাঁর প্রার্থনান্তিক ভাষণে কিছু বলে থাকবেন। সেগুলো গ্রহণ করার পক্ষে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ঐ বক্তৃতা গ্রহণ করবার অধিকারও যদি আমার থাকতো, আমি তা গ্রহণ করতাম না।

তারপর শ্রীযুত অজদ সিংয়ের জেরার পূর্ব্বানুবৃত্তি আরম্ভ হয়।

শ্রীযুত ভোপৎকারের প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, আমেদনগরে মুসলমানদের তাড়িয়ে দেবার জন্যে আশ্রয়প্রার্থীদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবকবাহিনী গঠন করেছেন মদনলাল,—এ-কথা সাক্ষীর উপস্থিতিতে অধ্যাপক জৈনকে মদনলাল বলেছিলেন কি না, স্মরণ নেই তাঁর (সাক্ষীর)।

পরবর্ত্তী সাক্ষী হলেন মতুঙ্গার (বোম্বাই) শ্রীযুত গণপৎরাও ভীমরাও আফজল পুরকার। তিনি বলেন যে, হিন্দু মহাসভার জন্যে চাঁদা আদায় করতে দিগম্বর বাদগে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে আসতেন। তিন-চার বছর ধরে বাদগেকে জানেন তিনি। একবার আপ্তে এবং নাথুরামকেও সঙ্গে করে এনেছিলেন তিনি।

শ্রীযুত ভোপৎকার: বোম্বাইয়ের সনাক্তকরণ প্যারেডে যখন আপ্তে-নাথুরামের নিশানা আপনি জানতেন না তখন কি করে আপনি নিশ্চিতরূপে বলেছিলেন যে, এইজন আপ্তে এবং এইজন নাথুরাম গড্‌সে?

সাক্ষী: মামলা সুরু হবার পর ঐ দু'জনের এতো ছবি সংবাদ-পত্রে ছাপা হয়েছে যে, কে গড্‌সে আর কে আপ্তে, বলা কিছুই শক্ত নয়।

তারপর সাক্ষ্য দেন শ্রীযুত চরণদাস মেঘজী মথুরাদাস। বোম্বাই ইউনিয়ন ডাইং মিলসের একজন অংশীদার তিনি। তিনি বলেন যে, ১৯৪৭ সালের গোড়া থেকেই বাদগেকে তিনি জানতেন। লৌহবর্ম্ম নির্ম্মাণের জন্যে বাদগে একবার অর্থসাহায্য চেয়েছিলেন সাক্ষীর কাছে, সাক্ষী চারশো টাকাও দিয়েছিলেন। দু'মাস পরে বাদগে একটি লৌহবর্ম্ম উপহার দেন তাঁকে।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি এক শনিবারে আপ্তে ও নাথুরামকে নিয়ে বাদগে তাঁর কাছে আসেন। সঙ্গী-দু'জনের

পরিচয় দেন "হিন্দু রাষ্ট্র" পত্রিকার পরিচালক বলে। তাঁদের কথাবার্ত্তার মাঝে আপ্তে সাক্ষীকে বলেন যে, আট দিনের মধ্যেই তিনি একটি অসম্ভাব্য সংবাদ শুনতে পাবেন। আপ্তে সাক্ষীর কাছে পাঁচ হাজার টাকা ধার চেয়েছিলেন। সাক্ষী তাঁকে সাহায্য স্বরূপ এক হাজার টাকা দান করেন।

সনাক্তকরণ প্যারেডে সাক্ষী, নাথুরামকে ঠিকমতো সনাক্ত করতে পারেন নি। আসামী করকারেকেই নাথুরাম বলে সনাক্ত করেছিলেন তিনি।

শ্রীযুত ডাঙ্গের জেরার উত্তরে চরণদাস বলেন যে, গত জানুয়ারি াসের মাঝামাঝি আপ্তের সঙ্গে যখন তাঁর দেখা হয় তখন, কতো র্থ সংগৃহীত হয়েছে বা তাঁদের দলে কতোজন লোক আছে,— সব প্রশ্ন আপ্তেকে তিনি করেন নি। রাজনীতির ব্যাপারে সাক্ষীর কানো আগ্রহ নেই, অতএব হায়দ্রাবাদের ব্যাপারেও কোনো ঔৎসুক্য ই তাঁর। রাজাকরকৃত ক্ষতিপূরণের জন্যে আপ্তেকে তিনি এক হাজার াকা দান করেছিলেন।

প্রশ্ন: গান্ধী-জাতীয়-স্মৃতি-ভাণ্ডারে কি আপনি কিছু দান করেছেন?

উত্তর। এ আমার ব্যক্তিগত…

বিচারপতি: আদালতে "ব্যক্তিগত" বলে কিছু নেই। আপনাকে ত্তর দিতে হবে।

সাক্ষী: এ পর্য্যন্ত গান্ধী-জাতীয়-স্মৃতি-ভাণ্ডারে আমি কিছু দিই নি, ব দেবার ইচ্ছে আছে।

পরবর্ত্তী সাক্ষী হলেন কিরকির মোটর ট্র্যানস্পোর্ট স্পেয়ার্স উপ-ভাগের বেসামরিক সহকারী সিকিউরিটি অফিসার মিঃ লেস্লি সিভ্যাল পাউণ্ড। তিনি বলেন যে, গোপাল গড্সের সঙ্গে পরিচয় লা তাঁর। ১৯৪০ সালের ২৮শে অক্টোবর অস্থায়ী স্টোরম্যান

হিসাবে গোপাল গড্‌সে আই. এ. ও. সি-তে (IAOC) যোগ দেন। ১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে তাঁকে ফিরোজপুরে বদলি করা হয়। ১৯৪৪ সালের ১০ই মে কিরকিতে এম. টি. এস. (MTS) পদে বহাল করা হয় তাঁকে।

গত ১৫ই জানুয়ারি থেকে ২১শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত সাত দিনের ছুটির জন্তে গোপাল গড্‌সে একটি দরখাস্ত করেছিলেন। তাঁর ছুটি মঞ্জুর করা হয় নি। আর-একটি দরখাস্তে গোপাল ১৭ই থেকে ২৩শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত ছুটি চেয়েছিলেন। অর্ডন্যান্স অফিসার ক্যাপ্টেন এন. এস্. সাধু দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। জানুয়ারির ২৪শে তারিখ ছিলো ছুটির দিন, ২৫শে ছিলো রবিবার। গোপাল গড্‌সে ২৯শে তারিখে পুনরায় কাজে যোগদান করেন। ২রা ও ৪ঠা ফেব্রুয়ারি পুলিশ-পাহারায় তিনি আপিসে এসেছিলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি থেকে তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

বিড়লাভবনের মালী রঘুনাথ নায়েক তার সাক্ষ্যে বলে যে, গান্ধীজীর হত্যার দিনে সে প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলো। আভা বহিন, মানু বহিন, নন্দলাল মেহ্‌তা ও আরো কয়েকজনের সঙ্গে গান্ধীজী যখন সিঁড়ির উপর উঠে বেদীর দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন, একজন লোক এসে তখন তাঁর পথরোধ করে। একটা পিস্তলের আওয়াজ শুনেই সে আততায়ীর দিকে ছুটে যায়। এর মধ্যে আরো তিনবার সে পিস্তল ছোড়ার শব্দ শুনতে পায়। রঘুনাথের হাতে ছিলো ঘাস-কাটা খুরপো, তাই দিয়ে সে আঘাত করে আততায়ীর মাথায়। তখন পুলিশ ও সৈন্য-বিভাগীয় লোক এসে আততায়ীর হাত থেকে পিস্তল কেড়ে নেয়।

সাক্ষী, নাথুরাম গড্‌সেকে সেই আততায়ী বলে সনাক্ত করে।

অতঃপর সাক্ষ্য দেন বোম্বাইয়ের পুষ্টমার্গ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের নেতা, গোস্বামী কৃষ্ণজী মহারাজের ভ্রাতা, গোস্বামী দীক্ষিত মহারাজ। ২০শে

আগস্ট তারিখে তাঁর সাক্ষ্য আরম্ভ হয়। তিনি সাক্ষ্য দেন গুজরাটি ভাষায়

গত ছ'সাত বছর ধরে বাদগের সঙ্গে তাঁর পরিচয়। তিনি তাঁর পুণার 'শস্ত্র ভাণ্ডার' থেকে বহু ছোড়া কিনে বোম্বাই প্রদেশের মুস্লিম রাজ্য সংশ্লিষ্ট এলাকার অধিবাসীদের মধ্যে তা বিতরণ করেছিলেন। বাদগে, নাথুরাম গড্‌সে, আপ্তে ও মদনলালকে সনাক্ত করে সাক্ষী বলেন যে, গত ১৫ই জানুয়ারি তারিখে ঐ ক'জনই তাঁর বাড়ীতে এসে তাঁকে হাতবোমার কার্য্যকারিতা প্রদর্শন করেন। তাঁর কাছে তাঁদের আসার উদ্দেশ্য তাঁরা ব্যক্ত করেন নি, শুধু বলেছিলেন যে, তাঁরা একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে যাচ্ছেন। তাঁরা আরো বলেছিলেন যে, ত্রিশ-চল্লিশ হাজার টাকা মূল্যের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ তাঁরা সংগ্রহ করেছেন। উদ্দেশ্য,—কাশ্মীর-হানাদারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। যশল্মীর রাজ্য আক্রমণ সম্পর্কে যে-সভা হয়েছিলো সাক্ষী তাতে যোগ দিয়েছিলেন। সেই সভায় নাথুরামকে বলেছিলেন তিনি যে, তাঁদের জন্যে রিভলবার সংগ্রহের ব্যবস্থা তিনি করে উঠ্‌তে পারেন নি।

মহাত্মা গান্ধীর হত্যার সাত-আট দিন পরে গড্‌সের নাম জানতে পারেন তিনি। কে এই গড্‌সে, দাদা মহারাজকে একথা জিজ্ঞাসা করলে দাদা উত্তর দেন, যে-লোকটি দীক্ষিত মহারাজের কাছে রিভলবার চেয়েছিলেন তিনিই নাথুরাম গড্‌সে।

ছোরা ব্যতীত বাদগের কাছ থেকে পাঁচ-সাত হাজার টাকার অস্ত্রশস্ত্র এবং গোলাবারুদও কিনেছিলেন তিনি।

শ্রীযুত ভোপৎকারের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, বাদগের কাছ থেকে যে-সব অস্ত্রশস্ত্র তিনি কিনতেন, বিনা মূল্যেই সেগুলো বিতরণ করতেন তিনি। ১২৮০৲ টাকায় যে-অস্ত্রশস্ত্র কেনা হয়েছিলো, দাদা মহারাজ সেগুলো কি কাজে লাগিয়েছেন, সাক্ষী তা দাদা

মহারাজকে জিজ্ঞাসা করেন নি। তার কারণ, রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁরা উভয়ে ছিলেন ভিন্ন মতাবলম্বী। সাক্ষী নিজে সমাজতন্ত্রবাদের পক্ষপাতী। শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণকে তিনি চেনেন, তাঁর সঙ্গে চার-পাঁচবার সাক্ষাৎও হয়েছে তাঁর এবং হায়দ্রাবাদ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। সমাজতন্ত্রবাদী নেতা শ্রীযুত পুরুষোত্তম দাস ত্রিকম দাসকেও জানেন তিনি। সমাজতন্ত্রবাদী দলকে তিনি অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহও করেছিলেন। কস্মিনকালেও তিনি কংগ্রেসের সদস্য ছিলেন না। তবে ১৯৪৪ সাল থেকে কংগ্রেসের কোনো-কোনো নীতির সমর্থক ছিলেন তিনি।

প্রশ্ন: ১৯৪২ এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে আপনি যোগ দিয়েছিলেন কি?

উত্তর: আমি আন্দোলনে যোগদান করি নি বটে, কিন্তু গুপ্ত কার্য্যে সহায়তা করেছিলাম। জনৈক ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আমি বলেছিলাম যে, ঐ আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলাম আমি। "সক্রিয় অংশ" বলতে এই কথাই বোঝাতে চেয়েছি যে, আমার কাছে সাহায্যের জন্যে যাঁরা আসতেন, সর্ব্বপ্রকার সম্ভাব্য উপায়ে সাহায্য করেছিলাম তাঁদের।

সাক্ষী বলেন যে, তাঁর ভৃত্য নারায়ণের সম্মুখে কোনোদিন অস্ত্রশস্ত্র কেনাও হয় নি, বিতরণ করাও হয় নি। তবে বহু লোক অস্ত্রাদির জন্যে সাক্ষীর কাছে আসতেন বলে নারায়ণ হয়তো জানতেও পেরে থাকবে সেই কথা। ১৪ই জানুয়ারির আগে বাদগে কখনো নারায়ণের কাছে অস্ত্রশস্ত্র কি গোলাবারুদ রাখেন নি। নারায়ণ যে বাদগের কাছ থেকে অস্ত্রাদি রাখতে অস্বীকৃত হয়েছিলো, ১৫ই জানুয়ারি নারায়ণ এ-কথা সাক্ষীকে বলেছিলো কি না,—সাক্ষী বলতে পারেন না। ১৫ই জানুয়ারি সকালে বাদগে, গড়্সে, আপ্তে, করকারে ও

মদনলাল তাঁর বাড়ীতে এসেছিলেন। আপ্তে তাঁর কাছে একটি পিস্তল কি রিভলবার চেয়েছিলেন।

অসুস্থ ছিলেন বলে বোমাবিস্ফোরণের কথা তিনি কাগজে পড়তে পারেন নি। তবে অন্যান্য লোকদের তা নিয়ে আলোচনা করতে শুনেছিলেন। ধৃত ব্যক্তির নামও জেনেছিলেন তিনি, কিন্তু সে-যে কে, তা বুঝে উঠতে পারেন নি।

শ্রীযুত ডাঙ্গের জেরার উত্তরে মহারাজ বলেন যে, ১৯৪৬-৪৭ সালে বোম্বাইয়ের হিন্দুদের তিনি ছোরা সরবরাহ করেন নি। ব্যক্তিবিশেষের প্রতি আক্রমণের যে-প্রয়াস তখন বোম্বাইয়ে চলছিলো তা মোটেই সমর্থন করতেন না তিনি। মুসলমানরা যদি দল বেঁধে হিন্দুদের উপর আক্রমণ চালাতো, অবশ্যই তিনি হিন্দুদের সাহায্য করতেন। দাঙ্গা-দুর্গত হিন্দুদের তিনি আশ্রয় দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। নোয়াখালির দুর্গত হিন্দুদের ত্রাণকার্য্যে তিনি অংশগ্রহণ করেন নি।

প্রশ্ন: বাদগের কাছ থেকে পাঁচ-সাত হাজার টাকার অস্ত্রশস্ত্র কিনবার মতো অর্থ আপনি কোথায় পেয়েছিলেন ?

উত্তর: ব্যক্তিগতভাবে আমি মাসে দু'হাজার থেকে চার হাজার টাকার মতো দক্ষিণা পেয়ে থাকি।

প্রশ্ন: বোম্বাই মঠের অধ্যক্ষ আপনি নন; তবু আপনাকে কেন দক্ষিণা দেওয়া হতো ?

উত্তর: শ্রদ্ধা ও ভক্তিবশতই লোকেরা আমাকে দক্ষিণা দান করতো।

এই সময়ে নাথুরাম গড্‌সে নিজে সাক্ষীকে জেরা করতে সুরু করেন।

নাথুরাম: সমাজতন্ত্রবাদীদের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে। এ-কথা কি সত্য যে, হিন্দুরা শক্তিশালী হয়ে উঠুক, এ তাঁরা চান না ?

সাক্ষী : হ্যাঁ। কিন্তু হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে তাঁরা যা করেছেন তাতে হিন্দু-রক্ষণই হয়েছে।

প্রশ্ন : ভারত বিভাগের প্রস্তাব আপনি অনুমোদন করেছেন, এ-কথা ধরে নিতে পারি কি ?

উত্তর : না। ভারত বিভাগ অনুমোদন করি নি আমি।

নাথুরাম গড্‌সের আরো জেরার উত্তরে দীক্ষিত মহারাজ বলেন যে, পাকিস্তান-আক্রমণ থেকে যশল্মীর রাজ্য রক্ষার উদ্দেশ্যে যে-জনসভা অনুষ্ঠিত হয়েছিলো সেখানে সভাপতিত্ব করেছিলেন তাঁর ভাই দাদা মহারাজ। ঐ সভায় কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকারের তীব্র বিরুদ্ধ-সমালোচনা করে বলা হয়েছিলো যে, তাঁরা পাকিস্তানের সমর্থক।

সাঁইত্রিশ

হিন্দু-আশ্রয়প্রার্থীর আর্তনাদে বধির মহাত্মা

২৩শে আগস্ট তারিখে শুনানির আগে মদনলাল একটি লিখিত আবেদন পেশ করেন আদালতে। তাতে তিনি জানিয়েছেন :

"গত ২১শে আগস্ট তারিখে দীক্ষিত মহারাজের জেরার সময়, আসামীদের-সঙ্গে-হিন্দু-মহাসভার-সম্পর্ক নিয়ে কিছু আলোচনা হয়। আমি স্পষ্ট জানিয়ে দিতে চাই যে, আমি হিন্দু মহাসভার সদস্য নই, কোনোকালে সদস্য ছিলাম না।

"১৯৪৫ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে বেতার 'টেলিগ্রাফিস্ট' হিসাবে নৌ-বিভাগে যোগ দিই। ১৯৪৬ সালে সেই কাজ থেকে ছুটি পাই। পাঞ্জাবে ফিরে এসে দেখি, সেখানে তখন খিজির হায়াৎ খাঁর

মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে মুসলিম্ লীগের তীব্র আন্দোলন চলছে। সেই প্রথম ব্যাপক ধ্বংসলীলার অগ্নিতাণ্ডবের আরম্ভ। সেই সময় থেকে আমার বোম্বাই যাওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমার ভাগ্যে কি ঘটলো, তার সম্পূর্ণ কহিনী আমি পরে বলবো।

"আজ আমি বিশেষ করে এই কথাই বলতে চাই যে, রাজনীতির সংস্পর্শে আসবার সময় আমার ছিলো না। পাকিস্তান-এলাকা থেকে বিতাড়িত হয়ে পাঞ্জাব ও বোম্বাইয়ে আমি কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবকহিসাবে কাজ করেছিলাম।

"আশ্রয়প্রার্থীর দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি সব কিছু করতাম, কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য হিসাবে নয়। পাকিস্তানের ভয়াবহ দৃশ্য আমি নিজের চোখে দেখেছি। পাঞ্জাবে ও দিল্লীতে হিন্দুদের গুলী করে মারা হয়েছে, তা-ও প্রত্যক্ষ করেছি। পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিতে মহাত্মা গান্ধী ভারত-সরকারকে বাধ্য করেছিলেন,—এই ব্যাপারে আমি অত্যন্ত মর্ম্মাহত হয়েছিলাম। আমার মনে হয়েছিলো, দিল্লীর মুসলমানদের ক্ষীণতম কণ্ঠস্বরও তাঁর কানে পৌছচ্ছে, কিন্তু হিন্দু আশ্রয়-প্রার্থীদের গগনভেদী ক্রন্দনরোলে তিনি বধির হয়ে আছেন। তাঁর কর্ণকুহরের পথরোধ করে আছে মৌলানা, মৌলভি, হাজি ও হাফিজের দল। আশ্রয়প্রার্থীদের আর্ত্তনাদ যাতে জাতির জনকের, ভারত-সরকারের সর্ব্বাধিনায়কের কানে পৌছতে পারে, সে-জন্যেই ২০শে জানুয়ারির ঐ কাজ আমি করেছিলাম; আদালতের বিচার আরম্ভ হবার পূর্ব্বে আমি যা বলেছিলাম, এযাবৎ সরকারপক্ষীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ সেই কথারই সমর্থন করে।"

বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত দেশাইয়ের সাক্ষ্যগ্রহণের পূর্ব্বে শ্রীযুত ভোপৎকার এক আবেদনপত্র দাখিল করে বলেন যে, যেহেতু শ্রীযুত

দেশাইয়ের সাক্ষ্য জনশ্রুতিমূলক সেই হেতু তাঁর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা আইনসঙ্গত হবে না।

শ্রীযুত দেশাই তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে, তিনি স্বরাষ্ট্র ও রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। পুলিশ ও অপরাধী-দমন-বিভাগ স্বরাষ্ট্র-বিভাগের অন্তর্গত। গত ২১শে জানুয়ারি তারিখে অধ্যাপক জে. সি. জৈন যখন বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী বি. জি. খেরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তখনই প্রথম অধ্যাপকের সঙ্গে সাক্ষীর সাক্ষাৎ হয়। প্রধানমন্ত্রী, সাক্ষীকে তাঁর কক্ষে ডেকে পাঠান। সাক্ষী সেখানে গেলে অধ্যাপক জৈনের সঙ্গে তাঁকে পরিচিত করিয়ে দেওয়া হয়। অধ্যাপক জৈন তখন সাক্ষীকে বলেন যে, ২১শে জানুয়ারির কাগজে দিল্লীর বোমাবিস্ফোরণের কথা তিনি পড়েছেন; ধৃত ব্যক্তির নামও পাঠ করেছেন; সেই ধৃত ব্যক্তির সম্বন্ধে ব্যক্তিগতভাবে তিনি কিছু বলতে চান। অধ্যাপক বলেন যে, মদনলালকে তিনি জানতেন। আমেদনগর থেকে ফিরে মদনলাল অধ্যাপককে বলেছিলেন যে, আরো-কয়েকজন লোকের সঙ্গে মদনলাল একজন শ্রেষ্ঠ নেতার জীবননাশের সঙ্কল্প করেছে। অধ্যাপক জৈন উক্ত নেতার নাম বলতে মদনলালকে পীড়াপীড়ি করলে মদনলাল, মহাত্মা গান্ধীর নাম বলেছিলেন। অধ্যাপক তখন মদনলালকে এরূপ পাগলামি থেকে এবং উন্মাদের পরিকল্পনা থেকে বিরত করবার চেষ্টা করেন।

শ্রীযুত দেশাই বলেন যে, অধ্যাপক জৈনের কথায় বুঝা যায়, মদনলাল তাঁর আমেদনগরের কার্য্যকলাপের কথা অধ্যাপককে বলেছিলেন। আমেদনগরে তাঁদের একটি অস্ত্রশস্ত্রের গুদাম আছে এবং কিছু গোলা-বারুদ ও বিস্ফোরক দ্রব্যও আছে, অধ্যাপক জৈনকে মদনলাল এ-কথাও বলেছিলেন। পুণাতেও না কি কিছু অস্ত্রশস্ত্র তাঁদের ছিলো। অধ্যাপক

জৈনকে মদনলাল এ-ও বলেছিলেন যে, তাঁদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে তিনি ও তাঁর সঙ্গীরা দিল্লী যাবেন।

শ্রীযুত মোরারজী দেশাই বলেন, "এই ব্যাপার জানবার পরক্ষণেই কেন আপনি আমাকে সে-কথা জানান নি, অধ্যাপককে আমি এ-প্রশ্ন করেছিলাম। অধ্যাপক উত্তর দিয়েছিলেন, আশ্রয়প্রার্থীরা ঐ রকম বেপরোয়া ধরণের কথা বলতেই অভ্যস্ত ছিলো বলে, এবং মদনলালকে তাঁর সঙ্কল্পিত কাজ থেকে বিরত করবার চেষ্টা করেছিলেন বলেই আগে থেকে এ-কথা তিনি জানাতে আসেন নি। দিল্লীর বোমাবিস্ফোরণের সংবাদ পড়েই তাঁর ভুল ভেঙেছিলো এবং তারপর প্রথমেই তিনি আমার কাছে এসেছিলেন।

"এই সংবাদ শুনবার পর গোয়েন্দা বিভাগের অফিসার-ইন্-চার্জ শ্রীযুত নাগরওয়ালাকে অবিলম্বে করকারেকে গ্রেফ্তার করতে, সাভারকরের বাসভবন ও তাঁর গতিবিধির উপর কড়া নজর রাখতে এবং উক্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের খুঁজে বের করতে সুস্পষ্ট নির্দেশ দান করি।

"২২শে জানুয়ারি আমেদাবাদে পৌছে সর্দার প্যাটেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। অধ্যাপক জৈন আমাকে যা বলেছিলেন এবং সে-সম্পর্কে আমি যে-ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলাম—সমস্তই তাঁকে এবং তাঁর সেক্রেটারিকে খুলে বলি।

"অধ্যাপক জৈন আমাকে তাঁর নাম প্রকাশ করতে বারণ করেছিলেন। তাঁর আশঙ্কা ছিলো যে, তা হলে জীবন বিপন্ন হতে পারে তাঁর। প্রয়োজন হলে তদন্তকার্য্যে সম্পূর্ণ সাহায্য করতেও প্রস্তুত আছেন বলে তিনি জানিয়েছিলেন।

"মহাত্মা গান্ধীর হত্যার চার-পাঁচ দিন পরে অধ্যাপক জৈন এসে আমাকে বলেন যে, তিনি আর এখন তাঁর জীবন বিপন্ন হবার কথা

ভাবেন না, প্রকাশ্যভাবেই এখন তিনি পুলিশকে সাহায্য করতে প্রস্তুত।"

অতঃপর আসামীপক্ষের কৌঁসুলিগণ সাক্ষীকে জেরা করতে আরম্ভ করেন।

শ্রীযুত ভোপৎকারের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, ২১শে জানুয়ারি থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারির মধ্যে তিনবার তাঁর সঙ্গে অধ্যাপক জৈনের সাক্ষাৎ হয়। প্রথম সাক্ষাৎ হয় সেক্রেটারিয়েটে এবং শেষ দু'বার তাঁর বাসগৃহে।

প্রশ্ন: অধ্যাপক জৈন যখন বলেছিলেন যে, তিনি প্রকাশ্যভাবেই পুলিশকে সাহায্য করতে প্রস্তুত,—তারপর কি আপনি তাঁর সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন?

উত্তর: সেইজন্যেই তো শ্রীযুত নাগরওয়ালার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন: আপনি অধ্যাপক জৈনের পূর্ব্ব-পরিচয় জেনেছিলেন কি?

উত্তর: না।

প্রশ্ন: অধ্যাপক জৈন যে-কাহিনী বলেছিলেন তা সত্য কি না, জানবার জন্যে শ্রীযুত নাগরওয়ালাকে বলেছিলেন কি?

উত্তর: নিশ্চয়ই বলেছিলাম।

প্রশ্ন: পুলিশের নিকট কোনো বিবৃতি দিয়েছিলেন?

উত্তর: হ্যাঁ, দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন: আপনি জবানবন্দীতে বলেছেন যে, ২২শে জানুয়ারির পর আপনি তদন্তের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রেখেছিলেন। "তদন্তের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত রাখা" অর্থে আপনি কি বোঝাতে চেয়েছেন?

উত্তর: আমি বলতে চেয়েছি যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার কাজে কতো দূর অগ্রসর হয়েছেন, মাঝে মাঝে শ্রীযুত নাগরওয়ালাকে তা-ই জিজ্ঞাসা করতাম।

প্রশ্ন : শ্রীযুত নাগরওয়ালাকে আপনি তিনটি নির্দেশ দিয়েছিলেন। অধ্যাপক জৈনের কথিত কাহিনী সত্য কি না, তা জানবার জন্যে শ্রীযুত সাভারকরকে জিজ্ঞাসা করতে, শ্রীযুত নাগরওয়ালাকে আপনি কোনো নির্দেশ দিয়েছিলেন ?

উত্তর : তদন্তের বিস্তৃত বিবরণ সম্বন্ধে কোনো নির্দেশ আমি দিই নি।

প্রশ্ন : অধ্যাপক জৈনের বিবৃতি ছাড়া আপনি এমন কোনো সংবাদ পেয়েছিলেন কি যাতে আপনি শ্রীযুত সাভারকরের বাসভবন ও তাঁর গতিবিধির ওপর কড়া নজর রাখতে বলেছিলেন ?

উত্তর : আমাকে কারণ বলতে হবে ? এর উত্তর আমি দেবো কি না, শ্রীযুত সাভারকরই বলুন। আমি কারণ জানাতে প্রস্তুত আছি।

আদালত : সাক্ষী এর উত্তর দিলে আমাকে তা সম্পূর্ণ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

শ্রীযুত ভোপৎকার : আমি আমার প্রশ্ন প্রত্যাহার করছি।

সাক্ষী বলেন যে, দাদা মহারাজ ও দীক্ষিত মহারাজকে তিনি জানেন।

প্রশ্ন : দাদা মহারাজ সমাজতন্ত্রবাদী দলের সদস্যদের অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করতেন, একথা আপনি জানেন কি ?

উত্তর : আমি তা জানতাম না। তবে দাদা মহারাজের সাক্ষ্যের বিবরণ সংবাদপত্রে পাঠ করবার সময় তা জানতে পেরেছি।

শ্রীযুত মঙ্গলের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, বহুদিন ধরে তিনি কংগ্রেসের সদস্য ; এবং কংগ্রেসের বহু নেতার সঙ্গেই তাঁর পরিচয় আছে।

প্রশ্ন : ভারত বিভাগের পর রাজস্ব বণ্টনের প্রশ্ন উঠে। তাতে ভারতের নিকট পাকিস্তান পঞ্চান্ন কোটি টাকা পাবে বলে স্থির হয়।—এ সব কথা আপনি জানেন কি ?

উত্তর : হ্যাঁ, সংবাদপত্রে আমি তা পড়েছি।

প্রশ্ন : কাশ্মীর আক্রান্ত হওয়ায় এই পঞ্চান্ন কোটি টাকা পাকিস্তানকে দেওয়া হবে না বলে ভারত সরকার যে-বিবৃতি দিয়েছিলেন, ১৩ই জানুয়ারির আগে সে-কথা আপনি সংবাদপত্রে পড়েছিলেন কি ?

উত্তর : পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দেওয়া হবে না বলে ভারত সরকার সিদ্ধান্ত করেছেন, এই সংবাদ আমি খবরের কাগজে পড়েছিলাম বটে, কিন্তু তার তারিখ মনে নেই।

শ্রীযুত ওকের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, "সি. আর. ফর্মুলা" কি, তা তিনি জানেন। ঐ নিয়ে মতভেদ হতেই শ্রীযুত রাজাগোপালাচারী কংগ্রেস ত্যাগ করেছিলেন।

পরের দিনও জেরাপ্রসঙ্গে শ্রীযুত ওক,—নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ভারত বিভাগ স্বীকার করে ৩রা জুনের পরিকল্পনা গ্রহণের জন্যে প্রস্তাব গ্রহণ এবং ভারত যুক্তরাষ্ট্র থেকে কতকগুলি প্রদেশ ও রাজ্যের বিচ্ছেদ সম্পর্কে সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন। শ্রীযুত দফ্‌তরি প্রশ্নের মাঝে মাঝে কয়েকবার প্রশ্নের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আপত্তি উত্থাপন করেন। উত্তরে শ্রীযুত ওক বলেন যে, ঐসব জেরাকে ভিত্তি করেই যুক্তিতর্ক-উত্থাপন করবেন তিনি।

শ্রীযুত ওক : সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ সাধারণত আপনার বিভাগই করে থাকে ?

সাক্ষী : হ্যাঁ।

প্রশ্ন: ১৯৪৬ সালে ধূলিয়ায় সাংবাদিকদের যে-বার্ষিক সম্মেলন হয়েছিলো সেখানে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের জন্যে সাংবাদিকদের চরম অসন্তোষের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিলো, আপনি জানেন?

এই সময়ে নাথুরাম গড্‌সে উঠে বলেন, "সংবাদপত্রের কেবলই কণ্ঠরোধ চলছিলো। এই সংবাদপত্র-দলনের সঙ্গে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। ঐ দমন-নীতি দেখেই আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম। এই সম্পর্কে বার কয়েক আমি বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র-সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। পাঞ্জাব ও নোয়াখালির বীভৎস অত্যাচারের কাহিনী প্রকাশের জন্যে আমার কাছ থেকে হাজার টাকা আদায় করা হয়।"

শ্রীযুত ওক কেন এসব বিষয় লিপিবদ্ধ করাতে চান, বিচারপতি প্রশ্ন করলে, শ্রীযুত ওক উত্তর দেন, "৩০শে জানুয়ারি ও তার আগে যেসব ঘটনা ঘটেছিলো, এই সকল অবস্থাই তার কারণ স্বরূপ।"

তারপর শ্রীযুত ওক সাক্ষীকে "অগ্রণী" ও "হিন্দু রাষ্ট্র" পত্রিকা সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন। প্রেস এমার্জেন্সি অ্যাক্ট ও প্রেস অ্যাডভাইসরি কমিটির কথা এই প্রসঙ্গে উত্থাপিত হয়।

আটত্রিশ

'রাম-রহিম' নয়, 'রাজা রাম'

অতঃপর বসন্ত গজানন যোশী নামক একজন কলেজের ছাত্রের সাক্ষ্য গৃহীত হয়।

২৬শে আগস্ট তারিখে প্রথমে সাক্ষ্য দেয় বোম্বাইয়ের একজন ট্যাক্সিচালক, নাম আতপ্পা কৃষ্ণ কোটিয়ান। নাথুরাম গড্‌সে, আপ্তে, শঙ্কর ও বাদগেকে সনাক্ত করে সে বলে যে, গত ১৭ই জানুয়ারি ঐ ক'জন লোক তাঁর ট্যাক্সিতে উঠে নানা জায়গায় গিয়েছিলেন।

বোরি বন্দরে (ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস) তাঁরা প্রথমে ট্যাক্সিতে চাপেন। পরে সারাদিন ধরে তাঁরা বোম্বে ইউনিয়ন ডাইং মিলস্, মারুতি মন্দির, শিবাজী পার্ক, দাদারের হিন্দু কলোনি, ম্যারিন ড্রাইভে গ্রীন হোটেল ইত্যাদি জায়গায় ঘুরে বেড়ান। সকলের শেষে তাঁরা যান জুহু বিমান-ঘাঁটি ও শাস্তা ক্রুজে।

সেদিনকার দ্বিতীয় সাক্ষীর নাম শ্রীযুত গণপৎ শম্ভাজী খারত। বোম্বাই গণপরিষদের জনৈক হরিজন-সদস্য ইনি।

তিনি বলেন যে, গত দেড় বছর ধরে বাদগের সঙ্গে তাঁর জানা শোনা আছে। ৯ই ফেব্রুয়ারি পুলিশের কাছে বিবৃতি দেবার প্রায় তিন সপ্তাহ আগে বাদগে তাঁর (সাক্ষীর) বাড়ী এসে দু'টি বাণ্ডিল রেখেছিলেন। তার ভেতরে কি আছে না-আছে, সাক্ষী তা জানতেন না। পরে তিনি, নাগমোদে ও শেলারকে বাণ্ডিল দু'টি দিয়ে দেন। ঐ দু'জনকেও তিনি চিনতেন।

৮ই ফেব্রুয়ারি পুলিশ-সঙ্গে-করে বাদগে সাক্ষীর বাড়ী এসেছিলেন। সাক্ষী তখন তাঁদের নাগমোদে ও শেলারের কাছে নিয়ে যান। সেখানে সকলের সুমুখেই বাণ্ডিল দু'টি খোলা হয় এবং দেখা যায় যে, দু'টিই বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যে পরিপূর্ণ।

জেরার উত্তরে তিনি বলেন যে, বাদগে ঐ প্রথম তাঁর কাছে নিজের জিনিষ রেখে গিয়েছিলেন। বাণ্ডিলের ভেতর ছোরাছুরি আছে ভেবেই বাদগেকে আর কেনো প্রশ্ন তিনি করেন নি। অস্ত্রশস্ত্র আছে বলেও সন্দেহ হয় নি তাঁর। ওগুলি রাখলে যে তাঁর বিপদ ঘটতে পারে—এমন কথা মনেই হয় নি তাঁর। নাগমোদে ও শেলারের নিকট বাণ্ডিল দু'টি দিতে বাদগেই তাঁকে বলেছিলেন।

৩০শে আগস্ট তারিখে গান্ধী-হত্যার জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য দেন। তাঁর নাম সর্দ্দার গুরুবচন সিং। দিল্লীর একজন ব্যবসায়ী ও কেন্দ্রীয়

আশ্রয়প্রার্থী কমিটির সদস্য তিনি। অনুগামী ভক্ত হিসাবে কর্মোপলক্ষে দিল্লীতে এলেই তিনি গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, কোনো কাজের ভার তাঁকে দেওয়া হলে তা সম্পন্ন করতেন।

১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরে ও ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসে মহাত্মা যখন বাস করতেন বিড়লা ভবনে সাক্ষী তখন প্রায় প্রত্যহ সকালে-বিকেলে সেখানে যেতেন। যেদিন গান্ধীজীকে হত্যা করা হয় সেদিনও বেলা তিনটের সময় বিড়লা ভবনে গিয়েছিলেন তিনি। মহাত্মার সেক্রেটারি শ্রীব্রিজকিষণ চণ্ডীওয়ালাকে দর্শনপ্রার্থী নিয়ন্ত্রণ ব্যাপারে সাহায্য করবার জন্যেই ডাকা হয়েছিলো তাঁকে।

সর্দার প্যাটেল ও মনি বহিনই (শ্রীমতী মনিবেন প্যাটেল) সেদিন সকলের শেষে গান্ধীজীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। সাধারণত বিকেল ঠিক পাঁচটায় মহাত্মাজী প্রার্থনা সভায় যেতেন। তার একটু আগেই, প্রার্থনা সভার কথা স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে, সাক্ষী দরজার বাইরে থেকে মহাত্মাকে সঙ্কেতজ্ঞাপন করেন। খানিক পরেই সর্দার প্যাটেল ও মনি বহিন ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন। তাঁদের বিদায় দেবার জন্যে সাক্ষী বিড়লা ভবনের ফটক পর্য্যন্ত এগিয়ে যান। ফিরে এসে দেখেন, গান্ধীজী ইতিমধ্যেই প্রার্থনা সভার দিকে যাত্রা করেছেন।

দেরি হয়ে গিয়েছিলো বলে গান্ধীজী সেদিন একটু দ্রুতপদেই চলে-ছিলেন প্রার্থনা সভায়। চলেছিলেন আভা বহিন ও মানু বহিনের দু'কাঁধে ভর দিয়ে। সাক্ষী তখন কথা কইছিলেন সর্দার আত্মা সিং-এর সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে কথা শেষ করে তিনি যখন দ্রুতগতিতে মহাত্মার দিকে এগিয়ে যাবার জন্যে পা বাড়ালেন, মহাত্মা তখন সভা-মঞ্চের প্রথম সিঁড়িতে পা দিয়েছেন। সভায় তখন ছিলো এক বিরাট জনতা। তা ছাড়া জন কয়েক মহিলাও ছিলেন গান্ধীজীর নিকটে। তাঁদের ব্যূহ ভেদ করে সেদিক দিয়ে তিনি সুমুখে যাবার চেষ্টা করেন। সেই মুহূর্ত্তেই তাঁর

কানে ভেসে এলো একটা গুলীর আওয়াজ। আওয়াজটা কোনদিক থেকে এলো, তিনি বুঝতে পারেন নি। আবার একটা গুলীর আওয়াজ শুনলেন। চেয়ে দেখলেন, তাঁর সুমুখেই খাকি-পোষাক-পরা একটি লোক গান্ধীজীর দিকে পিস্তল লক্ষ্য করে গুলী ছুড়ছে। তৎক্ষণাৎ সেই লোকটির হাতে আঘাত করেন তিনি। সঙ্গে সঙ্গে তৃতীয়বার গুলীর আওয়াজ হয়। গান্ধীজীর দিকে চেয়ে দেখেন, যোড়করে "হায় রাম!" বলে বাঁ দিকে ঢলে পড়লেন তিনি। সাক্ষী সেখানে ছুটে গিয়ে গান্ধীজীকে ঘরের ভিতর নিয়ে যান। তার খানিক পরেই অন্তিম নিশ্বাস ত্যাগ করেন গান্ধীজী।

দূর থেকে নাথুরাম গড্‌সেকে সনাক্ত করে সাক্ষী বলেন যে, ঐ ব্যক্তিই গান্ধীজীকে গুলী করেছিলো।

গান্ধীজীকে যে-ঘরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো গান্ধীজীর মৃতদেহ সারারাত সে-ঘরেই ছিলো। বহু লোক মৃতদেহকে ঘিরে বসে ছিলেন। শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধীও ছিলেন সেখানে। যে-চাদর দিয়ে গান্ধীজীর দেহ ঢাকা ছিলো, রাত আটটা কি ন'টার সময় তা সরিয়ে নেওয়া হয়। একটি খালি কার্ত্তুজের খোল দেখতে পাওয়া যায় চাদরের ভাঁজের ভেতর। শ্রীযুত দেবীদাস গান্ধী উপস্থিত-সকলকেই সেটি দেখান, সাক্ষীকেও দেখিয়েছিলেন।

শ্রীযুত ওকের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন, প্রত্যহ একই ধারানুসারে প্রার্থনা সভার কাজ চলতো। তবে কখনো কখনো সভার আগে কিংবা সভা আরম্ভ হবার একটু পরে কোরাণ থেকে কিছু আবৃত্তি করা হতো। ভাগবদগীতার শ্লোকাবৃত্তি হতো পরের দিকে। কদাচিৎ 'গ্রন্থসাহেব'-এর উল্লেখ করা হতো।

গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় সাধারণত যে-ভজন সঙ্গীত গীত হতে সেটি

"রঘুপতি রাঘব রাম রহিম।
পতিত-পাবন কৃষ্ণ করিম॥"

নয়, সেটি হচ্ছে,—

"রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।
পতিত-পাবন সীতা-রাম॥
ঈশ্বর আল্লা তেরে নাম।
সবকো সন্‌মতি দে ভগবান্॥"

ভাঙ্গী কলোনির প্রার্থনা সভায় দু'তিনবার কোরাণ আবৃত্তির বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছিলো বটে, কিন্তু বিড়লা ভবনের প্রার্থনা সভায় কোরাণ আবৃত্তির বিরুদ্ধে কেউ কোনোদিন কিছু বলে নি।

শ্রীযুত ব্যানার্জির জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে "কিংসওয়ে শরণাগত শিবিরে" তিনি গিয়েছিলেন। হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী থাকতো সেখানে।

শ্রীযুত ব্যানার্জি: মহাত্মা গান্ধী কি সেখানে ভালোভাবে অভ্যর্থিত হয়েছিলেন?

সাক্ষী: প্রার্থনা সভায় কোরাণ আবৃত্তিতে আশ্রয়প্রার্থীরা আপত্তি জানাতো।

মুসলমানদের পাকিস্তান-যাত্রা বন্ধ করবার জন্যে মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষী পানিপথেও গিয়েছিলেন দু'বার।

সেদিনকার দ্বিতীয় সাক্ষী হলেন পুণার জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট-আপিসের কেরাণী শ্রীযুত প্রভাকর লক্ষ্মণ আকাল। নাথুরাম গড্‌সে কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত "অগ্রণী" কাগজের জামানৎ সম্পর্কে কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলেন তিনি।

পরবর্তী সাক্ষী হলেন জি. আই. পি. রেল্‌ওয়ের গোয়ালিয়র স্টেশনের বুকিং-ক্লার্ক, নাম—শ্রীমধুসূদন গোপাল গলভাকর।

উনচল্লিশ

বড়লাটের মন্তব্য

৩১শে আগস্ট তারিখের কথা বলছি।

ভারতের বডলাট শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীর এক মন্তব্যের বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে গান্ধী-হত্যা মামলার অন্যতম আসামী মদনলাল আদালতে একটি আবেদন দাখিল কবেন। আবেদনপত্রটি এইরূপ :

"গত ১৪ই আগস্ট তারিখে ভারতের বড়লাট, চক্রবর্ত্তী রাজা-গোপালাচারী এক বেতার-বক্তৃতাপ্রসঙ্গে মন্তব্য করেন,—'গান্ধীজীর মৃত্যুই আমাদের পক্ষে শোচনীয়তম দুর্ভাগ্য। যারা তাঁকে হত্যা করেছে দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অকল্যাণ ও ক্ষতি করেছে তারা। দেশের অন্য কোনো শত্রু এমন ক্ষতি সাধন করতে পারে নি। দেশেব পক্ষে যখন মহাত্মার প্রয়োজন ছিলো সব চেয়ে বেশি, ঠিক তখনই তাঁকে ছিনিয়ে দেওয়া হলো আমাদের কাছ থেকে।'

"পরদিন দিল্লীর যে-সমস্ত সংবাদপত্রে সম্পূর্ণ বক্তৃতাটি প্রকাশিত হয়, 'হিন্দুস্থান টাইমস্' তার অন্যতম। হিন্দুস্থান টাইম্‌সের উক্ত সংখ্যাটি এই সঙ্গে দাখিল করা হলো।

"আবেদনকারীর নিবেদন এই যে, বডলাটের ঐ মন্তব্য আবেদনকারীর সুষ্ঠু বিচারের কার্য্যের পক্ষে বিঘ্নকর। এই আদালতের বিচার শেষ হবার পূর্ব্বেই ঐরূপ মন্তব্যের দ্বারা আবেদনকারী ও অন্যান্য আসামীদের প্রতি সমগ্র মানব সমাজের বিরূপ মনোভাব উদ্রিক্ত করা হয়েছে।

"বড়লাট, রাষ্ট্রের শাসনতান্ত্রিক কর্ণধার। সুতরাং উপদেষ্টার পরামর্শ অনুসারেই তিনি কাজ করেছেন, এ-কথা ধরে নেওয়া যেতে পারে। আবেদনকারীর নিবেদন এই যে, বড়লাটের বিরুদ্ধে আদালত কোনোরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে না পারলেও তাঁর শাসনতান্ত্রিক উপদেষ্টাগণ

আদালতের নিকট জবাবদিহি দেবার যোগ্য। যে-সব সংবাদপত্র ও 'নিউজ এজেন্সি' ঐ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন, তাঁরাও আদালতের বিচারের আওতায়।

"অতএব, আবেদনকারী, যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্যে বিনীত প্রার্থনা করছেন।"

আজকের প্রথম সাক্ষী হলেন পুণার উদ্দয়ম ইঞ্জিনীয়ারিং ওয়ার্কস্ লিমিটেডের ম্যানেজার শ্রীপাণ্ডুরং বিনায়ক গদবোলে। গোপাল গড্‌সেকে সনাক্ত করে তিনি বলেন যে, গান্ধীজীর হত্যার আট-দশ দিন আগে গোপাল গড্‌সে তাঁর কাছে একটি রিভলভার ও কিছু কার্তুজ রেখেছিলেন। গান্ধীজীর হত্যার পর সাক্ষী অত্যন্ত ভীত হয়ে ঐগুলি সরিয়ে ফেলবার জন্যে গোবিন্দ বিষ্ণু কালে নামক তাঁর এক বন্ধুর হাতে দিয়ে দেন।

গোপাল গড্‌সে যখন সাক্ষীকে রিভলভার ও কার্তুজগুলি দিতে এসেছিলেন তখন সেগুলি তোয়ালে দিয়ে জড়ানো ছিলো, আর রাখা হয়েছিলো একটি কাপড়ের ব্যাগের ভেতরে। গোপাল তাঁকে জিনিষগুলো খুলে দেখিয়েছিলেন এবং দিন কয়েকের জন্যে সেগুলি সাক্ষীর কাছে রাখতে বলেছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী নিহত হয়েছেন, এ খবর তিনি জানতে পারেন ৩০শে জানুয়ারি তারিখেই। রিভলভার ও কার্তুজ রাখার জন্যে বিপদে পড়তে পারেন ভেবে তিনি অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়েন। ইতিমধ্যে পূর্ব্বোক্ত গোবিন্দ বিষ্ণু কালে তাঁর কাছে এলে তাঁকে ব্যাপারটা সব খুলে বলেন। অতঃপর স্থির হয় যে, জিনিষগুলি ফেলে দেওয়া হবে। সাক্ষী বলেন যে, তাঁর নিজের সে-সাহস নেই। কালে তখন সে-কাজ করতে রাজি হন। জিনিষগুলো ব্যাগসমেত তাঁর হাতে দেওয়া হয়।

কালে ব্যাগটি নিয়ে গিয়েছিলেন ফেব্রুয়ারি মাসের আট তারিখে।

তার কিছুদিন পরে কাজ থেকে ফেরবার সময় সাক্ষী দেখতে পান, একটি গাড়ি এসে বাড়ীর কাছে দাঁড়িয়েছে, তাতে বসে আছেন গোপাল গড্‌সে এবং আরো কয়েকজন লোক। গোপালকে সাক্ষী বলেন যে, ফেলে দেবার জন্যে রিভলবারটি একজন লোককে দেওয়া হয়েছে। সাক্ষী কালের বাড়ী দেখিয়ে দেন।

গোপাল এবং তাঁর আরো দু'জন সঙ্গীর সুমুখেই কালেকে সাক্ষী জিজ্ঞাসা করেন, রিভলবারটি তাঁর কাছে তখনো রয়েছে কি না। কালে উত্তর করেন, ফার্গুসন কলেজ রোডের কোনো জায়গায় সেটিকে ফেলে দিয়েছেন তিনি। অতঃপর সকলেই গাড়িতে করে কালের নির্দ্দেশ অনুসারে ফার্গুসন কলেজ রোডে যান, কিন্তু রিভলভারের কোনো সন্ধান পাওয়া যায নি সেখানে।

গোপাল গড্‌সের সঙ্গে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা ছিলেন পুলিশ-কর্ম্মচারী। গোপালের হাতে ছিলো হাতকড়া।

শ্রীযুত ইনামদাব: গোপাল গড্‌সে যখন আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন তখন সমস্ত ব্যাপারটাই তাঁর কাছে আপনি অস্বীকার করেছিলেন?

সাক্ষী: গোপাল গড্‌সে আমাকে এসে যখন প্রশ্ন করেছিলেন তখন সব কিছুই আমি অস্বীকার করেছিলাম।

প্রশ্ন: আপনি-যে রিভলবার রেখেছিলেন, তাও অস্বীকার করেছিলেন?

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন: রিভলবারটি লাইসেন্স-করা-ছিলো কি না, গোপাল গড্‌সে জিজ্ঞাসা করেছিলেন কি?

উত্তর: না।

প্রশ্ন : লাইসেন্স ছাড়া রিভলবার যে আপনি রাখতে পারেন না, একথা জানেন ?

উত্তর : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : রিভলবার রাখার লাইসেন্স আপনার আছে ?

উত্তর : না।

প্রশ্ন : গান্ধীজীর হত্যাকারীর নাম শুনে আপনি ভীত হয়েছিলেন কেন ?

উত্তর : ভেবেছিলাম, গড্‌সের নাম এই ব্যাপারে যুক্ত হওয়াতে পুলিশের নজর আমার উপরেও পড়তে পারে।

সাক্ষী বলেন যে, গোপাল গড্‌সের কাছে প্রথমে তিনি সমস্ত ব্যাপার অস্বীকার করেছিলেন এই জন্যে যে, তাঁর সঙ্গীরা-যে পুলিশ-কর্ম্মচারী, সেকথা তখন তিনি জানতেন না। পরে যখন জানতে পারলেন তখন, পুলিশকে সব কিছু বলা কর্ত্তব্য ভেবেই, সব কথা বলেছিলেন তিনি।

প্রশ্ন : তাঁদের পরিধানে কি পুলিশের ইউনিফর্‌ম্‌ ছিলো, না, তাঁরা শাদা পোষাকেই ছিলেন ?

উত্তর : তাঁরা শাদা পোষাকেই ছিলেন।

গোপাল গড্‌সেই তাঁকে বলেছিলেন যে, তাঁর সঙ্গীরা পুলিশ-কর্ম্মচারী।

এর পর সাক্ষ্য দেন কুরলার কালের ইঙ্ক-ম্যানুফ্যাকচারিং-কোম্পানির স্বত্বাধিকারী ও অংশীদার শ্রীমহাদেব গণেশ কালে। তিনি বলেন যে, ছাপাখানার কিছু উপকরণ কিনবার জন্যে একদা নাথুরাম গড্‌সেকে তিনি এক হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন। সেই সম্পর্কে আপ্তে এবং বাদগের সঙ্গেও পরিচয় ছিলো তাঁর।

পরবর্ত্তী সাক্ষী হলেন শ্রীরামচন্দ্র মতিনিরাজ পটঙ্কর।

শ্রীপটক্করের পর সাক্ষ্য দেন শ্রীগোবিন্দ বিষ্ণু কালে। তাঁর কথা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করেছি। শ্রীপাণ্ডুরং বিনায়ক গদবোলে সাক্ষ্য-প্রসঙ্গে কালের সম্বন্ধে যা বলেছেন, কালেও জবানবন্দীতে তারই সমর্থন করেন।

১লা সেপ্টেম্বর তারিখে মাত্র তিনজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। তাঁরা হলেন—

(১) বোম্বাইয়ের গোলার হিন্দু হোটেলের মালিক শ্রীশিব নগেশ শেঠী;

(২) বোম্বাইয়ের প্যারামাউন্ট ফিল্ম্ অব ইণ্ডিয়া লিমিটেডের কর্ম্মচারী শ্রীযশোবন্ত শান্তারাম বোরকের;

(৩) বোম্বাইয়ের জে. জে. স্কুল অব আর্টসের প্রাক্তন ছাত্র শ্রীবিনয় কুমার শান্তারাম প্রধান।

২রা সেপ্টেম্বর প্রথমে সাক্ষ্য দিতে আসেন নয়া দিল্লীর প্রথম শ্রেণীর স্পেশ্যাল ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত কিষেণচাঁদ। দিল্লীর সেণ্ট্রাল জেলে গত ৭ই ফেব্রুয়ারি ও ২৮শে ফেব্রুয়ারি তারিখে দু'টি সনাক্তকরণ প্যারেড পরিচালনা করেছিলেন তিনি। প্রথম প্যারেডটি অনুষ্ঠিত হয়েছিলো নাথুরাম গড্সে সম্পর্কে। সনাক্তকরণকালে আসামীর বয়স ও আকারের ন'জন লোককে বেছে নিয়ে আসামীকে তাদের মাঝে ইচ্ছানুযায়ী দাঁড়াতে বলা হয়। তারপর একে-একে সাক্ষীদের ডাকা হয়, তাঁরা এসে আসামীকে সনাক্ত করেন। এ-সম্পর্কে যে-সব সাক্ষীদের নাম তিনি করেছেন তাঁরা হলেন, ম্যারিনা হোটেলের কেরাণী শ্রীযুত রামচন্দ্র, ঐ হোটেলেরই ম্যানেজার মিঃ পাছেকো, হোটেল-বেয়ারা কালীরাম, হোটেলের অন্যতম অভ্যর্থনা কেরাণী মিঃ মার্টিন, বিড়লা ভবনের প্রার্থনা সভার বোমাবিস্ফোরণের প্রত্যক্ষদর্শিনী সুলোচনা দেবী, ছোটু রাম ও ট্যাক্সি-চালক সুরজিৎ সিং। দ্বিতীয় প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় আপ্তে ও

করকারের সনাক্তকরণ সম্পর্কে। অন্য বারোজন লোকের সঙ্গে ঐ দু'জনকে মিশিয়ে দেওয়া হয়। মিঃ পাছেকো আসামীদের ঠিকমতো সনাক্ত করতে পারেন নি। তারপর আর-যাঁরা সনাক্ত করেছিলেন তাঁদের নাম,—শ্রীরামচন্দ্র, কালীরাম, মিঃ মার্টিন, রাম সিং (শেরিফ হিন্দু হোটেলের বেয়ারা) ছোট্টুরাম, ভূর সিং (বিড়লা ভবনের চৌকিদার) ও সুরজিৎ সিং।

শ্রীযুত ডাঙ্গের প্রশ্ন: সনাক্তকরণ প্যারেডে, বাইরের লোকের মধ্যে দাঁড় না করিয়ে বিচারাধীন বন্দীদের মাঝখানে আসামীদের দাঁড় করিয়েছিলেন কেন?

সাক্ষী: আমি কারণ বলতে পারবো না।

প্রশ্ন: আপ্তে এবং করকারে দু'জনেই মারাঠি হওয়া সত্ত্বেও কোনো মারাঠি লোককে প্যারেডে গ্রহণ করা হয় নি,—এ-কথা কি সত্য?

উত্তর: ঐ দু'জনকে বাইরে থেকে দেখে মারাঠি বলে বোঝা যায় না।

সাক্ষী আরো বলেন যে, প্যারেডে নাথুরাম গড্‌সের মাথায় কোনো ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ছিলো না, মাথায় এক টুকরা কাপড় বাঁধা ছিলো মাত্র। অবশ্য প্যারেডের আরো দু'তিন জনকে ঠিক নাথুরামের মতোই মাথায় কাপড় বাঁধতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন তিনি।

শ্রীযুত কিষেণচাঁদের পরে সাক্ষ্য দেন ভারত সরকারের 'সাহায্য ও পুনর্ব্বসতি' বিভাগের কর্ম্মচারী শ্রীযুত এস্. আর. সাইগল। 'ট্রাঙ্ক কল্' সম্পর্কে কি-কি কাজ করে থাকেন, তিনি শুধু তারই একটা ফিরিস্তি দেন।

এইখানে "গ্লোব"-এর একটি খবরের কথা উল্লেখ করে রাখি। সেই খবরে প্রকাশ যে, গান্ধী-হত্যার মামলায় আসামীপক্ষ না কি এ যাবৎ প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা খরচ করেছেন। আসামীপক্ষ সমর্থনের জন্যে যে-সব কৌঁসুলি রয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুত এইচ. আর. মেহ্‌তাকে নিযুক্ত

করেছেন সরকার এবং শ্রীযুত ইনামদারকে করেছেন ডাঃ পারচুরে। শ্রীযুত এল. বি. ভোপৎকার, শ্রীযুত কে. এল. ভোপৎকার, যুত শ্রীযমুনাদাস মেহ্‌তা ও শ্রীযুত গণপৎ রায় বিনা পারিশ্রমিকেই কাজ করছেন। বাকি পাঁচজন নামমাত্র ফী নিচ্ছেন। এঁদের মাসিক ফী হচ্ছে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা। কৌশুলিদের আহার ও বাসস্থানের জন্যে মাসিক দেড় হাজার টাকা এবং যাতায়াত খরচের জন্যে মাসিক দেড় হাজার টাকা ব্যয় করছেন আসামীপক্ষ। মহাসভা ডিফেন্স কমিটির সাহায্য-ভাণ্ডারে এ পর্য্যন্ত প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা সংগৃহীত হয়েছে।

৩রা তারিখে বি. বি. এণ্ড সি আই. রেলওয়ের কর্ম্মচারী শ্রীযুত রমণলাল দেশাইয়ের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। রেলটিকিট সম্পর্কে কতকগুলি কথা বলেন তিনি। কি করে যাত্রীদের কাছ থেকে টিকিট সংগ্রহ করা হয়, কি করে সেই টিকিটগুলি রেজিস্টারি করা হয় ইত্যাদি কথাই তাঁর জবানবন্দীর মূল বক্তব্য। ১০ই জানুয়ারি তারিখের কতকগুলি টিকিট সম্পর্কেও তাঁর বক্তব্য তিনি বলেন। আপ্তেকে গ্রেফ্‌তার করবার পর তাঁর কাছ থেকে যে টিকিট পাওয়া যায়, পূর্ব্বোক্ত টিকিটের সঙ্গে তার সম্পর্ক রয়েছে।

পরবর্ত্তী সাক্ষীর নাম শ্রীযুত রঘুরামেশ্বর নায়েক। বোম্বাইয়ের কোনো একটি হোটেলের ম্যানেজার তিনি।

চল্লিশ

নাথুরামের প্রবন্ধ

৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে যে-তিনজন রেলকর্ম্মচারীর সাক্ষ্য গৃহীত হয় তাঁদের প্রথমজন হলেন, আজমীর বি. বি. অ্যাণ্ড সি. আই. রেলের অ্যাসিস্টেণ্ট অ্যাকাউণ্টস্ অফিসার শ্রীযুত নাথুলাল আগরওয়ালা;

বিচারপতি আত্মাচরণ

বামদিক হইতে—কবকবে আপ্তে, নাথবাম গডসে

দ্বিতীয়জন—জি. আই. রেলওয়ের জনৈক টিকিট কালেক্টর মিঃ মেণ্ডেস্, এবং তৃতীয়জন—থানা রেলওয়ে স্টেশনের টিকিট কালেক্টর শ্রীযুত জয়প্রকাশ কুদেশাই।

তিনখানা রেলওয়ে টিকিট সম্পর্কে প্রথম দু'জন সাক্ষী তাঁদের বক্তব্য বলেন। এঁদের সাক্ষ্য গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রীযুত দফ্‌তরি বলেন, ০৫৮৯১, ৫৭৪০ ও ১৭৩৮ নম্বরের টিকিটগুলি পাওয়া গেছে আসামী আপ্তে ও করকারের কাছ থেকে। এ থেকে আসামীপক্ষ প্রমাণ করবার চেষ্টা করতে পারেন যে, গত ৩০শে, ৩১শে জানুয়ারি ও ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে উক্ত আসামী দু'জন দিল্লীতে ছিলেন না, ছিলেন বোম্বাইয়ে। কিন্তু আমরা দেখাবো যে, ঐ দু'জনেই দিল্লীতে ছিলেন।

তৃতীয় সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয় মাত্র মিনিট দশেক। তার-পরেই শ্রীযুত মঙ্গলের আপত্তি অনুসারে আদালত আর তাঁকে সাক্ষ্য দিতে দেন নি।

পরবর্ত্তী সাক্ষী হলেন 'বোম্বে কো অপারেটিভ ইনস্যুরেন্স সোসাইটি'র চীফ এজেন্ট "কুলকর্নি অ্যাণ্ড কোম্পানি"র অংশীদার শ্রীযুত দত্তরায় রামচন্দ্র কাটে। গত ২২শে ও ২৩শে মার্চ তারিখে তাঁরই উপস্থিতিতে গোয়েন্দা-কর্ম্মচারী শ্রীহলদি পুরকার—আসামী মদনলাল, করকারে, নাথুরাম, আপ্তে ও গোপাল গড্‌সের হস্তাক্ষরের নমুনা গ্রহণ করেছিলেন।

পরের দিনের প্রথম দু'জন সাক্ষীও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব্বোক্ত আসামীদের হস্তাক্ষরের নমুনা গ্রহণের সময়ে। এই দু'জনের নাম, শ্রী কে. পি. পারেনা ও শ্রী এস্. ভি. সাভে।

এর পরের সাক্ষী হলেন পশ্চিম পাঞ্জাবের আশ্রয়প্রার্থী শ্রীবিহারীলাল ভূতরাম। গত ৩০শে জানুয়ারি তারিখে নাথুরাম গড্‌সেকে তল্লাসী করবার সময়ে তিনি বিড়লা ভবনে উপস্থিত ছিলেন। নাথুরামের কাছে

১৭

থেকে যেসব জিনিষ পাওয়া গিয়েছিলো তার তালিকায় স্বাক্ষর করেছিলেন এই সাক্ষী।

পরের দিন যে-তিনজন সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা গৃহীত হয় তাঁরা হলেন,—(১) শ্রীত্র্যম্বকহরি যাজক ; (২) পুণার একটি দর্জির দোকানের মালিক শ্রীনারায়ণ গণেশ দাবকে, এবং (৩) বোম্বাই গ্যাস কোম্পানির কর্ম্মচারী শ্রী ভি. এম্. দালভি।

প্রসঙ্গত একটি কথা উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুত রাজাগোপালাচারীর একটি বেতার-বক্তৃতা সম্বন্ধে আপত্তি জানিয়ে গত ৩১শে আগস্ট তারিখে মদনলাল যে-আবেদন করেছিলেন, তাঁর পক্ষের কৌঁসুলি শ্রীযুত ব্যানার্জি সেই সম্পর্কে আজ বলেন যে, ঐ আবেদন নিয়ে আর-কোনো আলোচনা করতে চান না তিনি। হায়দ্রাবাদ সম্পর্কে নেহ্‌রুর বক্তৃতার পর মদনলাল তার আবেদন নিয়ে আর অগ্রসর হতে ইচ্ছুক নন।

৯ই সেপ্টেম্বর তারিখে প্রথমে সাক্ষ্য দেয় পুণার এক মুদি, নাম মহাদেও গোবিন্দ কুলকর্নী। পরবর্ত্তী সাক্ষী শ্রীযুত ডি. পি. টি. পাতিল। ইনি গোয়ালিয়র রাজ্যের সিনিয়র পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেন্ট। ডাঃ পারচুরের সম্বন্ধে ইনি তাঁর বক্তব্য বলেন। পূর্ব্বের বহু সাক্ষী, সাক্ষ্যপ্রসঙ্গে শ্রীযুত পাতিলের সম্বন্ধে যা বলেছেন, বর্ত্তমান সাক্ষীর জবানবন্দীতে সেগুলোই সমর্থিত হয়েছে।

শ্রীযুত ইনামদারের জেরার উত্তরে তিনি বলেন যে, ডাঃ পারচুরেকে ২রা ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রেফ্‌তার করা হয় নি, সেদিন তার গ্রেফ্‌তারি পরোয়ানা স্বাক্ষরিত হয়েছিলো মাত্র। আসামীকে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে প্রেরণ করা সম্পর্কে সাক্ষীর আদেশ অনুযায়ী তাঁর অধস্তন কর্ম্মচারীরা ২০শে ও ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ডাঃ পারচুরেকে লস্করের সিটি জুডিসিয়্যাল অফিসার শ্রীযুত জে. এম্. বৈজলালের সম্মুখে

উপস্থিত করেছিলেন। তার আগে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম অবশ্য তিনি নেন নি।

যে-সব সাক্ষী, কয়েকজন আসামীর হস্তাক্ষর গ্রহণ ও পাঁচনামা প্রস্তুতির সময় উপস্থিত ছিলেন, ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁদের আরো কয়েকজন সাক্ষ্য দেন। তাঁরা হলেন,—(১) চিকিৎসা ব্যবসায়ী ডাঃ পি. ডি. গোখেল; (২) শ্রীবালকৃষ্ণ ইনামদার; (৩) রেডিও দোকানের কর্ম্মচারী শ্রী এস্. কে. বিলচাঁদ; এবং (৪) বোম্বাইয়ের টেলিফোন ইনস্পেক্টর মিঃ ফ্র্যাঙ্ক রেবেলো।

এঁদের পর সাক্ষ্য দেন বোম্বাই সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ আপিসের কেরাণী ডি. লালকাব। গত ২৫শে জানুযারি তারিখে 'ব্যাস' নামে কোনো লোক বোম্বে সেণ্ট্রাল টেলিগ্রাফ আপিস থেকে পুণায় আপ্তের কাছে যে-একটি টেলিগ্রাম করেছিলেন সে-সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার আদেশ পেয়েছিলেন এই সাক্ষী।

এই দিন আরো-একজন সাক্ষীব জবানবন্দী গৃহীত হয, তাঁর নাম শ্রী জি. বি. কাওঠঙ্কর।

১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখের একমাত্র সাক্ষী হলেন বোম্বাইয়ের প্রধান প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ও. এইচ ব্রাউন। তাঁর তত্ত্বাবধানে বোম্বাইয়ে এগারোটি সনাক্তকরণ প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছিলো। অনুষ্ঠান-গুলো হযেছিলো বিভিন্ন তারিখে। আসামীদের স্বার্থরক্ষার খাতিরে মিঃ ব্রাউন কয়েকজন অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটের সাহায্যও গ্রহণ করেছিলেন। কেবল তাই নয়, ইচ্ছামতো জায়গায় বসবার বা দাঁড়াবার এবং ইচ্ছামতো পোষাক বদলাবার সুযোগও তিনি দিয়েছিলেন আসামীদের। প্রত্যেকটি প্যারেডের শেষে যথারীতি 'পাঁচনামা' তৈরি করা হয়েছিলো। পাঁচনামাগুলিতে তাঁর ও অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটদের স্বাক্ষর আছে। আসামী, সনাক্তকারী, প্যারেডে যোগদানকারী লোক

ও অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেটগণের উপস্থিতিতেই পাঁচনামা লেখা হয়, তাঁদের দ্বারা সেটি সংশোধিত হয়, এবং পরিশেষে সংশোধিত পাঁচনামা সকলকেই পড়েও শোনানো হয়।

১৪ই তারিখের প্রথম সাক্ষী হলেন শ্রীকাওঠক্কর। গত ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখেও ইনি সাক্ষ্য দিয়েছিলেন।

তিনি বলেন যে, গত ৩১শে জানুয়ারি তারিখে বোম্বাইয়ের দাদারস্থ শিবাজী পার্কে 'সাভারকর-সদন' তল্লাসীর সাক্ষী হবার জন্যে পুলিশ কর্তৃক আহূত হয়েছিলেন তিনি। তল্লাসীর ফলে ১৪৩টি ফাইল, কয়েকটি চেক-বই এবং বিভিন্ন রকমের কাগজপত্র পুলিশের হস্তগত হয়।

১৯৩৮ সাল থেকে সাভারকর, নাথুরাম গড্‌সে ও আপ্তের মধ্যে যে-সকল পত্র-বিনিময় হয়েছিলো, প্রাপ্ত ফাইলের মধ্যে তা আছে।

জেরার উত্তরে তিনি বলেন যে, কোনো ফাইল বা ফাইলের ভেতর-কার কোনো কাগজে তিনি স্বাক্ষর করেন নি। ফাইলে কি আছে না-আছে, তা-ও তিনি 'নোট' করে নেন নি।

পরবর্তী সাক্ষীর নাম সর্দ্দার ডি. সিং। গোয়েন্দা পুলিশের ইনস্পেক্টর ইনি।

২০শে জানুয়ারি তারিখে টহলদারির কাজে সন্ধ্যা ছ'টার সময় বিড়লা ভবনে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে গিয়ে দেখেন, মদনলালকে গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে, কাছেই রয়েছেন ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত সাহনী। মদনলালের কাছ থেকে যে-জবানবন্দী নেওয়া হয়েছিলো, শ্রীযুত সাহনী সেটি সাক্ষীর হাতে তুলে দেন। মদনলালকেও সাক্ষীর জিম্মা করে দেন। সাক্ষী নিজে মদনলালের দেহ তল্লাস করেন। তাঁর কাছ থেকে 'একটি হাতবোমা পাওয়া যায়। বাগানের দেয়াল এবং ভৃত্যাবাসের দেয়ালের

কোণে যেখানে বোমাবিস্ফোরণ হয়েছিলো, অতঃপর মদনলালকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়। বোমাবিস্ফোরণের ফলে দেয়ালের অনেকখানি ক্ষতি হয়েছিলো। ৩'২" × ১'৭" পরিমাণ একটি গর্ত হয়েছিলো সেখানে। রাত প্রায় দশটার সময় মদনলালকে নিয়ে যাওয়া হয় পার্লামেণ্ট স্ট্রীট থানায়।

২০শে জানুয়ারি রাত্রে মদনলালকে সঙ্গে নিয়ে তিনি যান ম্যারিনা হোটেলের চল্লিশ নম্বর ঘরে। হোটেলের রেজিস্টারি বই পরীক্ষার পর সেটিকে তিনি হস্তগত করেন। সেই ঘরে শ্রীআশুতোষ লাহিড়ীর একটি টাইপ-করা বিবৃতিও পাওয়া যায়। সেখান থেকে তাঁরা যান হিন্দু মহাসভা আপিসে।

২৪শে জানুয়ারি শেরিফ হিন্দু হোটেলে গিয়েও তিনি সেখানকার রেজিস্টারি বই পরীক্ষা করেন। ৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সেই-বইটিকেও হস্তগত করা হয়।

পরে একদিন বিড়লা ভবনে গেলে সর্দার যশোবন্ত সিং তাঁকে একটি সীল-করা পার্সেল দিয়েছিলেন। তাতে ছিলো একটি অগ্নি-প্রজ্বালক সেট ও একটি হাতবোমা। ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখে আসামী শঙ্কর তাঁকে এবং আরো কয়েকজন পুলিশ-অফিসারকে নিয়ে যান হিন্দু মহাসভা ভবনের পেছনে। সেখান থেকে আবিষ্কৃত হয় তিনটি হাতবোমা, একটি গান-কটন খণ্ড, পঁয়ত্রিশটি কার্তুজ এবং আটটি ডেটোনেটার।

আপ্তে ও করকারেকে দিল্লীতে আনা হয় ২৫শে ফেব্রুয়ারি তারিখে। তাঁদের রাখা হয় তোঘলক রোড থানায়। ২৬শে তারিখে আপ্তে কয়েকজন পুলিশ-অফিসার ও সাক্ষীকে নিয়ে যান হিন্দু মহাসভা ভবনের পেছন দিকে একটি জঙ্গলে। সেখান থেকে একটি খালি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়। তিনখণ্ড বৃক্ষকাণ্ডও কেটে আনা হয় সেখান থেকে।

আসামীদের যখন বাইরে নিয়ে যাওয়া হতো তখন পর্দা ঢাকা দিয়েই নিয়ে যাওয়া হতো।

শ্রীযুত ওকের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, তোঘলক রোড থানায় নাথুবাম গড্‌সেকে রাখা হয়েছিলো একটি ছোটো ঘরে। সেই ঘরে কোনো জানালা ছিলো না।

শ্রীযুত ডাঙ্গেব জেবাব উত্তবে তিনি বলেন যে, এই মামলাব তদন্ত সম্পর্কে ভাবতেব স্ববাষ্ট্র-সচিব সর্দ্দাব প্যাটেল বা বোম্বাইযেব স্ববাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত মোবাবজী দেশাইব কাছ থেকে তিনি কোনো নির্দ্দেশ পান নি।

শ্রীযুত ডাঙ্গে : কোনো সনাক্তকবণ প্যাবেড না হওযা সত্ত্বেও ২৬শে ফেব্রুযাবি তাবিখে আপ্তে ও কবকাবেকে পদ্দা ঢাকা দিযে নিয়ে গিযেছিলেন কেন ?

সাক্ষী : সনাক্তকবণ প্যাবেড হবাব নিশ্চিত সম্ভাবনা ছিলো বলেই পবিচয গোপনেব জন্যে ঐ সতর্কতা অবলম্বিত হযেছিলো।

প্রশ্ন : বোমাবিস্ফোবণ সম্পর্কে মহাত্মা গান্ধীব কোনো বিবৃতি গ্রহণ কবেছিলেন কি ?

উত্তব : না।

১৬ই সেপ্টেম্বব মাত্র একজন সাক্ষীব জবানবন্দী ও জেবা গৃহীত হয়। তাঁব নাম সদ্দাব যশোবন্ত সিং। নযা দিল্লীব ডেপুটি পুলিশ সুপাবিণ্টেণ্ডেণ্ট তিনি।

প্রধানত তাঁব সাক্ষ্য পূর্ব্ববর্ত্তী সাক্ষী সর্দ্দাব ডি. সিংযেব বিবৃতিবই সমর্থন কবে। তা ছাড়াও তিনি বলেন যে, ৩০শে জানুযাবি তাবিখে তিনি যখন পার্লামেণ্ট স্ট্রীট থানায ছিলেন তখন গান্ধীজীব হত্যার সংবাদ জানতে পাবেন। তখন বিকেল ৫-১৫ মিনিট। সংবাদ পেযেই গাড়ি কবে তিনি ছুটে যান বিড়লা ভবনে। শ্রীনন্দলাল মেহ্‌তাব সঙ্গে সেখানে তাঁব দেখা হয। শ্রীযুত মেহ্‌তাই তাঁকে দুর্ঘটনাব বিষযটি জানান। যে-কক্ষে মহাত্মাব দেহ বক্ষিত ছিলো তাব সুমুখে তক্ষুনি তিনি প্রহবী মোতাযেন কবেন। পবে যান ঘটনা স্থলে। সেখানে গিয়ে

দু'টি ব্যবহৃত বুলেট, দু'টি খালি কার্ত্তুজের খোল এবং একটি রক্তমাখা চাদর দেখতে পেয়ে সেগুলিকে হস্তগত করেন। অতঃপর তিনি গান্ধীজীর কক্ষে রিপোর্ট প্রস্তুত করেন।

নাথুরাম গড্‌সে তখন সেখানে ছিলেন না। রাত সাতটার সময় পার্লামেণ্ট স্ট্রীট থানা হাজতে দেখতে পান তাঁকে। পরীক্ষা করে মাথায় আঘাতের চিহ্ন দেখতে পেয়ে একজন ডাক্তার ডেকে পাঠান তিনি।

শ্রীযুত ওকের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, থানা হাজতে যখন তিনি নাথুরামকে দেখেছিলেন তখন তাঁর দেহের কোথাও রক্তক্ষরণ হতে দেখেন নি। জানুয়ারির পর আর তিনি ডাক্তার ডাকেন নি, কারণ ক্ষতগুলি খুব সামান্যই ছিলো, আর নাথুরামও ডাক্তারের প্রয়োজন অনুভব করেন নি।

শ্রীযুত ইনামদারের জেরার উত্তরে তিনি বলেন যে, জানুয়ারি মাসের কোনো সময়ে ওম্‌বাবা নামে কোনো লোক পার্লামেণ্ট স্ট্রীট থানায় অনশন করেছিলেন। পরে তাঁকে হাজতে রাখা হয়েছিলো। তাঁর অবস্থা খারাপ হয়েছিলো বলেই তাঁকে হিন্দু মহাসভা ভবনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিলো,—এ-কথা ঠিক নয়। তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিলো ২০শে জানুয়ারি তারিখে। সে-দিন হিন্দু মহাসভা ভবনের তিন নম্বর ঘরে ওম বাবাকে দেখতে পান নি তিনি। ঘরটি বন্ধ ছিলো, একজন চৌকিদার এসে তা খুলে দেয়। ঘরের মধ্যে কেউ ছিলো না।

২০শে সেপ্টেম্বর যাঁদের সাক্ষ্য গৃহীত হয় তাঁরা হলেন,—(১) গোয়ালিয়র ইম্পিরিয়্যাল ব্যাঙ্কের হেড ক্লার্ক শ্রীবালকৃষ্ণ খান্না, (২) পুণা মিউনিসিপ্যালিটির কেরাণী শ্রীনামদেও তায়াপ্পা নাগমোদে; (৩) সেখানকার আর-একজন কেরাণী শ্রীহোনাজী গণপৎ শেলার, এবং (৪) পুণা ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র শ্রীঅরুণ গান্ধী।

পরের দিনের প্রথম সাক্ষী হলেন শ্রীশঙ্কর গণপৎ ঘাদে। দ্বিতীয়

সাক্ষীর নাম শ্রী এন্. ওয়াই. দেউলকর। পুণার গোয়েন্দা বিভাগের ডেপুটি সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট তিনি। তিনি বলেন যে, গত ৩১শে জানুয়ারি তারিখে মহাত্মা গান্ধীর হত্যা সম্পর্কে তদন্ত করবার জন্যে উর্দ্ধতন কর্ম্ম-কর্ত্তার নির্দ্দেশ পেয়েছিলেন তিনি। অতঃপর তিনি তাঁর তদন্তেব একটি বিস্তৃত বিবৃতি দান কবেন।

শ্রীযুত দেউলকরের সাক্ষ্যদানকালে সবকারপক্ষের কৌঁসুলি শ্রীযুত দফ্‌তরি "অগ্রণী" ও "হিন্দু-রাষ্ট্র" পত্রিকা থেকে কতকগুলি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও সংবাদ আদালতের নথিভুক্ত করাতে চান। এ-ব্যাপারেব যৌক্তিকতা কি, বিচারপতি তা জানতে চাইলে, উত্তরে তিনি বলেন যে, নাথুরাম গড্‌সের জ্ঞাতসাবে প্রকাশিত এই সমস্ত প্রবন্ধ থেকে বিচারক একটা ধারণা কবে নিতে পারবেন। ঐ প্রবন্ধগুলির মতবাদ গান্ধী-বিরোধী। আবো বোঝা যাবে যে, যিনি ঐগুলি লিখেছিলেন, নিহতেব প্রতি তাঁর পূর্ণ বিদ্বেষ ছিলো।

নাথুরাম গড্‌সেব কৌঁসুলি শ্রীযুত ওক এতে আপত্তি জানিযে বলেন যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনো-কিছুব জন্যে সম্পাদককে দায়ী কবা যেতে পারে বটে, কিন্তু তা থেকে আদালত কোনো ধারণা করতে পারবেন, এমন কথা বোঝায় না। উক্ত প্রবন্ধগুলি দু'টি আদর্শের দ্বন্দ্বেব ফলেই হয়তো লিখিত হয়েছিলো; এক আদর্শ মহাত্মা গান্ধীর, অপবটি নাথুরাম গড্‌সের। নাথুরামের উপর বর্ত্তমানে যে-অপরাধ প্রযুক্ত হয়েছে তার সঙ্গে ওগুলোর কোনো যোগ আছে বলে মনে করার হেতু নেই। প্রবন্ধগুলি আমি মোটামুটি পাঠ করেছি। তাতে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি কোনো বিদ্বেষ প্রচার করা হযেছে বলে মনে হয না। ইহা তীব্র ও বলিষ্ঠ ভাষায় মত প্রকাশ মাত্র।

আপ্তের কৌঁসুলি শ্রীযুত মঙ্গলে বলেন যে, প্রবন্ধগুলি মহাত্মা গান্ধীর আদর্শের বিরুদ্ধে লিখিত। এতে যদি কোনোরূপ আক্রমণ

করা হয়ে থাকে তবে মহাত্মার আদর্শবাদকেই আক্রমণ করা হয়েছে, কোনো ব্যক্তিবিশেষকে নয়।

করকারের কৌঁসুলি শ্রীযুত ডাঙ্গে বলেন যে, প্রবন্ধগুলি যদি নথিভুক্ত হয় তবে সাক্ষ্য দ্বাবা ওগুলোর যাথার্থ্য প্রমাণ করতে হবে। প্রবন্ধ থেকে আসামীর মনোভাবের কোনো ধারণা কবা যেতে পারে না। অপরাধ করবাব মুহূর্ত্তেই অপবাধীব মনেব অবস্থাব বিচার চলে, অপরাধ করবার কিছু-পূর্ব্বে-লিখিত কোনো প্রবন্ধ থেকে তাব বিচার চলে না।

মদনলালেব কৌঁসুলি শ্রীযুত ব্যানার্জি বলেন যে, ষডযন্ত্র মামলায এরূপ সাক্ষ্য গ্রহণীয নয। তাঁব বক্তব্যেব সমর্থনে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের একটি রুলিংএব উল্লেখ কবে বলেন যে, আদালত এটিকে গ্রহণ কবলে অন্যান্য আসামীদেব ক্ষতি হবে।

বিচারপতি মন্তব্য কবেন যে, একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন এটি। উচ্চতব আদালতের রুলিং আলোচনা না কবে কোনো সিদ্ধান্ত কবা যায় না এ-সম্পর্কে। বিচাবক সাক্ষ্যেব এই অংশটিকে আপাতত স্থগিত রাখতে বলেন সবকাবপক্ষকে। দবকাব হলে আবাব আহ্বান করা যাবে সাক্ষীকে।

একচল্লিশ

জ্যোতিষ ও আইন

২২শে সেপ্টেম্বব তারিখে সাক্ষ্য দেন গোযালিযর, কাশ্মীর, বরোদা ও নয়ানগব-এব মহাবাজাদেব জ্যোতিষী শ্রীসূর্য্যনারাযণ ব্যাস। তিনি বলেন যে, তাঁর পিতাও ছিলেন একজন জ্যোতির্ব্বিদ। বিহারীলাল নামে একজন কেরাণী ছিলেন তাঁর। বিহাবীলাল প্রায় বছর ত্রিশেক

পূর্ব্বে মারা যান। সাক্ষীর পিতার মৃত্যু হয় ১৯৩৫ সালে। এই বিহারীলাল, সাক্ষীর পিতার নির্দ্দেশ অনুসারে কোষ্ঠী লিখতেন।

আসামী পারচুরের পিতার নাম শ্রীসদাশিব গোপাল পারচুরে। তিনি ছিলেন শিক্ষাবিভাগের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর। ১৯২১ সালে সাক্ষীর পিতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় উজ্জয়িনীতে। নিজের ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে শ্রীযুত পারচুরে তাঁর কোষ্ঠীটি তাঁকে দিয়েছিলেন। পিতার নির্দ্দেশানুযায়ী সাক্ষী সেই কোষ্ঠীর একটি নকল করে রাখেন একটি নোট-বইয়ে।

অতঃপর কোষ্ঠীটি দেখে সাক্ষী বলেন যে, শ্রীযুত পারচুরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন পুণায়।

শ্রীযুত ব্যানার্জি আপত্তি তুলে বলেন যে, মৃত ব্যক্তির বিবৃতি, সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হতে পারে না।

শ্রীযুত মঙ্গলেও বলেন, কোনো দেশে জন্মগ্রহণ করলেই সেই দেশের নাগরিক হওয়া যায় না। সেই দেশের আনুগত্য যতোদিন পর্য্যন্ত না কেউ স্বীকার করেন ততোদিন পর্য্যন্ত তিনি সেখানকার 'ডোমিসাইল' (domicile) লাভ করতে পারেন না।

এ-সম্বন্ধে আরো বক্তব্য শোনবার পর বিচারক আপত্তি প্রত্যাখ্যান করেন।

শ্রীসদাশিব গোপাল পারচুরের কোষ্ঠীর সারাংশ কোন তারিখে-যে সাক্ষী তাঁর নোট-বইয়ে টুকে রেখেছিলেন, তিনি তা স্মরণ করতে পারেন না। ঐ সারাংশ লেখা ছিলো একরকম কালিতে, তার নীচের অন্যান্য লেখা আবার অন্যরূপ কালিতে।

শ্রীযুত ব্যাসের পর আর-একজন যিনি এইদিনে সাক্ষ্য দেন তিনি হলেন ফ্লাইট্ লেফ্‌টেন্যান্ট এম্. কে. নেরুরকর। পালাম বিমান-ঘাঁটির প্রধান চলাচল-নিয়ামক কর্ম্মচারী তিনি।

নাথুরাম, আপ্তে এবং পারচুরে ১৯৪৭ সালের আগে কতকগুলি পত্র লিখেছিলেন সাভারকরকে। ঐ পত্রগুলি যেন এই মামলায় সাক্ষ্য-রূপে গৃহীত না হয়, সেজন্যে শ্রীযুত ভোপৎকার আজ এক আবেদন দাখিল করেন আদালতে।

এ-সম্পর্কে সবশুদ্ধ ১৪৩টি চিঠি আদালতে দাখিল করা হয়েছে। তার মধ্যে ৭৪টি লিখেছেন নাথুরাম, ২৭টি লিখেছিলেন আপ্তে, আর ডাঃ পারচুরে লিখেছেন ১১টি। ডাঃ পারচুরের পত্রগুলি ১৯০৪ সাল থেকে ১৯৪৩ সালের মধ্যে লেখা। ১৯৪৭ থেকে ১৯৪৮ সালের মধ্যে কোনো পত্রই লিখিত হয় নি।

আবেদনে এই সব ব্যাপারের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, "অভিযোগে ১৯৪৭ সালের ১লা ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারির মধ্যে ষড়যন্ত্রের সময় সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১০ ধারা অনুযায়ী, ১৯৪৭ সালের ১লা ডিসেম্বরের পূর্ব্বে কথিত, কৃত বা লিখিত কোনো-কিছুকেই অপরাধীর সঙ্গে সংযুক্ত করা যায় না।

"তা ছাড়া গত দু'বছরের মধ্যে ভারতের বুকে কেবলমাত্র বহু বৈপ্লবিক পরিবর্ত্তনই সংসাধিত হয় নি, ভারত রাষ্ট্রের সকল নাগরিকদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিবর্ত্তন ঘটেছে। তার ফলে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর থেকে যে-মতবাদ বা যে-নীতি সাভারকর সমর্থন করেছেন এবং যার কথা বাদগে ও অপরাপর অনেকেই বলেছেন, তা থেকে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার জন্যে কোনোরূপ ষড়যন্ত্রে (যদি কোনো ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে) যে বর্ত্তমান-অপরাধী লিপ্ত হতে পারেন সে-কথা অপ্রমাণিতই হয়।"

"এই-সব কারণে সাভারকর প্রার্থনা করেন যে, আপনি যেন অনুগ্রহপূর্ব্বক উক্ত পত্রগুলি মামলার নথিভুক্ত করতে কিংবা সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করতে সরকারপক্ষকে অনুমতি না দেন।"

২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে নিম্নোক্ত ক'জন সাক্ষ্য দেন :—

(১) বোম্বাই এয়ার ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ট্র্যাফিক বিভাগের কেরাণী শ্রী পি. জয়রমণ ; (২) পুণাস্থিত বোম্বাইয়ের শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টর আপিসের কেরাণী শ্রীদিগম্বর বিনায়ক হাস্কর ; (৩) বোম্বাই শহরের পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর শ্রী বি. এ. হলদিপুর।

এইদিন শ্রীযুত ব্যানার্জি আদালতে এক আবেদন পেশ করে বলেন যে, জ্যোতির্ব্বিদ শ্রীসূর্য্যনারায়ণ ব্যাস তাঁর সাক্ষ্যে ডাঃ পারচুরের পিতার কোষ্ঠী থেকে ডাঃ পারচুরেকে ব্রিটিশ ভারতের ডোমিসাইল বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন ; নিম্নোক্ত কারণে কোনোমতেই গ্রহণীয় নয় সেই সাক্ষ্য :—

(১) জন্মের সময় প্রমাণের জন্যে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে কোষ্ঠীকে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ করার বিধি আছে আইনে, কিন্তু জন্মস্থান প্রমাণের ব্যাপারে নহে।

(২) সদাশিব গোপাল পারচুরের জন্ম সম্বন্ধে কোষ্ঠী-প্রস্তুতকারী বিহারীলালের কোনো বিশেষ বা প্রত্যক্ষ জ্ঞান আছে বলে প্রমাণ নেই। সদাশিবের পিতা-মাতার সংস্পর্শে তিনি কোনো দিন এসেছিলেন বলেও জানা যায় নি। একমাত্র সদাশিবের পিতা-মাতাই সদাশিবের জন্ম সম্বন্ধে বিহারীলালকে ওয়াকিবহাল করাতে পারতেন।

২৮শে ও ২৯শে তারিখে পুলিশ সাব্‌ ইন্‌স্পেক্টর শ্রীহলদিপুরকে আরো জেরা করা হয়।

নাথুরাম, আপ্তে ও পারচুরের সঙ্গে সাভারকরের যোগাযোগ প্রমাণের জন্যে সাভারকরের গৃহে প্রাপ্ত কতকগুলি চিঠিকে এই মামলায় অগ্রহণীয় বলে শ্রীযুত ভোপৎকার গত ২২শে আগস্ট যে-আবেদন করেছিলেন, এইদিনে বিচারক সে-সম্বন্ধে উভয় পক্ষের বক্তব্য শ্রবণ করেন।

শ্রীযুত ভোপৎকার বলেন, ১৯৪৭—১৯৪৮ সালের মধ্যে নাথুরাম

ও আপ্তের সঙ্গে সাভাকরের কোনো বাক্যালাপ হয় নি। অথচ এই মামলায় ঐ-কালটিই একমাত্র বিবেচ্য কাল।

আবেদনের বিরোধিতা করে শ্রীযুত দফ্‌তরি বলেন যে, কোনো আসামীর সঙ্গে কোনো সময়ে তাঁর যোগাযোগ ছিলো,—এ-কথা অস্বীকার করে সাভারকর বোম্বাইয়ের চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ব্রাউনের কাছে যে-বিবৃতি দিয়েছেন, তা মিথ্যা প্রতিপন্ন করবার জন্যেই এই পত্রগুলিকে নথিভুক্ত করতে চান তিনি। সাভারকর স্বেচ্ছায় ঐ বিবৃতি দিয়েছিলেন। যতোক্ষণ ঐ বিবৃতি ফাইলে থাকবে ততোক্ষণ ঐ বিবৃতির অসত্যতা প্রমাণ করারার জন্যে সরকারপক্ষ সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করবেনই। পত্রগুলিকে নথিভুক্ত করে সরকারপক্ষ প্রমাণ করবেন যে, সাভারকর, গড্‌সে ও আপ্তের মধ্যে যোগাযোগ ছিলো। বস্তুত গড্‌সে ও আপ্তে, সাভারকরকে দেখতেন তাঁদের উপদেষ্টার মতো।

শ্রীযুত ব্যানার্জি বলেন, এই চিঠিগুলি মামলার বিবেচ্য সময়ের মধ্যে লিখিত হয় নি, অতএব এগুলি অপ্রাসঙ্গিক। হিন্দু মহাসভার কাজের জন্যে সাভারকর, গড্‌সে ও আপ্তের মধ্যে যোগাযোগের অর্থ এই নয় যে, মহাত্মা গান্ধীর হত্যার জন্যেও তাঁদের মধ্যে যোগাযোগ রয়েছে।

শ্রীযুত ভোপৎকার পুনরায় বলেন যে, বোম্বাইয়ে তদন্তকালে পুলিশ কর্তৃক অন্যান্য আসামীদের সঙ্গে সাভারকরের যে-গ্রুপ ফটো তোলা হয়েছিলো সেই সম্পর্কে এক এফিডেবিটে চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট সাভারকর, মহাত্মা গান্ধীর হত্যার ষড়যন্ত্রে অন্যান্য আসামীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা অস্বীকার করেন।

বিচারক, শ্রীযুত ভোপৎকারকে বলেন যে, তিনি যদি সাভারকরের বিবৃতির এরূপ অর্থই করতে চান, তবে তাঁকে তা পরিষ্কারভাবে বলতে হবে।

সাভারকরের সঙ্গে আলোচনা করে শ্রীযুত ভোপৎকার, গান্ধী

হত্যার ষড়যন্ত্রে কোনো আসামীর সঙ্গে সাভারকরের যোগাযোগের কথা অস্বীকার করে এক আবেদন দাখিল করেন।

শ্রীযুত দফ্‌তরি বলেন যে, ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১১ ধারা অনুসারে ঐ পত্রগুলি প্রাসঙ্গিক। রাজসাক্ষী বাদগের জবানবন্দী সমর্থনের জন্যে এইগুলি গ্রহণীয় হবে।

এ-সম্পর্কে আইনগত আলোচনার পর বিচারক আগামীকাল পর্য্যন্ত তাঁর আদেশদান স্থগিত রাখেন।

পরদিন বিচারক এ-সম্বন্ধে এই রুলিং দান করেন যে, শ্রীযুত সাভারকরের গৃহ থেকে যে-সব পত্র হস্তগত করা হয়েছে, নাথুরাম গড্‌সে, নারায়ণ আপ্তে এবং ভি. ডি. সাভারকর-যে পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন, কেবল এটুকু দেখবার জন্যেই সেই সব পত্র সাক্ষ্যপ্রমাণ হিসাবে আদালতে গ্রহণযোগ্য।

এইদিন পুণার গোয়েন্দা ইনস্পেক্টর শ্রী এ. আর. প্রধানের সাক্ষ্য গৃহীত হয়। ঐ পত্রগুলি সম্পর্কে একটি বিবৃতি দেন তিনি।

বিয়াল্লিশ

সাভারকর-মদনলাল কাহিনী

১লা অক্টোবর তারিখে গোয়েন্দা বিভাগের পুলিশ ইনস্পেক্টর শ্রী সি. আর. প্রধানকে আরো জেরা করা হয়। জেরার সময় শ্রীযুত ভোপৎকার আরো ৪৯ খানা পত্র নথিভুক্ত করিয়ে নেন। বিচারক পত্রের বিষয়গুলি নথিভুক্ত করার অনুমতি না দিলেও, প্রকাশ, রাজনীতিক্ষেত্রে যাঁরা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছেন, ঐ সব পত্রের কতকগুলি তাঁরা

লিখেছেন এবং কতকগুলি তাঁদের কাছে লেখা হয়েছে। এ সম্পর্কে জনকয়েক বিশিষ্ট ব্যক্তির নাম নিম্নে উল্লিখিত হলো,—লর্ড লিনলিথগো, স্থার আকবর হায়দারী, বড়লাটের প্রাইভেট সেক্রেটারি, শ্রীযুত এম. আর. জয়াকর, শ্রীযুত কে. এম. মুন্সী, বরোদার মহারাজা, মাস্টার তারা সিং, স্থার তেজবাহাদুর সপ্রু, স্থার জগদীশপ্রসাদ, মিঃ এম. এ. জিন্নাহ্, স্থার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপসের সেক্রেটারি, ডাঃ এস. পি. মুখার্জি, শ্রীযুত এম. এন. রায়, স্থার সি. পি. রামস্বামী আয়ার এবং মার্শাল চিয়াং কাইশেক।

এই মামলা সম্পর্কে তিনি যে-সব তদন্ত করেছেন তারই একটি বিবৃতি দেন শ্রীযুত প্রধান। তারপর সাক্ষীকে জেরা করেন শ্রীযুত ব্যানার্জি, শ্রীযুত হংসরাজ মেহ্‌তা, শ্রীযুত ভোপৎকার।

অতঃপর সাক্ষ্য দেন গোয়ালিয়রের গোয়েন্দা বিভাগের ইনস্পেক্টর শ্রী এস. আর. মণ্ডলিক।

দণ্ডবতে, যাদব ও সূর্য্যদেও শর্ম্মার সন্ধানে গত ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তিনি দিল্লীতে এসেছিলেন। ঐ তিনজন আসামী এখনও পলাতক। আজো পর্য্যন্ত কোনো সন্ধান মেলে নি তাঁদের। তাঁদের তল্লাসে বোম্বাই, ডেটিয়া এবং আরো দু'তিন জায়গায় যেতে হয়েছিলো তাঁকে। ২৭শে ফেব্রুয়ারি তারিখে আপ্তেকে গোয়ালিয়রে দেখেছিলেন তিনি। ঐদিনই আপ্তে ও অন্যান্য পুলিশ-কর্ম্মচারীর সঙ্গে তিনি গিয়েছিলেন ডাঃ পারচুরের বাড়ীতে। পারচুরেকে তিনি আগে থেকেই জানতেন। পারচুরের ভাই কৃষ্ণরাও এবং দিনকর রাও-এর সঙ্গেও জানাশোনা ছিলো তাঁর। শেষোক্তজন ছিলেন তাঁর সহপাঠি। ডাঃ পারচুরের পিতা সদাশিব গোপাল পারচুরেকেও তাঁদের বাড়ীতে দেখেছেন তিনি। সদাশিব পারচুরে ছিলেন শিক্ষা বিভাগের ইনস্পেক্টর জেনারেল, না হয় ডেপুটি ইনস্পেক্টর জেনারেল। তাঁর একটি পা ছিলো খোঁড়া।

জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, গোয়ালিয়র রেলস্টেশন ও পারচুরের বাড়ীর মধ্যে দূরত্ব প্রায় পৌণে এক মাইল। ডাঃ পারচুরেকে জানতেন তিনি ১৯৪৬ সাল থেকে। এই মামলা সম্পর্কে দু'জন টাঙ্গাওয়ালার জবানবন্দী নিয়েছিলেন তিনি। ঐ দু'জনের নাম গরিবা ও জুম্মা। লস্কর শহরের বাসিন্দা তারা। ১৩ই ফেব্রুয়ারি যখন ডাঃ পারচুরের গৃহে তল্লাসী হয়, সাক্ষী তখন উপস্থিত ছিলেন সেখানে। ২৪শে জানুয়ারি তারিখে মতিমহল সেক্রেটারিয়েটের সুমুখে কংগ্রেস-মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে গোয়ালিয়র হিন্দু-সভা যখন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে, সাক্ষী তখন সেখানেও উপস্থিত ছিলেন। ডাঃ পারচুরেও ছিলেন ঐ বিক্ষোভ-প্রদর্শনকারীদের মধ্যে।

তারপর সাক্ষ্য দেন বোম্বাই পশ্চিম সার্কেলের বিস্ফোরকদ্রব্য-বিভাগের ইনস্পেক্টর শ্রী এস. কে. ভবনগরী।

৫ই অক্টোবর সাক্ষ্য দেন বোম্বাই গোয়েন্দা বিভাগের স্পেশ্যাল ব্রাঞ্চের ডেপুটি কমিশনার ও গান্ধী-হত্যা-মামলার প্রধান তদন্তকারী অফিসার শ্রীযুত জে. ডি. নাগরওয়ালা। শ্রীযুত নাগরওয়ালার কথা পূর্ব্বে আরো কয়েকজন সাক্ষীর জবানবন্দীতে উল্লিখিত হয়েছে। বর্ত্তমান সাক্ষীর সম্বন্ধে তাঁরা যা-যা বলেছেন, শ্রীযুত নাগরওয়ালা তাঁর জবানবন্দীতে তারই সমর্থন করেছেন। আবার এ-সব কথার উল্লেখ পুনরুক্তি বলেই মনে হবে। কেবল মাত্র দু'একটি বিশেষ কথার উল্লেখ এখানে করবো।

৩০শে জানুয়ারি বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র-সচিব তাঁকে মহাত্মা গান্ধীর হত্যা-সংবাদ জানিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করতে নির্দ্দেশ দিয়েছিলেন। সেদিনই-কয়েকজনকে গ্রেফ্তার করা হয়। রাত্রি প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার জনৈক রিপোর্টারের কাছ থেকে তিনি জানতে পারেন যে, আততায়ীর নাম নাথুরাম। গান্ধী-হত্যার সংবাদ বোম্বাইয়ে পৌছার অব্য-বহিত পরেই সেখানে গোলযোগ সুরু হয়। ৩১শে তারিখ অপরাহ্নে

সাভারকরের বাড়ী খানাতল্লাস করা হয়। সাক্ষী সেখানে গিয়ে দেখতে পান, ইটপাটকেল ও ভাঙ্গা কাঁচ ইতস্তত পড়ে আছে। বাড়ীর দরজা জানালাও ক্ষতিগ্রস্ত। সাক্ষী মনে করেন, কোনো জনতা বাড়ীটি আক্রমণ করেছিলো। সমস্ত বাড়ীটিই খানাতল্লাস করা হয়। সাভার-করকে দেখে ভীত ও উদ্বিগ্ন বলে মনে হয়েছিলো, কিন্তু তাঁকে অসুস্থ বলে সাক্ষীর মনে হয় নি। তবে সাভারকর নিজে ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছিলেন। খানাতল্লাসের পরেও রক্ষীদলকে সেখানে মোতায়েন রাখা হয়। তাদের সরিয়ে না নেবার জন্যে সাভারকর অনুরোধ করেছিলেন সাক্ষীকে।

৬ই অক্টোবর তারিখে শ্রীযুত ভোপৎকার জেরাপ্রসঙ্গে সাক্ষীকে জিজ্ঞাসা করেন,—

শ্রীযুত ভোপৎকার: গান্ধী-হত্যা মামলার তদন্ত-ভার গ্রহণের পর হত্যার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কেউ কি আপনাকে কোনো প্রাথমিক রিপোর্ট দিয়েছিলেন ?

সাক্ষী: মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে শ্রীযুত মোরারজী দেশাইর নিকট আমি জানতে পেরেছিলাম। শ্রীযুত দেশাই কোনো প্রাথমিক রিপোর্ট দাখিল করেন নি। ১০ই ফেব্রুয়ারি প্রথমে আমি মামলার ডায়েরি দেখেছিলাম। রিপোর্ট ও মামলার ডায়েরি—দু' জায়গাতেই আমি দেখেছিলাম যে, ১২০-বি ধারা (ষড়যন্ত্রের অভিযোগ) ইতিমধ্যেই যোগ করা হয়েছে।

প্রশ্ন: ২১শে জানুয়ারি থেকে ৩১শে জানুয়ারির মধ্যে কি মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে কোনো প্রাথমিক রিপোর্ট আপনি পেয়েছিলেন ?

উত্তর: না।

সাক্ষী আরো বলেন যে, শ্রীযুত মোরারজী দেশাই তাঁকে কোনো

লিখিত নির্দেশ দেন নি; এবং তিনি স্টেশনে যা বলেছিলেন, সাক্ষী তাও লিখে নেন নি।

৭ই অক্টোবর তারিখের জেরায় সাক্ষী বলেন যে, অধ্যাপক জৈন, মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার 'ষড়যন্ত্রে'র কথা প্রকাশ করেছিলেন বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত মোরারজী দেশাইয়ের কাছে। ১৭ই ফেব্রুয়ারি, কি তার কাছাকাছি তারিখে, অধ্যাপক জৈনের বিবৃতি লিখে নিয়েছিলেন সাক্ষী।

অধ্যাপক জৈনের বিবৃতিটি দেখানো হলে সাক্ষী বলেন যে, অধ্যাপক জৈনের যে-বিবৃতি তিনি লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাতে আছে, "তারপর মদনলাল বললেন যে, তাঁর কাহিনী শুনে হিন্দু মহাসভার শ্রীযুত সাভারকর তাঁকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। সাভারকরের সঙ্গে মদনলালের প্রায় দু'ঘণ্টা কথাবার্তা হয়েছিলো সাভারকরেরই শিবাজী পার্কের বাড়ীতে। মদনলালের কৃতকাজের জন্যে সাভারকর তাঁর পিঠ চাপড়েছিলেন।" সাভারকর মদনলালকে কাজ চালিয়ে যেতে বলেছিলেন, বিবৃতির কোথাও এমন কথা লিপিবদ্ধ হয় নি। পিঠ চাপড়ানো অর্থে আমি মনে করেছিলাম যে, সাভারকর তাঁর পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, "কাজ চালিয়ে যাও।"

শ্রীযুত ভোপৎকারের আর-এক প্রশ্নের উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, শ্রীযুত মোরারজী দেশাইয়ের যে-বিবৃতি তিনি লিখেছিলেন তার এক জায়গায় শ্রীযুত দেশাই বলেছেন, "আমাদের সঙ্গে আলাপের সময় অধ্যাপক জৈন একথা বলেছেন যে, করকারেই মদনলালকে সাভারকরের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিলেন; এবং তাঁদের কথা শোনবার পর মদনলালের সঙ্গে প্রায় দু' ঘণ্টাকাল কথা চলে শ্রীযুত সাভারকরের, সাভারকর তখনি তাঁর পিঠ চাপড়ে দেন।" "কাজ চালিয়ে যাও,"—মদনলালকে সাভারকর এমন কথা বলেছিলেন বলে শ্রীযুত দেশাইর বিবৃতির কোথাও উল্লেখ নেই।

শ্রীযুত মঙ্গলের জেরার উত্তরে সাক্ষী বলেন যে, ৩০শে জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর হত্যার সংবাদ বোম্বাইয়ে পৌঁছলে সেখানকার হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা উপস্থিত হয়। ৩১শে তারিখে তিনি দেখেন যে, হিন্দু মহাসভার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন জনৈক ব্যক্তির দোকান লুণ্ঠিত ও অগ্নিদগ্ধ হয়েছে। সাভারকরের গৃহে জনতার আক্রমণের চিহ্ন দেখেছিলেন তিনি। একটি জনতার হাত থেকে হিন্দু মহাসভার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন জনৈক ব্যক্তিকে উদ্ধারও করেছিলেন। শ্রীযমুনা দাস মেহ্‌তা ও শ্রী কে. এন. ধারাপকে বোম্বাই-জন-নিরাপত্তা আইনানুসারে আটক করা হয়েছিলো, এ-সংবাদ সাক্ষী জানতেন। জনতা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয়ে নিজের নিরাপত্তার জন্যে শ্রী আর. কে. খাড্রে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। পরে বোম্বাই-জন-নিরাপত্তা আইন অনুযায়ী তাঁকেও আটক করা হয়েছিলো। এই তিনজনই ছিলেন হিন্দু মহাসভার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন।

৮ই অক্টোবরের জেরায় শ্রীযুত ডাঙ্গে সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন,—

শ্রীযুত ডাঙ্গে : এ কথা কি সত্য যে, এই মামলা সম্পর্কে ১২ই এপ্রিল তারিখে শ্রীযুত এল. বি. ভোপৎকারকে জেরা করা হয়েছিলো ?

সাক্ষী : হ্যাঁ।

প্রশ্ন : এই মামলা সম্পর্কে সর্দ্দার বল্লভভাই প্যাটেলের সঙ্গে আপনি সাক্ষাৎ করেছিলেন ?

উত্তর : এই মামলার তদন্ত সম্পর্কে সর্দ্দার প্যাটেলের সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করি নি। তবে এই মামলা সম্পর্কে যে-সকল আইন-উপদেষ্টা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন, আমি তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : মুসৌরিতে সর্দ্দার প্যাটেলের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিলো ?

উত্তর : আইন-উপদেষ্টার সঙ্গে আমি একবার মুসৌরিতে এবং দু'বার দিল্লীতে গিয়েছিলাম।

প্রশ্ন : সে-সময়ে এই মামলা সম্পর্কে সর্দ্দার প্যাটেলের সঙ্গে আপনার কোনো কথা হয়েছিলো ?

উত্তর : আগেই বলেছি যে, ব্যক্তিগতভাবে সর্দ্দার প্যাটেলের সঙ্গে আমার কোনো আলাপই হয় নি।

প্রশ্ন : ২৪শে জানুয়ারি তারিখে বাদগের সম্বন্ধে আপনি সংবাদ পেয়েছিলেন। তখুনি তাঁকে গ্রেফ্‌তার করেন নি কেন ?

উত্তর : সব রকম চেষ্টা সত্ত্বেও বাদগেকে গ্রেফ্‌তার করা যায় নি। তবে ২৪শে জানুয়ারি থেকে বাদগের বাড়ীর উপর নজর রেখেছিলাম।

সাক্ষী আরো বলেন যে, ৩০শে জানুয়ারি রাত্রে বোম্বাইয়ের কোথাও তিনি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা দেখতে পান নি। ৫ই ফেব্রুয়ারি গ্রেফ্‌তার না হওয়া পর্য্যন্ত শ্রীযুত সাভারকর স্বাধীনভাবেই চলাফেরা করতে পারতেন। শ্রীযুত নাগরওয়ালার সাক্ষ্য এইখানেই শেষ হয়।

বারো দিন পর ২১শে অক্টোবর তারিখে আবার মামলার শুনানি সুরু হয়। এই দিন মাত্র একজন সাক্ষীর জবানবন্দী গৃহীত হয়, তাঁর নাম শ্রীঠাকুরদাস জয়কিষণদাস গজ্জার। পুণা গোয়েন্দা বিভাগের জনৈক হস্তলিপি-বিশেষজ্ঞ ইনি।

সাক্ষ্যপ্রসঙ্গে নাথুরামের কতকগুলি হস্তলিপির নমুনা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সমস্ত লেখাগুলোই এক হাতের; অক্ষরের ভঙ্গী, আকার, প্রকার, উঠা-নামা, বাঁক—সবই এক ছাঁদের। 'O' অক্ষরের পর রয়েছে ড্যাশ ', 'গড্‌সে'র পর কলমটি তোলা হয়েছে একবার, 'se' অক্ষর দুটো লেখা হয়েছে আলাদা করে, তাদের গতি নিম্নাভিমুখী, বিনায়ক শব্দের অক্ষরটির শেষ দিকটা সর্ব্বত্রই বঁড়শির মতো দেখতে—এগুলোতে একই লেখকের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে।

২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে অক্টোবর পর-পর এই তিনদিন ধরে চলে

শ্রীযুত গজ্জারের জবানবন্দী ও জেরা। নাথুরাম ছাড়া আরো কয়েকজন আসামীর হস্তলিপি সম্পর্কেও বিবৃতি দেন তিনি।

২৭শে অক্টোবর আরো একজন সাক্ষ্য দেন। তিনি হলেন বোম্বাইয়ের পুলিশ ইনস্পেক্টর মিঃ চার্লস্ অ্যান্থনি পিণ্টো।

২৮শে অক্টোবর নিম্নলিখিত সাক্ষীদের জবানবন্দী ও জেরা গৃহীত হয়:—

(১) বোম্বাইয়ের প্রধান পুলিশ-ফটোগ্রাফার শ্রীবালকৃষ্ণ রাজারাম রাজ; (২) দিল্লীর জনৈক স্থপতি শ্রীগুলাবচাঁদ শর্ম্মা, এবং (৩) দিল্লী রেলওয়ে স্টেশনের প্রধান বুকিং কেরাণী শ্রীচক্রধর।

২৯শে অক্টোবর তারিখে প্রথমে সাক্ষ্য দেন দিল্লী রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ইনস্পেক্টর শ্রীভোজরাম।

জেরাপ্রসঙ্গে ভোজরাম বলেন যে, ভারত বিভাগের পূর্ব্বে তিনি কাজ করতেন লাহোর স্টেশনে।

শ্রীযুত ডাঙ্গে: একথা কি সত্য যে, ৪ঠা মার্চ তারিখে লাহোরে দাঙ্গা আরম্ভ হয়েছিলো?

সাক্ষী: হ্যাঁ। কিন্তু আমি নিজের চোখে দাঙ্গা দেখি নি।

প্রশ্ন: সে-সময় কোনো গৃহ অগ্নিদগ্ধ হতে দেখেছিলেন কি?

উত্তর: মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের দিকে কয়েকটি গৃহ অগ্নিদগ্ধ হতে আমি দেখেছিলাম।

সাক্ষী তাঁর বাড়ীর ছাদ থেকেই অগ্নিশিখা দেখেছিলেন বটে, তবে লাহোরের কোন অঞ্চলে অগ্নিকাণ্ড হয়েছিলো, তা ঠিক করতে পারেন নি। ঐ সালে মার্চ মাসে বহু শরণার্থীর ভিড় হয়েছিলো লাহোর স্টেশনে।

প্রশ্ন: একথা সত্য যে, স্টেশনের সুমুখেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ ও কংগ্রেস কর্ম্মীদের দ্বারা আশ্রয়-শিবির খোলা হয়েছিলো?

উত্তর : হ্যাঁ। হিন্দু, মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের জন্তেই আশ্রয়-শিবির খোলা হয়েছিলো।

প্রশ্ন : একথা কি সত্য যে, রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভা দলের কর্ম্মীরাই হিন্দু-আশ্রয়প্রার্থী-শিবিরে সেবাকার্য্য করতেন?

উত্তর : আমি তা ঠিক বলতে পারবো না।

প্রশ্ন : আপনি কি জানেন, লাহোর রেল-স্টেশনে কয়েকজন হিন্দুকে আক্রমণ করা হয়েছিলো?

উত্তর : হ্যাঁ, ১৯৪৭ সালের জুন মাসে মুসলমানেরা কয়েকজন হিন্দুকে আক্রমণ করেছিলো।

পরবর্ত্তী সাক্ষীদের নাম—

(১) গোয়ালিয়র রাজ্যের কৃষি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ডিরেক্টার মেজর দাদাভাই মানেকজী লাল; (২) গোয়ালিয়রের "জয়জী প্রতাপ" কাগজের অস্থায়ী সম্পাদক শ্রীরামপ্রসাদ; (৩) বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কেরাণী শ্রীবিনায়ক রঘুনাথ দর্শেথকর; (৪) গোয়ালিয়রস্থ লস্করের কোতোয়ালি স্টেশন অফিসার শ্রীকেশব বিশ্বনাথ ভাজেকার; (৫) লস্করের জনৈক অধিবাসী শ্রীশ্যামবাহাদুর; (৬) দিল্লীর জ্যোতিষী শ্রীআদিত্য রাম; এবং (৭) লস্কর কোতোয়ালির দারোগা শ্রীবীরেন্দ্র সিং।

শ্রীবীরেন্দ্র সিং-ই সরকারপক্ষের শেষ সাক্ষী।

তেতাল্লিশ

নাথুরামের কথা

৮ই নভেম্বর, সোমবার, ১৯৪৮ সাল।

এই দিন থেকে স্থরু হলো আসামীদের বিবৃতিগ্রহণ। প্রথমে বিবৃতি দিলেন নাথুরাম গড্‌সে। বিচারপতি জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে, "আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষীদের কথা আপনি শুনলেন। এখন আপনার বক্তব্য কি?

নাথুরাম: আমি একটি বিবৃতি দান করবো মনে করেছি।

বিবৃতিদানের পূর্ব্বে সাংবাদিকদের তিনি অনুরোধ জানান এই বলে যে, তাঁর বিবৃতির সম্পূর্ণটাই তাঁরা ছাপান, আর তার সংক্ষেপিত রূপই ছাপান, তাঁর সম্বন্ধে যেন কোনোরূপ ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করা না হয়।

শ্রীযুত দফ্‌তরি এরূপ আবেদনে আপত্তি জানিয়ে বলেন, "আদালত সাধারণের বক্তৃতামঞ্চ নয়। অতএব আসামীর এরূপ আবেদন-প্রচারে উৎসাহ না দেবার জন্যেই আদালতকে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি।"

অতঃপর নাথুরাম তিরানব্বই পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ জবানবন্দী পড়তে আরম্ভ করলেন। বিবৃতিটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত:—(১) ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, (২) গান্ধী-রাজনীতির বিচার, (৩) গান্ধীজী ও ভারতের স্বাধীনতা, (৪) গান্ধী-মতবাদের ব্যর্থতা, এবং (৫) জাতীয় স্বার্থবিরোধী তোষণ-নীতির চরম পরিণতি।

৩০শে জানুয়ারি গান্ধীজীকে গুলী করবার কথা স্বীকার করে গড্‌সে বলেন, "আমি মার্জ্জনা চাই না, আমার হয়ে কেউ মার্জ্জনা ভিক্ষা করুন, তাও আমার কাম্য নয়।"

তিনি বলেন, দেশের সরকার পরিচালিত হচ্ছিলেন গান্ধী-মতবাদ ও গান্ধী-রাজনীতির প্রভাবে। তার ফলেই সৃষ্টি হলো পাকিস্তান। ঘটলো লক্ষ লক্ষ হিন্দু নরনারীর চরম দুর্গতি। গড্‌সে ভেবেছিলেন,

মুসলমানদের অত্যাচার থেকে হিন্দু নরনারীকে রক্ষা করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে গান্ধীজীকে ইহলোক থেকে সরিয়ে দেওয়া।

"গান্ধীজীই ছিলেন পাকিস্তানের জনক, এ-কথার প্রমাণ গান্ধীজী নিজে। একমাত্র এই কারণেই, ভারত-মাতার কর্ত্তব্যনিষ্ঠ সন্তান হিসাবে আমি মনে করেছিলাম, আমাদের মাতৃভূমিকে দ্বিধাবিভক্ত করবার ব্যাপারে যাঁর প্রভাব ছিলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, জাতির সেই তথাকথিত-পিতা গান্ধীজীকে বিনাশ করা আমার কর্ত্তব্য।"

গান্ধী-হত্যাব সম্পূর্ণ দাযিত্ব নিজেই গ্রহণ করেন গড্‌সে। হত্যার উদ্দেশ্যে অন্য কারো সঙ্গে তিনি ষড়যন্ত্র করেছেন,—তৎসঙ্গে একথাও অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "ষড়যন্ত্রকারী হিসাবে আমার সঙ্গে আরো কয়েকজনকে এই মামলায় জড়ানো হযেছে। আমি আগেই বলেছি, আমি যা করেছি—একাই করেছি, তাতে কোনো সঙ্গী আমার ছিলো না। এই হত্যাকাণ্ডের জন্যে সম্পূর্ণ দাযী আমি নিজে। আমার সঙ্গে তাঁদেরো যদি না জড়ানো হতো, আত্মপক্ষ সমর্থনেব জন্যে কৌঁসুলি নিয়োগ করতাম না আমি। তার একটা প্রমাণ, ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখের ঘটনা সম্পর্কে, আমার কৌঁসুলিকে, কোনো সাক্ষীকেই জেরা করতে দিই নি আমি।"

বিবৃতির প্রায় এক-পঞ্চমাংশ পড়া শেষ হবার সময়ে নাথুরাম হঠাৎ মাথা ঘুরে কাঠগড়ায় পড়ে যান। কিছুক্ষণ বিশ্রামের অনুমতি দেওয়া হয় তাঁকে। মিনিট পনেরো পর নাথুরাম জানান যে, পায়ে বেদনা অনুভব করছেন তিনি। বিচারপতি তখন তাঁকে চেয়ারে বসে বিবৃতি পাঠ করবার নির্দ্দেশ দেন।

গড্‌সে বলেন, "জনসাধারণ আমার প্রশংসা করবে, এই সুদীর্ঘ বিবৃতির উদ্দেশ্য তা নয়। আমার উদ্দেশ্য, জনসাধারণ যেন

আমাকে ভুল না বুঝেন এবং আমার মতবাদ সম্বন্ধে তাঁদের মনে যেন কোনোরূপ অস্পষ্টতার অন্ধকার না থাকে।”

“খণ্ডিত হিন্দুস্থান আবার এক হোক, মিলিত হোক; দেশবাসী, পরাজয়-সুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে অত্যাচারীর নিকট আত্মসমর্পণের দুর্ব্বল মনোবৃত্তি পরিহার করতে শিখুক—ভগবানের কাছে এই আমার শেষ কামনা ও অন্তিম প্রার্থনা।”

গড্‌সে বলেন, মহাত্মা গান্ধীকে গুলী করবার পর পালাবার ইচ্ছা তাঁর মোটেই ছিলো না। “বস্তুত পালিয়ে যাবার কোনো অভিসন্ধিই আমি মনে স্থান দিই নি। আত্মহত্যাব চেষ্টাও আমি করি নি, সেরূপ ইচ্ছাও আমার ছিলো না। প্রকাশ্য আদালতে আমার মনের ভাব আমি খুলে বলবো—এই ছিলো আমার একান্ত কামনা। বিভিন্ন বিরূপ সমালোচনা সত্ত্বেও আমার কৃতকর্ম্মের নৈতিক দিক সম্পর্কে আমার বিশ্বাস এতোটুকু শিথিল হয় নি। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণ ভবিষ্যতে একদিন আমার কার্য্যের গুরুত্ব ও যথার্থ মূল্য গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন, এ বিষয়ে আমাব কোনো সন্দেহ নেই।”

গান্ধীজীকে হত্যা করলে তাঁর দশা যে কি ঘটবে, নাথুরাম তা আগেই ধারণা করে নিয়েছিলেন। তাঁর ভাষায়—“ভবিষ্যতে আমি দেখেছিলাম ধ্বংস, বুঝেছিলাম,—জনসাধারণের কাছ থেকে পাবো কেবল ঘৃণা; জেনেছিলাম—প্রাণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতর যে-সম্মান—তাও আমার যাবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এই বিশ্বাসও আমার মনে জেগেছিলো যে, গান্ধীজীর অবর্ত্তমানে ভারতীয় রাজনীতি হবে বাস্তবপন্থী, অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণে হবে সক্ষম এবং সশস্ত্রবাহিনী সংগঠনে হবে শক্তিশালী।

“আমার ভবিষ্যৎ যে সম্পূর্ণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সমগ্র জাতির পাকিস্তানে পরিণত হবার পথ হবে রুদ্ধ। জনসাধারণ আমাকে বলবেন কাণ্ডজ্ঞানহীন মূর্খ, কিন্তু যুক্তির ভিত্তিতে দেশগঠনের

পথ হবে মুক্ত। প্রকৃত জাতিগঠনের পক্ষে একেই আমি মনে করি অপরিহার্য্য।

"ব্যাপারটিকে সব দিক থেকেই ভেবেচিন্তে শেষ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলাম আমি। কিন্তু অপর কাউকে একথার বিন্দুবিসর্গও জানাই নি। আমার নিজের শক্তিতেই ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে বিড়লা ভবনে গান্ধীজীকে গুলী করেছিলাম। এরপর আমার পক্ষে বলবার আর কি থাকতে পারে? দেশভক্তি যদি পাপ হয়, স্বীকার করছি—আমি পাপী। দেশভক্তি যদি পুণ্যের হয়, তবে আমিও পুণ্যবান। মরজগতের ওপারে যদি অন্য কোনো বিচারালয় থাকে, আমার দৃঢ়বিশ্বাস—সেখানে আমার কাজ কখনো অন্যায় বলে বিবেচিত হবে না। মৃত্যুর পরপারে যদি কিছু না থাকে তো আমার বলবার কিছু নেই। আমি যা করেছি, মানুষের কল্যাণের জন্যেই করেছি। আমি জোর গলায় বলছি,—যাঁর নীতি এবং কাজের ফলে লক্ষ লক্ষ হিন্দুর জীবনে নেমে এসেছে ধ্বংস, উচ্ছেদ ও মৃত্যু সেই লোককেই আমি গুলী করে মেরেছি।

"সত্যি কথা বলতে কি, গান্ধীজীকে গুলী করার সঙ্গে সঙ্গে আমার জীবনেরও ঘটেছে সমাপ্তি। সেই থেকে আমার দিন কাটছে চেতনাহীন এক ধ্যানলোকের মাঝখানে। এই সময়ের মধ্যে যা কিছু আমি দেখেছি, অনুভব করেছি, আমার মন পরিপূর্ণ হয়ে আছে পরম তৃপ্তিতে।"

শেষোক্ত কথার ব্যাখ্যা করে নাথুরাম বললেন, হায়দ্রাবাদ সমস্যার সমাধানে অনাবশ্যক দীর্ঘসূত্রতা অবলম্বিত হয়েছিলো। কিন্তু "গান্ধীজীর মৃত্যুর পর সশস্ত্র সৈন্যশক্তি দ্বারা বর্ত্তমান সরকার তার যথার্থ সমাধান করেছেন।" তখন থেকে ভারত-সরকারকে বাস্তব রাজনীতি জ্ঞানের পরিচয় দিতেও দেখা গিয়েছে। স্বরাষ্ট্র-সচিব বলেছেন যে, আধুনিক

অস্ত্রশস্ত্র ও সমরসম্ভারে জাতিকে, সশস্ত্রবাহিনীতে নিশ্চয়ই সজ্জিত করতে হবে।

গড্‌সে বলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর প্রতি কোনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিলো না তাঁর। কিন্তু গান্ধীজীর নীতি ও কার্য্যকলাপ, বিশেষত ১৯৪৭ সালে, দেশের প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে তাঁর মুস্‌লিম-তোষণ-নীতি এবং তার পরিণতিস্বরূপ পাঞ্জাবের ও অন্যান্য স্থানের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তাঁর (গড্‌সের) মানসিক শান্তিকে ভেঙে ওলট-পালট করে দিয়েছিলো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরেও যদি "এই গান্ধীপন্থী সরকার" পাকিস্তানবাসী হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার কোনো ব্যবস্থা অবলম্বন করতেন, তা হলেও মনকে সংযত করা সম্ভবপর হতো তাঁব পক্ষে।

পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দিতে এবং দিল্লীর মসজিদগুলি পুনঃসংস্থাপিত করতে গভর্নমেন্টকে বাধ্য করবার জন্যে গত জানুয়ারি মাসে গান্ধীজী যে-আমৃত্যু অনশন-ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তারই উল্লেখ করে গড্‌সে বলেন যে, তার ফলেই মসজিদে আশ্রয়প্রার্থী পরিবার-গুলিকে বিতাড়িত করা হয়েছিলো। নাথুরামের বিবৃতির ভাষায় বলতে হয়, "নিজেদের যে-ঘরবাড়ী আশ্রয়প্রার্থীরা ছেড়ে চলে এসেছিলো সে-গুলোর চেয়ে এই সব মসজিদকে আরো ভালো জায়গা মনে করে কেবল কৌতুকবশেই কি তারা আশ্রয় নিয়েছিলো মসজিদে? শরণার্থীরা যে-জন্যে এই সব মসজিদে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিলো, গান্ধীজী কি তার কার্য্যকারণ সম্বন্ধে সচেতন এবং অবহিত ছিলেন না? দেশের গুরুদ্বারগুলি চলে গিয়েছিলো পাকিস্তানে। কেবল শিখ ও হিন্দুদের অপমান করবার জন্যেই এই সব শরণার্থীদের চোখের উপর তাদের মন্দিরকে করা হয়েছিলো অশুচি, গুরুদ্বার হয়েছিলো অপবিত্র।" গান্ধীজী তাঁর অনশনভঙ্গের সর্ত্তস্বরূপ মসজিদগুলিকে খালি করে দিতে বলেছিলেন; কিন্তু পাকিস্তানের মুসলমানদের প্রতি অনুরূপ কোনো

সর্ত্ত আরোপ করেন নি। কারণ, এটুকু বোঝবার ক্ষমতা তাঁর ছিলো যে, এরূপ কোনো সর্ত্তে তিনি যদি অনশন করেন এবং তার ফলে যদি তাঁর মৃত্যুও হয় তবু পাকিস্তানের একটি মুসলমানও তাঁর জন্যে শোক প্রকাশ করবে না।

নাথুরাম বলেন, "কোনো ব্যক্তিগত কারণে গান্ধীজী ও আমার মধ্যে কোনো শত্রুতা ছিলো না। গান্ধীজীব পাকিস্তান সমর্থনের পেছনে ছিলো তাঁর শুভ উদ্দেশ্য, এ-কথা যাঁরা বলেন তাঁদের কাছে এইমাত্র আমি বলতে পাবি যে, জাতির কল্যাণ কামনা ভিন্ন গান্ধী-বিদ্বেষী হবার আমার আর কোনো কারণই ছিলো না। কারণ, যে-সকল মারাত্মক ঘটনা পাকিস্তান-সৃষ্টিতে পরিণতি লাভ কবেছে সে-সকলের জন্যে তিনি ছিলেন সর্ব্বাপেক্ষা দায়ী এবং কৈফিয়তি।"

গড্‌সে ছিলেন গান্ধীজীর অহিংস নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। তবে গড্‌সে এ-কথাও স্বীকার করতে প্রস্তুত যে, জাতির জন্যে মহাত্মা গান্ধী বহু দুঃখ ববণ করেছেন। লোক-চিত্তে জাগরণ এনেছিলেন তিনিই। ব্যক্তিগত লাভের আশায় কিছুই তিনি করেন নি। তবে অত্যন্ত বেদনার সঙ্গেই তিনি (গড্‌সে) বলছেন যে, সর্ব্বত্রই-যে অহিংস নীতির ব্যর্থতা ও পরাজয় ঘটছে—এ-কথা স্বীকার করবার মতো সততা গান্ধীজীব ছিলো না। ভারতের এমন অনেক বুদ্ধিদীপ্ত তেজস্বী দেশপ্রেমিকের কথা নাথুরাম জানেন যাঁদের ত্যাগ গান্ধীজীব চেয়েও অনেক বেশী।

"সে যাই হোক, গান্ধীজী দেশের যে-সেবা কবেছেন তার জন্যে শ্রদ্ধায় আমি মস্তক অবনত করি। গুলী করবার আগে সত্যিসত্যি আমি তাঁর উদ্দেশ্যে নতমস্তকে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলাম। কিন্তু এ-ও আমি বলবো যে, জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করে দেশকে দ্বিখণ্ডিত করবার অধিকার তাঁর মতো দেশ-সেবকেরও ছিলো না। কিন্তু গান্ধীজী

তা-ই করেছিলেন। এরূপ অপরাধীর বিচারের কোনো আইনসম্মত বিধি নেই বলেই অনন্যোপায় হয়ে গান্ধীজীকে গুলী করেছিলাম। কারণ, তা ছাড়া করবার আর কিছুই ছিলো না। এ-কাজ আমাকে না করতে হলেই ভালো হতো। কিন্তু অবস্থা ছিলো আমার আয়ত্তের বাইরে। মানসিক প্রেরণা আমার এমনি তীব্র হয়ে উঠেছিলো যে, আমি ভেবেছিলাম, এই লোকটিকে স্বাভাবিকভাবে মরতে দেওয়া উচিত নয়। জগতের সকলেই জানুক যে, দেশের এক ধর্ম্মান্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি অন্যায়রূপে জাতীয়তাবিরোধী বিপজ্জনক প্রীতি প্রদর্শনের প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে করতে হয়েছে নিজের জীবন দিয়ে। এই ব্যাপারের এবং লক্ষ লক্ষ নির্দোষ হিন্দুর প্রাণহানির অবসান ঘটাতে কৃতসংকল্প হয়েছিলাম আমি।"

"আমি দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছি যে, অন্যায় মুসলিম-পক্ষপাতিত্বের নীতির জন্যে বর্ত্তমান সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা ছিলো না আমার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এ-ও স্পষ্ট বুঝেছিলাম যে, এই নীতি গ্রহণের মূলে রয়েছে গান্ধীজীর চাপ। কিন্তু বর্ত্তমানে গান্ধীজীর চাপ অবর্ত্তমান, তাই যথার্থ ধর্ম্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগঠনের পথও আজ মুক্ত।"

হায়দ্রাবাদ-অভিযানের কথা উল্লেখ করে নাথুরাম বলেন, "সহজ বুদ্ধিতেই বোঝা যায়, গান্ধীজী যতোদিন বেঁচেছিলেন ততোদিন, সমস্ত শক্তি সত্ত্বেও, গভর্নমেণ্টের পক্ষে হায়দ্রাবাদের মতো একটি মুসলমান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনোরূপ কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন সম্ভবপর হয় নি। তখন যদি গভর্নমেণ্ট হায়দ্রাবাদের বিরুদ্ধে কোনো সামরিক বা পুলিশী ব্যবস্থা অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করতেন তবে পাকিস্তানের পঞ্চান্ন কোটি টাকা দানের সিদ্ধান্তের মতো ঐ সিদ্ধান্তকেও তাঁরা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হতেন; কেন না, তা হলে গান্ধীজী আরম্ভ করতেন আমৃত্যু অনশন, আর বাধ্য হয়েই সরকারকে বাঁচাতে হতো গান্ধীজীর প্রাণ।"

গড্‌সে বলেন যে, অভিযোগ গঠনে সঙ্গতি রক্ষিত হয় নি। দু'টি পৃথক বিচার হওয়া উচিত ছিলো—একটি ২০শে জানুয়ারির ঘটনা (প্রার্থনা সভায় বোমাবিস্ফোরণ) সম্পর্কে এবং অপরটি ৩০শে জানুয়ারির ঘটনা সম্পর্কে। আলাদা দু'টি ঘটনা একত্র মিশে যাওয়ার ফলে, উপরোক্ত বিধৃতি সত্ত্বেও সমগ্র বিচার মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। ২০শে জানুয়ারির ঘটনা সম্পূর্ণ আলাদা, ৩০শে জানুয়ারির ঘটনার সঙ্গে তার কোনো সংস্রব নেই। মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার জন্যে কোনো ষড়যন্ত্র হয় নি। সরকারপক্ষের সাক্ষ্যেও তা প্রমাণিত এবং সমর্থিত হয় নি। একমাত্র রাজসাক্ষী দিগম্বর বাদগেই ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন। "কোনোরূপেই-যে তাঁর সেই সাক্ষ্য নির্ভরযোগ্য নয়, আমার কৌঁসুলি যখন এই রাজসাক্ষী ও অন্যান্য সাক্ষীব সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করবেন, আদালতের নিকট তখনই তা প্রমাণিত হবে।"

লাইসেন্স ছাড়া বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ ও সরবরাহ এবং জানুয়ারির ঘটনা সম্পর্কে সাহায্য কববার অভিযোগ অস্বীকার করে গড্‌সে বলেন, "উক্ত অভিযোগ আমি অস্বীকার করি। আমি কোনো গান-কটন-স্ল্যাব, হাতবোমা, ডেটোনেটার, পিস্তল, রিভলবার, কার্তুজ প্রভৃতি বহন করি নি, সরবরাহও করি নি। ঐরূপ কোনো অস্ত্রশস্ত্র আমার অধিকারে ছিলোও না। ২০শে জানুয়ারির আগে বা সেইদিন, অথবা অন্য কোনদিন কোনো আসামীকেও ঐ কাজে আমি উৎসাহ দিই নি, বা সাহায্য করিনি।"

গড্‌সে বলেন, বাদগে নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছেন ; কারণ একমাত্র ঐ সর্তেই তিনি প্রতিশ্রুত মার্জনা লাভে সমর্থ হয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীকে হত্যার চেষ্টার অভিযোগ সম্পর্কে মদনলাল

বা অন্ত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যোগাযোগের কথাও অস্বীকার করেন নাথুরাম।

জানুয়ারি মাসে যখন তিনি দিল্লীতে এসেছিলেন তখন মূলত গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। কিন্তু শীগ্‌গীরই তিনি বুঝতে পারেন যে, তা একেবারেই নিরর্থক।

নাথুরামের যে-কার্য্যকলাপ পরিশেষে মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডে পর্য্যবসিত হয়েছিলো, শ্রীযুত সাভারকর তাঁর সেই কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন, একথাও অস্বীকার করেন গড্‌সে। একথাও সত্য নয় যে, আপ্তে অথবা তিনি নিজে (গড্‌সে) বাদগেকে বলেছিলেন, গান্ধীজী, নেহ্‌রু এবং সুরাবর্দ্দিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার আদেশ সাভারকর তাঁদের দিয়েছিলেন। "শেষ দর্শনে"র জন্যে বাদগেকে আমরা সাভারকর-ভবনে নিয়ে গিয়েছিলাম, অথবা সাভারকর আমাদের বলেছিলেন, 'কৃতকার্য্য হয়ে ফিরে এসো'—এর কোনোটাই সত্য নয়। আমার সুমুখে আপ্তে, বাদগেকে এমন কথা বলেন নি বা আমিও বলি নি বাদগেকে যে, সাভারকর আমাদের বলেছেন—গান্ধীজীর শতায়ু পূর্ণ হয়েছে, অতএব সাফল্য আমাদের সুনিশ্চিত। এরূপ আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করবার মতো কুসংস্কারও আমার নেই, এরূপ ভবিষ্য-দ্বাণীতে বিশ্বাস করবার মতো ছেলেমানুষও আমি নই।"

বিবৃতিটি পাঠ করতে গড্‌সের সময় লাগলো পাঁচ ঘণ্টা। প্রত্যেক ঘণ্টায় কিছুক্ষণের জন্যে তিনি বিশ্রাম গ্রহণ করছিলেন এবং জলপান করছিলেন। 'অখণ্ড ভারত অমর রহে' (অখণ্ড ভারত অমর হোক) ও 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনি করে তিনি তাঁর বিবৃতি পাঠ সমাপ্ত করেন।

বিবৃতি পাঠের পর শ্রীযুত দফ্‌তরি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন যে, উক্ত বিবৃতির মধ্যে কিছু কিছু অপ্রাসঙ্গিক কথা রয়েছে, আদালত সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করতে বাধ্য নন। বিবৃতির

যে-অনুচ্ছেদে গড্‌সে বলেছেন যে, মুসলমানদের প্রতি অন্যায় প্রীতি-প্রদর্শনের নীতির জন্যেই বর্ত্তমান সরকারের উপর তাঁর কোনো শ্রদ্ধা ছিলো না, শ্রীযুত দফ্‌তরি বিশেষভাবে তাঁর উল্লেখ করেন।

বিচারক: কয়েকটি অংশ পাঠ থেকে কেমন করে তাঁকে আমি নিবৃত্ত করতে পারি? আপনার কাছে তা অবান্তর হলেও তাঁর কাছে তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলে মনে হতে পারে। আমার মনে হয়, লিখিত বিবৃতি সম্পর্কে আমি সে-রকম কিছু করতে পারি না। ইউ-পি-তে (U. P.) গুরুত্বপূর্ণ মামলায় লিখিত-বিবৃতিই সর্ব্বদা দেওয়া হয়ে থাকে।

শ্রীযুত দফ্‌তরি: অপ্রাসঙ্গিক অংশগুলি লিপিবদ্ধ না করাই উচিত।

বিচারক: আমার মনে হয়, এরূপ করা যায় না।

৯ই নভেম্বর তারিখে বিচারপতি শ্রীযুত আত্মাচরণ, নাথুরাম গড্‌সেকে পাঁচঘণ্টাব্যাপী প্রশ্ন করেন। প্রশ্নোত্তরগুলি নিম্নে সংক্ষেপে উল্লিখিত হলো।

বিচারপতি: সাক্ষ্যে প্রকাশ পেয়েছে যে, ১০ই জানুয়ারি তারিখে সকাল দশটার সময় আপ্তে, বাদগেকে নিয়ে গিয়েছিলেন পুণার হিন্দু রাষ্ট্র আপিসে। সে-সময়ে আপনি আপিসে ছিলেন। বাদগে আপনাকে দু'টি গানে-কটন স্ল্যাব ও পাঁচটি হাতবোমা দিতে চেয়েছিলেন। আপ্তে তখন আপনাকে বলেন যে, 'আমাদের একটা কাজ শেষ হলো।' তারপর আপনি বেরিয়ে এলেন আপিস থেকে। আপনি এবং আপ্তে বাদগেকে বললেন যে, গান-কটন স্ল্যাব দু'টি ও হাতবোমা পাঁচটি যেন ১৪ই জানুয়ারি সন্ধ্যার মধ্যেই দাদারে হিন্দু মহাসভার আপিসে পৌছে দিয়ে আসবার ব্যবস্থা করা হয়। এ বিষয়ে আপনি কিছু বলতে চান?

গড্সে : ওরূপ কোনো ঘটনাই ঘটে নি।

প্রশ্ন : সাক্ষ্যে প্রকাশ যে, আপনি যথাক্রমে ১৩ই ও ১৪ই জানুয়ারি আপনার জীবনবীমার দু'টি পলিসির একটিতে আপ্তের পত্নী শ্রীযুক্তা চম্পূবাঈকে এবং অপরটিতে গোপালের পত্নী শ্রীযুক্তা সিন্ধুবাঈকে আপনার ওয়ারিশ মনোনীত করেন। এ-বিষয়ে আপনি কি বলতে চান?

গড্সে : এ-ঘটনা সত্য।

প্রশ্ন : সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে যে, ১৪ই জানুয়ারি তারিখে দাদার হিন্দু মহাসভা আপিসের নিকট বাদগে ও তাঁর ভৃত্য শঙ্করের সঙ্গে আপ্তে এবং আপনার দেখা হয়। বাদগের সঙ্গে একটি থলেতে ছিলো দু'টি গান-কটন-স্ল্যাব ও পাঁচটি হাতবোমা। তারপর শঙ্করকে সেখানে রেখে, আপনি, আপ্তে এবং বাদগে সাভারকর-ভবনের দিকে রওনা হন। সাভারকরের বাড়ী পৌছে ঐ থলেটি বাদগের কাছ থেকে গ্রহণ করে আপ্তে। অতঃপর আপনি এবং আপ্তে সাভাকরের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করেন। আবার পাঁচ-দশ মিনিট পরেই আপনারা দু'জনে থলে নিয়ে বেরিয়ে আসেন। এ-বিয়য়ে আপনার কিছু বক্তব্য আছে?

উত্তর : এ-ঘটনা সত্য নয়।

প্রশ্ন : তারপর আপনি, বাদগে, আপ্তে এবং শঙ্কর ভুলেশ্বরে দীক্ষিত মহারাজের নিকট যান। এ-বিষয়ে কিছু বলতে চান?

উত্তর : এ-কথা সত্য নয়।

প্রশ্ন : সাক্ষ্য থেকে জানা গেছে যে, ১৫ই জানুয়ারি তারিখ সকালে আপনি, আপ্তে, করকারে, মদনলাল, ও বাদগে দীক্ষিত মহারাজের বাড়ী গিয়েছিলেন। সেখানে থলেটি খোলা হয়। বাদগে তার ভিতরকার জিনিষগুলি দেখান। তাতে ছিলো দু'টি গান-কটন-স্ল্যাব, পাঁচটি হাতবোমা এবং ডেটোনেটার। বাদগে ও দীক্ষিত মহারাজ এ-সবের ব্যবহার-প্রণালী ব্যাখ্যা করেন। থলেটি দেওয়া হয় করকারের

হাতে। করকারে ও মদনলালকে সেদিনই সন্ধ্যায় দিল্লী যাত্রা করতে বলেন আপ্তে। পরে আপ্তে, বাদগেকে জিজ্ঞাসা করেন যে, বাদগে তাঁদের সঙ্গে দিল্লী যেতে প্রস্তুত আছেন কি না। আপ্তে তাঁকে আরো বলেন, সাভারকর স্থির করেছেন যে, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহ্‌রু ও জনাব সুরাবর্দ্দিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে, এবং সে-কাজের ভার তিনি দিয়েছেন আপ্তে ও আপনার উপর। বাদগে তাতে রাজি হলে, আপনি বলেন যে, আপনি পুণায় আপনার ভাই গোপালের সঙ্গে দেখা করতে চান। গোপাল একটি রিভলবার যোগাড় করে দেবার ভার নিয়েছিলেন। বাদগেকে আপনি জানান যে, গোপালকেও আপনি দিল্লীতে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে বোম্বাইয়ে নিয়ে আসতে চান। এ-বিষয়ে আপনার কিছু বক্তব্য আছে?

উত্তর: এ-ব্যাপার সর্ব্বৈব মিথ্যা।

প্রশ্ন: ১৬ই জানুয়ারি আপনি পুণায় দু'বার বাদগের বাড়ী যান। তারপর বাদগে আপনার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে যান হিন্দু রাষ্ট্র আপিসে। সেখানে আপনাদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয়। আলোচনাপ্রসঙ্গে তাঁকে আপনি জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি যেতে রাজি আছেন কি না। উত্তরে বাদগে জানান যে, তিনি রাজি। তখন আপনি একটি ছোটো পিস্তল বের করে তাঁকে দিয়ে, পরিবর্ত্তে একটি বড়ো রিভলবার আনতে বলেন। বড়ো রিভলবার পাওয়া গেলে পিস্তলটি নিয়ে তাঁকে বোম্বাই আসতে বলেন। এ-সম্বন্ধে আপনি কি বলতে চান?

উত্তর: এ-সমস্তই মিথ্যা। ১৬ই জানুয়ারি আমি পুণায় ছিলাম না।

প্রশ্ন: ১৭ই জানুয়ারি সকালে বি-এম-টি ১১০ নম্বর ট্যাক্সিতে করে আপনি, আপ্তে এবং বাদগে বোম্বাই ডাইং মিলস্, দাদার হিন্দু মহাসভা

আপিস, সাভারকর-সদন এবং আফজল পুরকার, পটঙ্কর ও কালের বাড়ী গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করেন।

উত্তর: এ-কথা সত্য যে, আপ্তে, বাদগে এবং আমি অর্থ সংগ্রহের জন্যে ট্যাক্সিতে করে বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলাম। আমরা সাভারকর-সদনে যাই নি।

প্রশ্ন: আপনি এবং আপ্তে "এন্. দেশপাণ্ডে" ও "এস্. দেশপাণ্ডে" ছদ্মনামে ১৭ই জানুয়ারি থেকে ২০শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত দিল্লীর ম্যারিনা হোটেলের ৪০ নম্বর ঘরে বাস করেছিলেন। কাচাবার জন্যে আপনি সেখানকার বেয়ারা কালীরামকে কিছু কাপড়-চোপড় দিয়েছিলেন।

উত্তর: হ্যাঁ, আপ্তে ও আমি ছদ্মনামে উক্ত সময়ে ম্যারিনা হোটেলের ৪০ নম্বর ঘরে বাস করেছিলাম। রেজিস্টারি বইয়ের লিখিতব্য বিষয় আমি নিজে লিখি নি। হোটেল-রেজিস্টারিতে যা লিখতে হয় তার কিছুই আমি লিখি নি, কিংবা আমার সুমুখে আপ্তেও কিছু লেখেন নি। কাচাবার জন্যে কালীরামকে আমি কাপড়-চোপড় দিয়েছিলাম।

প্রশ্ন: ১৯শে জানুয়ারি রাত্রে আপনি, আপ্তে ও করকারে নয়া দিল্লীর হিন্দু মহাসভা ভবনে বাদগের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন, এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়েছিলো। মদনলালও ছিলেন সেখানে।

উত্তর: এ-কথা সত্য নয়।

প্রশ্ন: ২০শে জানুয়ারি গোপাল গড্‌সে, মদনলাল, শঙ্কর ও বাদগে ম্যারিনা হোটেলের ৪০ নম্বর ঘরে এসেছিলেন। গোপাল গড্‌সে আপনার ঘরে একটি রিভলবার মেরামত করেন। বাদগে, আপ্তে করকারে ও মদনলাল আপনার ঘরের বাথরুমে গান-কটনস্ল্যাবে

প্রাইমার ও ফিউজ তার এবং হাতবোমায় ডোটোনেটার লাগান আপনি তাঁদের কাজকর্ম লক্ষ্য করেছেন। বাদগেকে বলেছেন, "বাঁদগে, এই আমাদের শেষ চেষ্টা। কাজ আমাদের শেষ করতেই হবে। দেখবেন—সব কিছুরই যাতে ঠিক-ঠিক ব্যবস্থা হয়।"

উত্তর : এ-সবই মিথ্যা।

প্রশ্ন : অস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্যগুলি আপনাদের মধ্যে কি ভাবে বণ্টিত হবে, অতঃপর তাই নিয়ে আলোচনা চলে। স্থির হয়, বিড়লা ভবনের প্রার্থনা সভায় আপনি ও আপ্তে সঙ্কেত জানাবেন, মদনলাল গান-কটন- স্ল্যাব বিস্ফোরণ ঘটাবেন এবং তাতে হে-গোলমালের সৃষ্টি হবে সেই সুযোগে অন্য ক'জন, মহাত্মা গান্ধীকে লক্ষ্য করে গুলী ও হাতবোমা ছুড়বেন।

উত্তর : এ একেবারেই মিথ্যা।

প্রশ্ন : আরো স্থির হয়েছিলো যে, ফটোগ্রাফারের ভাণ করে বাদগে, ছোট্টুরামের ঘরে ঢুকে, জালির ভেতর দিয়ে মহাত্মা গান্ধীকে লক্ষ্য করে গুলী ও হাতবোমা ছুড়বেন।

উত্তর : এ-কথা সত্য নয়।

প্রশ্ন : ২০শে জানুয়ারি বিকেল প্রায় পাঁচটায় আপ্তে, করকারে ও বাঁদগে বিড়লা ভবনের ভৃত্যাবাসের নিকটে ছিলেন। আপ্তে, বাদগেকে ফটোগ্রাফারের ভাণ করে ছোট্টুরামের ঘরে যেতে বলেন। সে-সময় আপনি ছিলেন সেখানে। বাদগে ঐ ঘরে ঢুকবার অনিচ্ছা প্রকাশ করলে আপনি তাঁকে বলেন যে, সকলেরই পলায়নের ব্যবস্থা ঠিক করে রাখা হয়েছে, অতএব তাঁর ভয় পাবার কিছু নেই।

উত্তর : এ-সকলই মিথ্যা। আমি বিড়লা ভবনে যাই নি।

প্রশ্ন : আপনি তারপর একটি ট্যাক্সিতে চড়ে বিড়লা ভবন থেকে কনট প্লেসে ফিরে আসেন। আপ্তে এবং গোপাল গড্সেও আপনার সঙ্গে ছিলেন সেই ট্যাক্সিতে।

উত্তর : সব মিথ্যা কথা।

প্রশ্ন : অতঃপর আপনি যান হিন্দু মহাসভা ভবনে। সেখানে গিয়ে বাদগেকে দেখতে পান।· আপ্তে ছিলেন আপনার সঙ্গে। ম্যারিনা হোটেলের অভ্যর্থনা-কেরাণীকে আপনি হোটেলবাসের বিল তৈরি করতে বলেন, এবং বিলের টাকাও আপনি শোধ করে দেন।

উত্তর : একথা সত্য নয়।

প্রশ্ন : ২৭শে জানুয়ারি তারিখে এয়ার ইণ্ডিয়া প্লেনে বোম্বাই থেকে দিল্লী যাবেন বলে 'ডি. নারায়ণ রাও' ও 'এন্. বিনায়ক রাও' ছদ্ম-নামে আপনি ও আপ্তে দু'টি আসন রিজার্ভ করেন ২৫শে জানুয়ারি তারিখে।

উত্তর : সত্য কথা। তবে রিজার্ভ করবার তারিখ সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নিশ্চিত নই।

প্রশ্ন : জানা গেছে যে, ২৭শে ও ২৮শে জানুয়ারি তারিখে গরিবা, জুম্মা, জগদীশপ্রসাদ গোয়েল ও মধুকর কেশব কালে আপনাকে এবং আপ্তেকে গোয়ালিয়রে দেখেছেন।

উত্তর : গোয়ালিয়রে এদের কাউকেই আমরা দেখি নি। ২৭শে জানুয়ারি রাত্রে এক্সপ্রেস গাড়িতে দিল্লী ছেড়ে আমরা গোয়ালিয়র যাত্রা করেছিলাম। ২৮শে তারিখে অতি প্রত্যূষে আমরা গোয়ালিয়রে পৌঁছেছিলাম। সেখানে আমরা ছিলাম রেল-স্টেশনের নিকটেই একটি ধর্ম্মশালায়।

প্রশ্ন : ২৮শে জানুয়ারি মধুকর কেশব কালে—আপ্তে এবং আপনাকে ডাঃ পারচুরের বাড়ীতে দেখতে পান। আপনাদের দু'জনার হাতেই ছিলো রিভলবার। ঘোড়া টিপছিলেন আপনারা। আপনার পিস্তল (৬০৬৮২৪ নং) সনাক্ত করে জগদীশপ্রসাদ গোয়েল বলেছেন যে, ঐ পিস্তলটি তাঁর, দণ্ডবতে সেটি নিয়ে গিয়েছিলো তাঁর কাছ থেকে; বলেছিলো, পিস্তলটিতে নাকি আপনার প্রয়োজন।

উত্তর : ২৮শে জানুয়ারি সকাল প্রায় সাড়ে সাতটার সময় দশ মিনিটের জন্যে আমি ডাঃ পারচুরের বাড়ীতে ছিলাম। বিকেল প্রায় চারটের সময়ও সেখানে ছিলাম বোধ করি পঁয়তাল্লিশ মিনিটের জন্যে। আপ্তে ছিলেন আমার সঙ্গে। কোনোবারেই মধুকর কেশব কালের সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। পিস্তলটি জগদীশপ্রসাদ গোয়েলের,—এ-কথা সত্য নয়। দণ্ডবতের মারফত সেটি পেয়েছিলাম—তাও সত্য নয়। আপ্তে ও আমি যে কেন গোয়ালিয়রে গিয়েছিলাম, আমার বিবৃতিতে ইতিপূর্ব্বেই আমি তা বলেছি।

প্রশ্ন : ২৯শে জানুয়ারি দিল্লী প্রধান রেলওয়ে স্টেশনে এন. বিনায়ক রাও নামে আপনি একটি বিশ্রাম-কক্ষ ভাড়া করেছিলেন। বুকিং আপিসে আপ্তেও ছিলেন আপনার সঙ্গে, করকারেও ছিলেন। কাচাবার জন্যে হরিকিষণকে কিছু কাপড়-চোপড় দিয়েছিলেন আপনি। হরিকিষণ সেগুলি দিয়েছিলো জন্নুকে। বিশ্রাম-কক্ষে আরো কিছুদিন থাকবার জন্যে আপনি সময় চেয়েছিলেন, কিন্তু আপনাকে তার অনুমতি দেওয়া হয় নি। অতঃপর ৩০শে জানুয়ারি আপনি প্রথম শ্রেণীর ওয়েটিং রুমে আপনার মালপত্র সরিয়ে আনেন। জন্নু আপনার জুতা পালিশ করে দেয়। ২৯শে ও ৩০শে তারিখ আপ্তে এবং করকারেকেও দেখা গিয়েছিলো আপনার সঙ্গে সেই বিশ্রাম-কক্ষে।

উত্তর : ২৯শে তারিখে এন. বিনায়ক রাও নামে দিল্লী মেন রেল স্টেশনে কোনো বিশ্রাম-কক্ষ আমি ভাড়া করি নি। আপ্তেও সে-সময় আমার সঙ্গে ছিলেন না। ধোওয়াবার জন্যে হরিকিষণকেও আমি কাপড়-চোপড় দিই নি। জন্নুকে দিয়ে জুতা পালিশও করাই নি, কারণ পালিশ করাবার মতো জুতা আমার ছিলো না। আমি ক্যানভাসের জুতা পরেছিলাম। আপ্তে ও করকারের সঙ্গে সেখানে দেখা হয় নি আমার। গোয়ালিয়রেই আপ্তের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়েছিলো।

প্রশ্ন : অমরনাথ, নন্দলাল মেহ্‌তা, ধরম সিং রঘুনাথ নায়েক ও সর্দার গুরুবচন সিং তাঁদের সাক্ষ্যে বলেছেন যে, ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় মহাত্মা গান্ধীকে লক্ষ্য করে আপনি পর-পর অতি দ্রুত তিনবার পিস্তলের গুলী করেন। চার-রাউণ্ড গুলীসহ সেই পিস্তলটি আপনার কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। কর্নেল তানেজা বলেছেন, পিস্তলের গুলীর আঘাতেই মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু হয়েছে।

উত্তর : প্রার্থনা সভায় মহাত্মা গান্ধীর সুমুখে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমি। আর-কেউ যাতে আহত না হন সেই জন্যেই অতি নিকট থেকে আমি গুলী করতে চেয়েছিলাম। পিস্তল হাতে নিয়ে আমি তাঁকে অভিবাদন জানাই। আমার বুশ-কোটের ভিতর-দিককার পকেট থেকে পিস্তলটি বের করবার সময়েই তার 'সেফ্‌টি ক্যাচ'টি অপসারিত করেছিলাম। আমার মনে হয়, আমি দু'বার গুলী করেছিলাম। কিন্তু পরে জানতে পারি যে, আমি গুলী করেছিলাম তিনবার। গুলী করবার পর প্রায় আধ মিনিট ধরে গভীর স্তব্ধতা বিরাজ করছিলো সেখানে। উত্তেজিত হয়ে আমি তখন চীৎকার করে উঠেছিলাম,—"পুলিশ ! পুলিশ !" যতো দূর মনে পড়ে, অমরনাথ আমাকে ধরে ফেলেছিলেন। অব্যবহিত পরেই আরো-একজন কনেস্টবল এসে আমাকে ধরে। সঙ্গে সঙ্গে জনতা থেকে কয়েকজন এসে আমার হাত থেকে পিস্তলটি কেড়ে নেয়। তারপর বহু লোকই আমাকে এসে ধরে। রঘুনাথ নায়েক (বাগানের মালী) আমাকে তার খুরপো দিয়ে মোটেই মারে নি। একজন ভদ্রলোক তাঁর লাঠি দিয়ে আমার মাথার পেছনে আঘাত করেছিলেন। দু'তিনটি আঘাতের পরেই আমার মাথা থেকে রক্তস্রাব হতে থাকে। আমি তাঁকে বলি যে, আমার মাথার খুলি ভেঙে গেলেও আমি তাঁকে বাধা দেবো না। আমি যা করতে চেয়েছিলাম তা করেছি, তার জন্যে কোনো

দুঃখ নেই আমার। পুলিশ তারপর জনতার মাঝখান থেকে আমাকে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে। আমি দেখতে পাই, একজন লোক আমার পিস্তলটি হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। যে-ভাবে তিনি সেটিকে নাড়াচাড়া করছিলেন তা দেখে আমার মনে হলো যে, তিনি কখনো পিস্তল হাতে করেন নি। তাকে আমি সেফ্‌টি ক্যাচটি ঠিকভাবে লাগিয়ে দিতে বলি, অন্যথা তাঁর কিংবা জনতার মধ্যে আর-কারো আহত হবার আশঙ্কা ছিলো। সেই লোকটি তখন বলেন যে, তিনি আমাকে গুলী করতে চান। আমি বলি, তাতেও আমি কিছু মনে করবো না; তবে আমি যা বলেছিলাম, সে কেবল তাঁবই ভালোর জন্যে। অমরনাথ তখন বললেন যে, আমি যা বলছি তা যথার্থ। পুলিশ তখন পিস্তলটি নিয়ে নেয়। গুরুবচন সিং যে বলেছেন, তিনি আমার হাত ধরেছিলেন, এ-কথা ভুল। ঘণ্টা দুই পর, আমার নাড়ী ও হৃৎপিণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় আছে কি না তাই পরীক্ষা করবার জন্যে আমি একজন ডাক্তার ডাকতে বলি। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করে বলেন যে, তা স্বাভাবিক অবস্থাতেই আছে।

প্রশ্ন: ১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারি ম্যারিনা হোটেলের চল্লিশ নম্বর ঘরে আপনার ও আপ্তের সঙ্গে করকারে ও শঙ্কর একত্রে চা পান করেছিলেন। ১৭ই ও ১৮ই জানুয়ারি ঐ ঘরেই করকারে হুইস্কি পান করেছিলেন। হুইস্কি বিক্রির কথা আদালতে প্রদর্শিত বি/৭০ (হোটেলের রসিদ) থেকেই প্রমাণিত হয়। এ-বিষয়ে আপনার কি বলবার আছে?

উত্তর: ২০শে জানুয়ারি আমার ঘরে, শঙ্কর বা করকারে, কাউকে আমি দেখি নি। অতিরিক্ত দু'টি চায়ের অর্ডার সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারবো না। চা আমি কোনোকালেই পান করি না; কখনো-সখনো কফি পান করি। আমার সম্মুখে কাউকে কোনো পানীয় মাদক দেওয়া হয় নি। আমার ঘরে করকারেকে কখনো দেখি নি। ম্যারিনা হোটেলে কখনো আমি মাদক পানীয় গ্রহণ করি নি।

দিল্লী ও বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সনাক্তকরণ প্যারেড সম্পর্কে কিছু বক্তব্য আছে কি না, প্রশ্ন করায় নাথুরাম বলেন, ম্যারিনা হোটেলের সাক্ষীদের সম্বন্ধে তিনি কিছু বলতে চান না। তবে সুলোচনা দেবী ও ছোট্টুরাম—এই দু'জন সাক্ষীকেই তোঘলক রোড থানায় গড্‌সেকে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। সুরজিৎ সিংকেও সেই থানায় তিনি দেখেছিলেন বটে, কিন্তু অপরাধ স্বীকার করবেন স্থির করেছিলেন বলে সনাক্তকরণ সম্বন্ধে কোনো আপত্তি জানান নি তিনি। অন্যান্য আসামীদের সনাক্তকরণ সম্পর্কে তাঁর কিছুই বলবার নেই। তবে অস্পষ্টভাবে তাঁর মনে পড়ে যে, বোম্বাইয়ে মধুকর কেশব কালে তাঁকে দেখেছিলেন গোয়ালিয়রের জনৈক পুলিশ-অফিসারেব সঙ্গে, আর জুম্মা তাঁকে দেখেছিলো দিল্লীর একজন পুলিশ-অফিসাবের সঙ্গে।

প্রশ্ন : সরকারপক্ষ থেকে আপনার বিরুদ্ধে যে-সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা হয়েছে সেই সম্পর্কে আপনার কিছু বক্তব্য আছে? এই সকল সাক্ষীরা কেন আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে, সে-সম্পর্কে আপনার কিছু বলবার আছে কি?

উত্তর : জগদীশপ্রসাদ গোযেলকে (সবকারপক্ষেব ৩৯নং সাক্ষী) কখনো আমি দেখি নি। এই সাক্ষীকে আমায দেখিযেছিলেন খান সাহেব ওমর খান। খান সাহেব আমায় বলেছিলেন, যে-পিস্তল দিয়ে মহাত্মা গান্ধীকে আমি গুলী করেছিলাম সেই পিস্তলটি এই ব্যক্তির। ঐ ব্যক্তিকে আমি বলেছিলাম সত্য কথা বলতে,—আব কিছু নয়, শুধু সত্য কথা। তারপর আমাকে অন্যত্র নিযে যাওযা হয। দাদা মহারাজেব সঙ্গে আমাব বন্ধুত্ব ছিলো। দীক্ষিত মহারাজ ছিলেন শুধু আমার পরিচিত। যে-কারণে এই দু'জন আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন, আমার মনে হয, তার প্রথম কারণ হচ্ছে এই যে,—মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হয়, তা তাঁদের মনঃপূত ছিলো না; এবং দ্বিতীয় কারণ এই যে, তাঁরা ভেবেছিলেন, আমার বিরুদ্ধে

সাক্ষ্য না দিলে তাঁরাও এই মামলায় জড়িত হতে পারেন। বসন্ত গজানন যোশী নিশ্চয় বোম্বাই-পুলিশের চাপে পড়েই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন। গ্রেফ্‌তারের পর বাদগে বোম্বাই-পুলিশের হাতে নির্য্যাতিত হয়েছিলেন। হত্যাকাণ্ডের পর কতকগুলি সংবাদপত্র মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অনেক লেখালেখি করেছেন। মনে হয়, এই সমস্ত কারণেই বাদগে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন।

প্রশ্ন : আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে আপনি কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করতে চান কি ?

উত্তর : আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে আমি কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করতে চাই না।

চুয়াল্লিশ

আপ্তের কথা

৯ই নভেম্বর, অন্যতম আসামী আপ্তে আদালতে একটি লিখিত বিবৃতি পাঠ করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "আমি নির্দ্দোষ, অতএব প্রার্থনা করি—আমাকে মুক্তি দেওয়া হোক। গান্ধীজীকে হত্যা করবার জন্যে আসামীদের মধ্যে কোনোরূপ চুক্তি ও ষড়যন্ত্র হয় নি। এ-সম্পর্কে সরকারপক্ষ যা বলেছেন, তার কোনোই ভিত্তি নেই।"

আপ্তে স্বীকার করেন যে, গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর বিরোধ ছিলো শুধু নীতিগত। গান্ধীজীর প্রতি দৈহিক আক্রমণাত্মক কোনো মনোবৃত্তি কখনো তাঁর মনে ঠাঁই পায় নি। গান্ধীজীর মৃত্যুসংবাদে তিনি গভীর মর্ম্মবেদনা অনুভব করেছিলেন।

গান্ধী-হত্যার কাহিনী

হিন্দু মহাসভার কর্ম্মী হিসাবে নাথুরামের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ১৯৪১ সালে পুণায়। ১৯৪৪ সালে পাঁচগণিতে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় এবং ১৯৪৬ সালে, কি তার কাছাকাছি সময়ে, দিল্লীর ভাঙ্গী কলোনিতে গান্ধীজীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন তিনি। ভারত বিভাগের প্রস্তাব এবং "গান্ধীজীর মুস্‌লিম-পক্ষপাতিত্ব-নীতির অনুবৃত্তি"র প্রতিবাদেই প্রদর্শিত হয়েছিলো ঐ বিক্ষোভ।

পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দেবার জন্যে গান্ধীজী ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র সরকারকে বাধ্য করতে চাইছেন, এই বিশ্বাসেই আপ্তে ভেবেছিলেন যে, গান্ধীজীর অনশনের বিরুদ্ধে দিল্লীতে কোনোরূপ বিক্ষোভ প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। এ-সম্পর্কে আপ্তের বিবৃতির ভাষা হচ্ছে—"এ-সম্বন্ধে আমি আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু গড্‌সের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। পরামর্শে স্থির হয় যে, দিল্লীতে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় কোনোরূপ শান্তিপূর্ণ অথচ কার্য্যকরী বিক্ষোভ প্রদর্শন অবশ্য কর্ত্তব্য।"

তাঁতিয়া রাও স্থির করেছেন যে, গান্ধীজী, পণ্ডিত জওহরলাল ও জনাব সুরাবর্দ্দিকে খতম করতে হবে এবং সে-কাজের ভার তিনি তাঁদের (আপ্তে ও গড্‌সের) উপর দিয়েছেন,—এমন কোনো কথা তিনি বাদগেকে কোনোদিন বলেছেন বলে আপ্তে অস্বীকার করেন। ১৭ই জানুয়ারি গড্‌সে ও আপ্তে, শ্রীযুত সাভারকরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, তাও মিথ্যে। ২০শে জানুয়ারি সকালে বাদগের সঙ্গে তিনি বিড়লা ভবনেও যান নি। সেদিন সন্ধ্যার সময় গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় তিনি গিয়েছিলেন বটে,—সে কেবল বিক্ষোভ প্রদর্শনের কোনো সুযোগ আছে কি না, তাই জানবার জন্যে। প্রার্থনা সভায় পৌঁছে তিনি দেখতে পান যে, মাইক্রোফোন ঠিক মতো কাজ করছে না, অতএব তিনি যে-ভাবে চেয়েছিলেন সে-ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের

কোনো সম্ভাবনাই নাই। সুতরাং সে-আশা পরিত্যাগ করে তিনি বিড়লা ভবন থেকে চলে আসেন।

বিড়লা ভবনে মদনলালকে গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে, এই সংবাদে আপ্তে অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েন; স্থির করেন—দিল্লী ছেড়ে বোম্বাই চলে যাওয়াই সমীচীন। বোম্বাইয়ে নাথুরামের সঙ্গে 'পরিস্থিতি' সম্বন্ধে আলোচনা হয় তাঁর। দু'জনেই বুঝতে পারেন, শীগগীরই তাঁদের গ্রেফ্‌তার হবার সম্ভাবনা আছে। তখন তাঁরা ঠিক করেন যে, গ্রেফ্‌তার হবার আগে দিল্লীতে আর-একবার তাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করবেন। আপ্তে লক্ষ্য করেছিলেন যে, কিছুদিন থেকেই গড্‌সে কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক; তাঁকে দেখে মনে হতো, বিক্ষোভ প্রদর্শনে তিনি যেন অনিচ্ছুক।

আপ্তে বলেন, নাথুরাম গড্‌সে ও দণ্ডবতের মধ্যে পিস্তল দেয়া-নেয়ার কথা কিছুই তিনি জানেন না। ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি তিনি বোম্বাইয়ে পৌঁছেন। সেদিন সন্ধ্যায় তিনি গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনতে পান। সেই রাত্রেই, কি তার পরদিন সকালে, খবরের কাগজ পড়ে তিনি জানতে পারেন যে, গান্ধীজীর হত্যা সম্পর্কে গড্‌সেকে গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে।

তারপর—আপ্তের কথাতেই বলি,—"আমার মনে হলো—নাথুরামের সাহায্যের জন্যে তখুনি আমার দিল্লী যাওয়া উচিত। পরে আরো কিছু চিন্তার পর ভাবলাম—দিল্লী গেলে মূর্খের মতো কাজ করা হবে। এই মানসিক দ্বন্দ্বের মধ্যে কোনো কিছুই স্থির করতে পারলাম না। এই সময়ে বোম্বাইয়ে গ্র্যাণ্ট রোড রেলওয়ে স্টেশনে আমার সঙ্গে দেখা হলো মিস্ মনোরমা সালভার। মিস্ সালভা তখন কলেজে যাচ্ছিলেন। "গড্‌সের পক্ষ সমর্থনের ব্যবস্থার জন্যে দিল্লী যাচ্ছি"—হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারির নিকট এই মর্মে একটি টেলিগ্রাম করে দেবার জন্যে তাঁকে অনুরোধ জানালাম আমি।

"১৯৪৮ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি, কি তার কাছাকাছি সময়ে, পুণায় হিন্দুরাষ্ট্র আপিসের, পোস্ট বক্স নং ৫০৩, ঠিকানায় একটি পত্র পাওয়া গেলো। এনভেলাপের লেখা থেকে বোঝা গেলো—পত্রটি এসেছে গড্‌সের কাছ থেকে, এবং সেটি দিল্লীতে ডাকে ফেলা হয়েছে ৩০শে জানুয়ারি তারিখে। চিঠিটি লেখা হয়েছিলো আমাকেই, আর চিঠির ভেতর ছিলো গড্‌সের একটি ফটো।

"ঐ পত্রে গড্‌সে লিখেছেন যে, দিল্লীতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে পুণা অথবা বোম্বাই থেকে স্বেচ্ছাসেবক আনবার ব্যবস্থা বাতিল করা উচিত; কারণ অতীত অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সামান্য রকমের বিক্ষোভ প্রদর্শনের সমস্ত প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে গেছে। পত্রে আরো লেখা ছিলো যে,—পত্র-লেখকের মানসিক অবস্থা অত্যন্ত উত্তেজিত, লেখক নিজেই এ-সম্বন্ধে একটা শেষ ও চরম ব্যবস্থা অবলম্বনের স্থির সিদ্ধান্ত করেছেন; এবং দু'-এক দিনের মধ্যেই আপ্তে তাঁর সেই চরম কাজের কথা জানতে পারবেন।"

আপ্তে এই কথা বলে তাঁর বিবৃতি শেষ করেন,—"আমার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হয়েছে, সরকারপক্ষ তার কোনোটাকেই প্রমাণ করতে পারেন নি। আমি সম্পূর্ণ নির্দোষ। প্রার্থনা করি, আমাকে মুক্তি দেওয়া হোক।"

পরের দিন বিচারক আপ্তেকে কতকগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। প্রশ্নোত্তরগুলো সংক্ষেপে লিখিত হলো :

বিচারক : জানুয়ারি মাসের দশ তারিখে বেলা প্রায় দশটার সময় আপনি বাদগেকে পুণা হিন্দু রাষ্ট্র আপিসে নিয়ে যান। সেখানে গিয়ে দু'টি গানকটন স্ল্যাব ও পাঁচটি হাতবোমা সরবরাহের অনুরোধ জানান তাঁকে। বাদগে তাতে রাজি হলে, নাথুরাম গড্‌সেকে আপনি বলেন যে, আপনাদের একটা কাজ শেষ হলো। জিনিষগুলো যাতে ১৪ই

জানুয়ারি সন্ধ্যার মধ্যেই দাদার হিন্দুসভা আপিসে পৌঁছয়, আপনারা দু'জনেই তখন বাদগেকে সেই ব্যবস্থা করতে বলেন।

আপ্তে: এ-সমস্তই মিথ্যা।

আপ্তে স্বীকার করেন যে, ১৪ই জানুয়ারি তিনি এবং নাথুরাম, মিস্ শান্তা মোদকের সঙ্গে ট্রেনের একই কামরাতে পুণা থেকে বোম্বাই পর্য্যন্ত ভ্রমণ করেছিলেন। শান্তা মোদক তাঁর ভাইয়ের 'জীপে' করে তাঁদের দু'জনকেই দাদার-স্টেশন থেকে সাভারকর-সদনের বিপরীত দিকে নামিয়ে দেন। সেখান থেকে তাঁরা সাভারকরের বাড়ী যান নি, গিয়েছিলেন সাভারকর-সদনের বিপরীত-দিকে-অবস্থিত কেটকারের বাড়ীতে।

প্রশ্ন: সেদিন সন্ধ্যায় দাদারে হিন্দু মহাসভা আপিসের কাছে বাদগের সঙ্গে আপনাদের দু'জনেরই দেখা হয়। বাদগেকে নিয়ে আপনারা যান সাভারকরের বাড়ীতে। বিস্ফোরকদ্রব্যপূর্ণ-বলে -কথিত ব্যাগটি নিয়ে আপনি ও গড্সে চলে যান বাড়ীর ভিতরে। পাঁচ-দশ মিনিট পরেই আবার ব্যাগটি নিয়ে ফিরে আসেন।

উত্তর: এসকল একেবারেই মিথ্যে। ১৪ই জানুয়ারি বাদগের সঙ্গে আমাদের দেখাই হয় নি।

বাদগেকে নিয়ে তাঁদের দীক্ষিত মহারাজের বাড়ী যাবার কথা, সেখানে বিস্ফোরকের থলেটি রাখবার কথা, রাহা খরচ বাবদ বাদগেকে পঞ্চাশ টাকা দেবার কথা—সমস্তই অস্বীকার করেন আপ্তে।

প্রশ্ন: ১৫ই জানুয়ারি সকালে আপনি, নাথুরাম গড্সে, শঙ্কর ও বাদগে শিবাজী প্রিন্টিং প্রেসে যান। সেখানে করকারের সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়। আপনি, নাথুরাম ও করকারে প্রেসের ভিতরে শ্রী জি. এম. যোশীর সঙ্গে আলাপ করেন। তারপর সকলেই আপনারা ফিরে আসেন দাদারে হিন্দু মহাসভা আপিসে। আপনি, নাথুরাম,

করকারে, মদনলাল ও বাদগে অতঃপর একটি ট্যাক্সিতে করে দীক্ষিত মহারাজের বাড়ী যান। মদনলালের বিছানাপত্র ছিলো সেই ট্যাক্সিতেই। সেখানে গিয়ে বিস্ফোরকের ব্যাগটি এনে খোলা হয়। তার ভিতরে ছিলো দু'টি গান্‌কটন স্ল্যাব, পাঁচটি হাতবোমা, ডেটোনেটার ইত্যাদি। বাদগেই সব জিনিষগুলো দেখিয়ে দেন। দীক্ষিত মহারাজ এবং বাদগে সেগুলোর ব্যবহার এবং কার্য্যকারিতাও ব্যাখ্যা করেন। আপনি তারপর জিনিষগুলো সমেত ব্যাগটি করকারের হাতে দিয়ে করকারে ও মদনলালকে সেইদিনেই সন্ধ্যায় দিল্লী রওনা হয়ে যেতে বলেন।

উত্তর: সব মিথ্যে।

প্রশ্ন: দীক্ষিত মহারাজের বাড়ীর প্রাঙ্গণে নাথুরামের সাক্ষাতে বাদগেকে আপনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, তিনি আপনাদের সঙ্গে দিল্লী যেতে প্রস্তুত আছেন কি না। আরো বলেছিলেন যে, সাভারকর স্থির করেছেন, মহাত্মা গান্ধী, জওহরলাল নেহ্‌রু ও সুরাবর্দ্দিকে খতম করতে হবে; এবং সাভারকর সে-কাজের ভার দিয়েছেন নাথুরাম ও আপনার উপর।

উত্তর: এ-সবই মিথ্যে।

আর-একটি প্রশ্নের উত্তরে আপ্তে স্বীকার করেন যে, ১৭ই জানুয়ারি তিনি এবং নাথুরাম এয়ার ইণ্ডিয়া প্লেনে বোম্বাই থেকে দিল্লী গিয়েছিলেন। সে-সময়ে তাঁদের ছদ্মনাম গ্রহণের কারণ সম্বন্ধে আপ্তে বলেন, "১৫ই জানুয়ারি দু'খানা সিট রিজার্ভ করবার জন্যে আমি এয়ার ইণ্ডিয়া আপিসে গিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে একটি লোকর সঙ্গে আমার দেখা হয়। তাঁর কাছে ১৭ই জানুয়ারির টিকিট ছিলো দু'খানা। তিনি গিয়েছিলেন সেই টিকিট দু'টি বাতিল করতে। আমি তাঁর কাছ থেকে টিকিট দু'খানা কিনে নিই। এই কারণেই আমাকে ও নাথুরামকে

"ডি. এন. করমাকার" ও "এস্. মারাঠা" নামে প্লেনে ভ্রমণ করতে হয়েছিলো। তা ছাড়া বুকিং আপিস থেকে টিকিট কিনলেও আমাকে অন্য নামে তা কিনতে হতো। কারণ, সরকার আমাদিগকে ইতিপূর্ব্বেই এই বলে শাষিয়েছিলেন যে, ভবিষ্যতে যদি "অগ্রণী" কিংবা "হিন্দুরাষ্ট্র" পত্রিকায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাকর অথবা হিংসা ও সংগ্রাম-মূলক কোনো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তবে সরকার কেবল জামানত তলব করেই ক্ষান্ত হবেন না, আমাদিগকে আইনত অভিযুক্তও করবেন। অতএব দিল্লীতে পৌছানর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমাদের পরিচয় গোপন রাখতে চেয়েছিলাম আমরা।"

আর-একটি প্রশ্নের উত্তরে আপ্তে বলেন যে, ১৭ই জানুয়ারি তাঁর ও নাথুরামের সঙ্গে রেলওয়ে স্টেশনে বাদগের দেখা হয়েছিলো। হিন্দুরাষ্ট্র ভাণ্ডারের জন্যে এবং দিল্লী যাবার খরচ সংগ্রহ করবার জন্যে একটি ট্যাক্সি ভাড়া করে তাঁরা বোম্বাই ডাইং মিলস্ এবং পটঙ্কর ও কালের বাড়ী গিয়েছিলেন। সেদিন তাঁরা সাভারকর কিংবা দীক্ষিত মহারাজের বাড়ী যান নি।

প্রশ্ন: ট্যাক্সিতে নাথুরাম আপনাদের বলেছিলেন যে, আপনাদের সকলেরই তাঁতিয়া রাও-এর কাছে গিয়ে তাঁর শেষ "দর্শন" লাভ করা উচিত। আপনি, নাথুরাম, শঙ্কর ও বাদগে অতঃপর সাভারকরের বাড়ী যান। সেখানে গিয়ে আপনি ও নাথুরাম চলে যান বাড়ীর উপরতলায়। একটু পরেই আপনারা ফিরে আসেন, পেছনে পেছনে সাভারকরও এসেছিলেন। আপনাদের দু'জনের উদ্দেশ্যেই সাভারকর তখন বলেন, "কৃতকার্য্য হয়ে ফিরে এসো।"

উত্তর: সব কথাই মিথ্যে।

প্রশ্ন: ট্যাক্সিতে আপনি বলেছিলেন যে, তাঁতিয়া রাও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—গান্ধীজীর শতায়ু পূর্ণ হয়েছে, আপনাদের কাজ-যে সফল হবে, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

উত্তর : সব কথাই মিথ্যে

আপ্তে আরো বলেন যে, সী গ্রী া হোটেল থেকে নাথুরামকে তিনি গাড়িতে তুলে নিয়েছিলেন এবং তাঁকে নাবিয়ে দিয়েছিলেন এয়ার ইণ্ডিয়া আপিসের সুমুখে। কোনো মহিলাকে তিনি সী গ্রীন হোটেল থেকে গাড়িতে তোলেন নি, বা তাঁকে মিউনিসিপ্যাল আপিসের সুমুখে নামিয়েও দেন নি। তা ছাড়া দীক্ষিত মহারাজের বাড়ীতে যান নি, কিংবা কোনো পিস্তলও চান নি তাঁর কাছে।

২০শে জানুয়ারি সকালে, রিভলবার পরীক্ষা করবার জন্যে, গোপাল গড্‌সে, শঙ্কর ও বাদগের সঙ্গে তিনি হিন্দু মহাসভা আপিসের পেছন দিকের জঙ্গলে যান নি। একথাও সত্য নয় যে, বাদগে, গোপাল গড্‌সে, মদনলাল, করকারে ও আপ্তে ম্যারিনা হোটেলের চল্লিশ নম্বর ঘরে গিয়ে নিজেদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র বিতরণ করেছিলেন, কিংবা ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন, অথবা পোষাক পরিবর্তন করেছিলেন। একথাও ঠিক নয় যে, হোটেলে স্থির হয়েছিলো,—প্রার্থনা সভায় তিনি ও গড্‌সে সঙ্কেত জানাবেন, অমনি মদনলাল গান-কটন-স্ল্যাব বিস্ফোরণ করবেন, সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য সকলেই মহাত্মা গান্ধীকে লক্ষ্য করে রিভলবার ও হাতবোমা ছুড়বেন, বাদগে ফটোগ্রাফারের ভাণ করে বিড়লা ভবনের ভৃত্যাবাসের একটি কক্ষে প্রবেশ করে মহাত্মা গান্ধীর দিকে হাতবোমা ও রিভলবার ছুড়বেন।

বেলা সাড়ে চারটের সময় আপ্তে হোটেল থেকে বিড়লা ভবনে যাত্রা করেন। সে-সময় গড্‌সে মাথাধরায় শয্যাগত ছিলেন। হোটেল থেকে বেরিয়েই শঙ্কর ও বাদগের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর। শঙ্কর ও বাদগে যাচ্ছিলেন বিড়লা ভবনে। তাঁদের দু'জনকে তিনি তাঁর গাড়িতে তুলে নেন এবং পেছনের প্রবেশদ্বার-পথে বিড়লা ভবনের প্রার্থনা সভায় প্রবেশ করেন। প্রার্থনা সুরু হতেই দেখা গেলো, লাউড স্পীকারটি ঠিকমতো কাজ করছে

না। তাঁর মনে হয়, বিক্ষোভ-প্রদর্শনের উপযুক্ত সময় এ নয়। গড্‌সের কাছে ফিরে গিয়েও এই কথাই তিনি বলেন।

বিড়লা ভবনের বিস্ফোরণের পর বাদগের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে তিনি ও গড্‌সে কখনো হিন্দু মহাসভা ভবনে যান নি। আপ্তে বলেন, "সত্যিকথা বলতে গেলে, বাদগে ম্যারিনা হোটেলে এসেছিলেন বিস্ফোরণের পর। অত্যন্ত ভয় পেয়েছিলেন তিনি। তিনি আমাকে বলেন যে, বোমা-বিস্ফোরণ সম্পর্কে মদনলাল নামে একজন আশ্রয়প্রার্থীকে বিড়লা ভবনে গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে। বাদগে তারপর বলেন যে, তিনি সটান পুণা চলে যাচ্ছেন, কারণ তাঁর পক্ষে দিল্লীতে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। পরে নাথুরামের কাছে গিয়ে আমিও বাদগে-বর্ণিত বৃত্তান্ত খুলে বলি। নাথুরাম তখনও শয্যাগত ছিলেন। আমরা দু'জনেই দিল্লী পরিত্যাগ করবো, স্থির করি। মদনলাল, বাদগের নাম বলে দিতে পারেন, এ সম্ভাবনা খুবই ছিলো; এবং বাদগে ধৃত হলে তিনি (বাদগে) আমাদের নামও প্রকাশ করতে পারেন, কারণ, বোম্বাই থেকে তিনজনেই আমরা দিল্লী এসেছিলাম বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে।"

২০শে জানুয়ারি আপ্তে ও নাথুরাম রাত্রির ট্রেনে দিল্লী থেকে কানপুরে যান। ২৩শে তারিখে তাঁরা ছিলেন বোম্বাই আর্য্যপথিক আশ্রমে, এবং ২৪শে থেকে ২৭শে পর্য্যন্ত ছিলেন বোম্বাই এলফিনস্টোন হোটেল অ্যানেক্সিতে।

প্রশ্ন : এলফিনস্টোন হোটেল অ্যানেক্সিতে কি আপনি, "এন. বিনায়ক রাও এবং তাঁর বন্ধু", এই ছদ্মনামে বাস করেছিলেন?

উত্তর : হ্যাঁ।

আর-একটি প্রশ্নের উত্তরে আপ্তে বলেন যে, ২৫শে জানুয়ারি রাত ন'টার সময় থানায় জি. এম. যোশীর বাড়ীতে তিনি যান নি, সেখানে করকারে ও গোপাল গডসের সঙ্গেও দেখা হয় নি তাঁর। সেদিন রাত

ন'টার সময় গোবিন্দ মালেকার তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন এলফিনস্টোন হোটেলে।

অন্য একটি প্রশ্নের উত্তরে আপ্তে বলেন, ২৬শে জানুয়ারি সকালে তিনি ও নাথুরাম ভুলেশ্বরে মোটা (Mota) মন্দিরে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু দিল্লীর বাইরে ট্রেন-ভ্রমণকালে নিরাপত্তার জন্যে দাদা মহারাজের কাছে তাঁরা কোনো রিভলবার চান নি। প্রকৃত-পক্ষে দাদা মহারাজকেই তাঁরা রিভলবার সরবরাহ করতে পারতেন, এমন অবস্থা তখন তাঁদের ছিলো। ইতিপূর্ব্বেই তাঁরা হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁকে কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ দিয়েছিলেন।

২৭শে জানুয়ারি বিকেলে আপ্তে দিল্লীর আশ্রয়-শিবিরগুলি পরিদর্শন করেছিলেন। সেদিন রাত্রেই গড্‌সে ও তিনি ট্রেনে চড়ে গোয়ালিয়রে যাত্রা করেন। গোয়ালিয়রে গরিবা, জগদীশপ্রসাদ গোয়েল ও মধুকর কালেকে তিনি দেখেন নি।

প্রশ্ন : ২৮শে জানুয়ারি মধুকর কালে, আপনাকে ও গড্‌সেকে ডাঃ পারচুরের বাড়ীতে দেখতে পান। আপনাদের দু'জনের হাতেই ছিলো রিভলবার, আপনারা ঘোড়া টিপে তা পরীক্ষা করছিলেন। একটি পিস্তল সনাক্ত করে গোয়েল বলেছেন যে, সেই পিস্তলটি তাঁর। সেটি তিনি দিয়েছিলেন গঙ্গাধর দণ্ডবতেকে। দণ্ডবতে বলেছিলেন, নাথুরাম গড্‌সের না কি প্রয়োজন ছিলো পিস্তলের।

উত্তর : পারচুরের বাড়ীতে কালেকে আমি দেখি নি। আমরা যখন সেখানে ছিলাম, আমাদের কাছে কোনো রিভলবার ছিলো না তখন। গোয়েলকে গোয়ালিয়রে আমি দেখি নি।

আপ্তে গোয়ালিয়র পরিত্যাগ করেন ২৮শে জানুয়ারি রাত্রির ট্রেনে। বোম্বাইয়ে পৌছেন ৩০শে তারিখ সকালে। যে-স্বেচ্ছাসেবকগণ দিল্লীতে বিক্ষোভ প্রদর্শনে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তাঁরা সেখানে যান নি কেন

এবং তখনো তাঁরা যেতে প্রস্তুত আছেন কি না, তাই জানবার জন্যে চেম্বুর আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে গিয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে রাত সাড়ে ন'টায় ভিক্টোরিয়া টার্মিনাসে গিয়ে শুনতে পান, নাথুরাম গড্‌সে কর্তৃক মহাত্মা গান্ধী নিহত হয়েছেন। আপ্তের ইচ্ছে ছিলো, পুণা যান; কিন্তু সে-সঙ্কল্প পরিত্যাগ করে রাত্রিটা তিনি রেলওয়ে স্টেশনে কাটিয়ে দেন।

৩১শে জানুয়ারি স্টেশনেই করকারের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। শ্রীযুত যমুনাদাস মেহ্‌তাকে টেলিফোন করার পর আপ্তে তাঁর বাড়ীর দিকে রওনা হন। পথেই মিস্ মনোরমা সালভার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। আপ্তে স্থির করেন, শ্রীযুত মেহ্‌তা ছাড়া আর-একজন আইনজীবীর সঙ্গে পরামর্শ করবেন তিনি। সেই আইনজীবী তাঁকে বলেন যে, দিল্লী গিয়ে কোনো ফল হবে না। আপ্তে তারপর চলে আসেন চেম্বুর আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে। শ্রীযুত মেহ্‌তার সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেন সন্ধ্যাবেলায়। চেম্বুর শিবিরে তিনি ছিলেন ৩রা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত।

প্রশ্ন: ৫ই ফেব্রুয়ারি পুলিশ যখন এলফিনস্টোন হোটেল অ্যানেক্সিতে আপনার ও করকারের খোঁজ করে, আপনি তখন হঠাৎ হোটেল ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন আর্য্য পথিকাশ্রমে, কিন্তু সেখানে কোনো ঘর পান নি।

উত্তর: আমি হোটেল এলফিনস্টোন অ্যানেক্সি থেকে চলে গিয়েছিলাম। আগেই আমি বলেছি, করকারে আমার সঙ্গে ছিলেন না। পুলিশ আমার সন্ধান করছে, এ-কথা আমি জানতাম না। হোটেল ছেড়ে, আসলে আমি আর্য্য পথিকাশ্রমে যাই নি, গিয়েছিলাম থানায় জি. এম. যোশীর বাড়ীতে।

প্রশ্ন: আপনি ও করকারে ৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত থানায় জি. এম. যোশীর বাড়ীতে বাস করেছিলেন।

উত্তর: এ-কথা সত্য যে, ৫ই ফেব্রুয়ারি থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত

আমি থানায় জি. এম. যোশীর বাড়ীতে ছিলাম। করকারে থানায় বাস করেন নি। অবশ্য ঐ সময়ের মধ্যে দু'তিন বার তাঁকে আমি দেখেছিলাম যোশীর বাড়ীতে ও দাদারে শিবাজী প্রিন্টিং প্রেসে। করকারে কিছু ছাপিয়ে নিচ্ছিলেন সেই প্রেস থেকে।

ফেব্রুয়ারি মাসের আট থেকে দশ তারিখের মধ্যে আপ্তে, থানার বাইরে, পুণায়, তাঁর নামে কোনো চিঠিপত্র আছে কি না, জানতে গিয়েছিলেন। সেখানে গিয়ে একটি খামে-লেখা চিঠি পান তিনি। খামের ভিতর চিঠির সঙ্গে নাথুরাম গড্‌সের ফটো ছিলো একটি। ৩০শে জানুয়ারি দিল্লী থেকে নাথুরাম সেই পত্র লিখেছিলেন তাঁকে। আপ্তে তাঁর ভাইয়ের কাছ থেকে আরো জানতে পারেন যে, অনুরূপ ফোটোসম্বলিত তাঁর-নামে-লেখা আরো-একটি পত্র পুণার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ডেপুটি পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ত্তৃক হস্তগত হয়েছে।

আপ্তে বলেন, "বোম্বাই গোয়েন্দা আপিসে যখন ছিলাম, শ্রীযুত নাগরওয়ালা ও খান-সাহেব ওমর খান পত্রটি দেখিয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করেন, খামের উপরে হাতের লেখা কার? উত্তরে আমি বলি যে, নাথুরাম গডসেরই হাতের লেখা ওটি। খামের উপর ডাকঘরের ছাপ ছিলো—দিল্লী, জানুয়ারি ৩০। খামের ভিতরকার চিঠি আমায় দেখানো হয় নি, কেবল ফটোখানা দেখানো হয়েছিলো।"

বিভিন্ন সনাক্তকরণ প্যারেড সম্পর্কে তাঁর কিছু বলবার আছে কি না, জিজ্ঞাসা করা হলে আপ্তে বলেন, সে-সম্বন্ধে তাঁর বলবার বিশেষ কিছু নেই। তবে, দিল্লীর ট্যাক্সি-চালক সুরজিৎ সিং, বনরক্ষী মেহের সিং, বুকিং-ক্লার্ক সর্দ্দারীলাল, জম্মু ও মধুকর কালেকে, পুলিশ আগে থেকেই আপ্তেকে দেখিয়ে দিয়েছিলো।

তাঁর বিরুদ্ধে সরকারপক্ষ যে-সমস্ত সাক্ষ্য দিয়েছেন তা সবই তিনি

শুনেছেন কি না, এবং ঐ সব সাক্ষীর তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার কারণ সম্বন্ধে তিনি কিছু বলতে চান কি না,—আপ্তেকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তর দেন, "পুলিশের চাপে পড়েই রামচন্দ্র ও সুরজিৎ সিং আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন। সরকারপক্ষের বক্তব্য সমর্থনে তাঁদের সাক্ষ্যের প্রয়োজন ছিলো। জন্নু, গরিবা ও কালে সাক্ষ্য দিয়েছেন পুলিশের প্ররোচনায়। দাদা মহারাজ, দীক্ষিত মহারাজ এবং বাদগেও পুলিশের চাপে পড়েই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য না দিলে তাঁরাও এই মামলায় জড়িয়ে পড়বেন। আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবার জন্যে পুলিশ, বাদগের উপর নির্য্যাতন করেছে, তাঁকে হয়রান করেছে। বসন্ত যোশীর সাক্ষ্য দেবার কারণ,—তাঁর পিতা জি. এম. যোশীর নির্দ্দেশ। জি. এম. যোশী গোয়েন্দা আপিসের হাজতে ছিলেন কিছুকাল। তিনি নিশ্চয় ভেবেছিলেন, পুলিশের কথামতো যদি তিনি সাক্ষ্য না দেন কিংবা সাক্ষ্যদানে সাহায্য না করেন, তাঁর বিপদ হতে পারে।"

প্রশ্ন : আদালতে আপনার কি আর-কিছু বক্তব্য আছে ?

উত্তর : আমার মতে দু'টি পৃথক ঘটনা ঘটেছিলো,—একটি ২০শে জানুয়ারি তারিখে এবং অপরটি ৩০শে জানুয়ারি তারিখে। প্রথম ঘটনার পর আমি এবং নাথুরাম গ্রেফ্‌তার হবো বলে আশঙ্কা করেছিলাম। সংবাদপত্রে এই মামলা সম্পর্কে যা-কিছু প্রকাশিত হয়েছিলো সবই আমি পড়েছিলাম। ৩০শে জানুয়ারি থেকে ১৪ই ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত সংবাদপত্রের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিলো অবিচ্ছেদ্য। এই সময়ের মধ্যে কয়েকটি স্বকপোলকল্পিত মতবাদ প্রচারিত হয়েছিলো সংবাদপত্রে। ২০শে ও ৩০শে জানুয়ারির ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে বহু সিদ্ধান্তও প্রকাশিত হয়েছিলো। একটি আন্তর্জ্জাতিক ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত ছিলো তাতে।

যখন আমি গোয়েন্দা পুলিশের হাজতে ছিলাম, পুলিশ কতকগুলি দলিলপত্র নিয়ে এসে আমায় বলেছিলো যে, আমরা বৃটিশ ও রাশিয়ানদের কাছ থেকে সাহায্য পেয়েছি। তারপর যখন তারা দেখলো যে, এই মত ধোপে টিকবে না তখন তারা আন্তর্জ্জাতিক ষড়যন্ত্র থেকে নেমে এলো প্রাদেশিক ও দেশীয় রাজ্যের ষড়যন্ত্রে। বাদগে ইতিমধ্যেই পুলিশের কাছে ষড়যন্ত্রের একটি খসড়া দাখিল করেছিলেন। সেটিকে পূর্ণাঙ্গ করতে বাকি ছিলো ষড়যন্ত্রের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার জন্যে ইচ্ছানুরূপ সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহ। রিভলভার দু'টি নিশ্চয়ই কোনো জায়গা থেকে আনা হয়েছে, পুলিশ তখন চাইছিলো এই কথাই প্রমাণ করতে। দাদা মহারাজ, দীক্ষিত মহারাজ ও বাদগের সাক্ষ্য সংগ্রহে সক্ষম হয়ে তাদের সে-উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছিলো। পুলিশ যদিও জানতো যে, কোনোরূপ ষড়যন্ত্রই প্রমাণ করতে পারে নি তারা, তবু তারা ভেবেছিলো যে, মহাত্মা গান্ধীর মতো ব্যক্তিকে যখন হত্যা করা হয়েছে তখন নিশ্চয়ই তার পেছনে একটি বিরাট ষড়যন্ত্র রয়েছে, সে-ষড়যন্ত্র সাধারণ ষড়যন্ত্র নয়।

প্রশ্ন: সরকারপক্ষীয় সাক্ষ্যের প্রতিবাদে এবং আপনার বর্ণিত অভিযোগের সমর্থনে আপনি কি কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করতে চান?

উত্তর: না।

পঁয়তাল্লিশ

করকারের কথা

১৫ই নভেম্বর তারিখে করকারে তাঁর বিবৃতিতে বলেন, "আমি কোনো অপরাধ করি নি, কোনো অপরাধ করেছি বলেও আমি স্বীকার করি না।

এই মামলায় আমার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হয়েছে তাও অস্বীকার করি আমি।"

করকারে আরও বলেন যে, তাঁর নামে যে-সব অভিযোগ আনা হয়েছে সেগুলো যথার্থও নয়, স্পষ্টও নয়, তার উপর সেগুলো আইনানুগও নয়। অভিযোগের সব ক'টিই আইনত অসিদ্ধ, অতএব তাঁর বিরুদ্ধে কাউকে আইনত দায়ীও করা যেতে পারে না। অধিকন্তু এই মামলার বিচার করার ক্ষমতা এই আদালতের নেই, সেই বিচার করবার ভার এবং কর্তৃত্বও আইনত আদালতের উপর অর্পিত হয় নি।

তাঁর বিরুদ্ধে সরকারপক্ষের সাক্ষ্যপ্রমাণের বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, "এই মামলায় আমার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হয়েছে, সরকারপক্ষ তার কোনোটিই প্রমাণ করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, সাক্ষ্যপ্রমাণের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের অবকাশও রয়েছে। আমার প্রার্থনা, সেই সন্দেহের অবকাশে আমাকে মুক্তি দেওয়া হোক।"

বিড়লা ভবনে গান্ধীজী যেদিন নিহত হন সেদিন তিনি সেখানে ছিলেন বলে অস্বীকার করেন। জানুয়ারি মাসের চতুর্থ সপ্তাহে তিনি না কি ছিলেন বোম্বাইয়ের নিকটবর্ত্তী চেম্বুর আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে। সেখানে শরণাগতদের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন তিনি। ঐখানেই তিনি গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পান।···অতএব গান্ধী-হত্যার ষড়যন্ত্রে তিনিও জড়িত ছিলেন, এ কিছুতেই হতে পারে না।

নিজের জীবনেতিহাস সম্বন্ধে করকারে যা বলেন তা সংক্ষেপে এই,—

বোম্বাই প্রদেশের রত্নগিরি জেলার এক গ্রামে সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁর জন্ম হয়। বাল্যকাল হতেই হিন্দুসংস্কৃতি-সম্পন্ন শিক্ষা পেয়েছিলেন তিনি। তাঁর মায়ের মৃত্যুশয্যায় তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে, যতোদিন জীবন থাকবে, হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু ভাই-বোনদের প্রতি তাঁর কর্ত্তব্য তিনি

পালন করবেন। সে-অনুযায়ী কাজও করে এসেছেন তিনি। অর্থাভাবে তিনি খুব বেশি লেখা-পড়া কবতে পারেন নি। ১৯৩৮ সালের প্রথমেই তিনি হিন্দুমহাসভার সভ্য হন।

নোয়াখালির হত্যাকাণ্ডের পর হিন্দুদের সাহায্যার্থে তিনি সেখানে গিয়েছিলেন। গান্ধীজীকে তাঁর মত জানিয়ে একখানা চিঠিও দিয়েছিলেন। বোম্বাইযের বাস্তুহারাদের মধ্যে কাজ করবার সময়েই মদনলালের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। একবার তিনি বলেছিলেন করকারেকে তাঁর সঙ্গে দিল্লী যেতে। উদ্দেশ্য ছিলো, তাঁর (মদনলালের) বিবাহের কথাবার্তা পাকা করা এবং গান্ধীজীর মুস্লিম-প্রীতির বিরুদ্ধে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন। ১৭ই জানুয়ারি দিল্লী পৌছেন তাঁরা। কিন্তু প্রার্থনা সভায় মদনলাল বা অপর কারো সঙ্গে না গিয়ে একলা যাওয়াই স্থির করেন করকারে।

২০শে জানুযারির বোমাবিস্ফোরণের ঘটনার সঙ্গে কোনো যোগাযোগই তাঁর ছিলো না। সেদিন টাঙ্গা কবে যখন তিনি বিড়লা ভবনে উপস্থিত হন তখন বিকেল প্রায সাড়ে পাঁচটা। সেখানে গিযেই বোমাবিস্ফোরণ ও মদনলালের গ্রেফ্‌তার কথা জানতে পারেন তিনি। ভীত হয়ে তিনি তক্ষুনি সেই টাঙ্গায় ফিরে আসেন, এবং সেই রাত্রেই মথুরা যাত্রা করেন। সেখানে দু'দিন থেকে ফিরে যান চেম্বুর শরাণার্থী-শিবিবে।

আপ্তের সঙ্গে বহুদিন ধরেই পরিচয় ছিলো করকারের। ১৩ই ফেব্রুয়ারি থেকে বোম্বাইযের একটি হোটেলে তিনি আপ্তের সঙ্গে বাস করছিলেন, ১৪ই ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রেফ্‌তার করা হয় তাঁকে।

করকারে বলেন, তাঁর সম্পর্কে বাদগের সাক্ষ্য মিথ্যা এবং বানানো। বাদগে যে বলেছেন, আপ্তে ও করকারে তাঁর কাছ থেকে তিন হাজার টাকার অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ কিনেছিলেন, এ-কথা সত্য নয়। বাদগে তাঁর সাক্ষ্যেও বলেছেন যে, ২০শে জানুয়ারি সকালে করকারে তাঁর

সঙ্গে বিড়লা ভবনে৲ যান নি। বাদগে এ-ও স্বীকার করেছেন যে, সেদিন করকারে, তাঁর সঙ্গে জঙ্গলেও যান নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ২০শে জানুয়ারি তারিখে বাদগের সঙ্গে করকারের দিল্লীতে দেখা হয় নি। . ঐদিন করকারে ম্যারিনা হোটেলেও যান নি।

বাদগের বিবৃতিতে আছে, গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে সকলেরই একসঙ্গে হাতবোমা ছুড়তে হবে, এই প্রস্তাব না কি করকারেই করেছিলেন। করকারে বলেন যে, ঐ বিবৃতি-যে কেবল মিথ্যা ও বানানো তা-ই নয়, হাস্যকরও বটে। বাদগে আরো কয়েকটি ব্যাপার সম্বন্ধে মিথ্যা কথা · বলেছেন,—যেমন ছদ্মনাম গ্রহণ, ম্যারিনা হোটেলে করকারের বস্ত্র পরিবর্ত্তন, ২০শে জানুয়ারি তারিখে মদনলালকে দেবার জন্যে ম্যারিনা হোটেলে আপ্তে কর্তৃক করকারেকে একটি গান-কটন-স্ল্যাব ও একটি হাতবোমা দান। আপ্তে ও করকারে শ্রীকৃষ্ণজীবনজী মহারাজের কাছে দু'টি পিস্তল চেয়েছিলেন—করকারে বলেন, এ-ও মিথ্যা।

বিবৃতি পাঠ শেষ হলে বিচারক, করকারেকে যে-সব প্রশ্ন করেন এবং করকারে সেগুলোর যে-উত্তর দেন তা সংক্ষেপে এই :

বিচারক : ১৯৪৭ সালের ২৫শে মে আপনি বাদগের নিকট একটি পত্র লিখেছিলেন। তাতে আপনি তাঁকে "বস্ত্রর" ও "পুস্তক" সরবরাহ করতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আপনাকে ও আপ্তেকে তিন হাজার টাকা দামের অস্ত্র ও বিস্ফোরক সরবরাহ করেছিলেন বাদগে। আপনাদের দু'জনকে একটি স্টেনগানও দিয়েছিলেন তিনি।

করকারে : ওরূপ কোনো পত্র আমি বাদগেকে লিখি নি। আদালতে-প্রদর্শিত পত্রের হাতের লেখাও আমার নয়। বাদগে আমাকে কোনো অস্ত্র, বিস্ফোরক অথবা স্টেনগান সরবরাহ করেন নি। আপ্তে এবং আমি কোনোদিন কারো সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের লেন-দেন করি নি। বাদগেকে আমি চিনতামই না।

প্রশ্ন : ৯ই জানুয়ারি মদনলাল, ওম প্রকাশ ও চোপরার সঙ্গে আপনি পুণায় বাদগের দোকানে গিয়ে তাঁকে "মাল" দেখাতে বলেন। "মালে"র অর্থ আর কিছুই নয়—অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক। বাদগে আপনাকে কিছু মালপত্র দেখিয়েও ছিলেন।

উত্তর : সব মিথ্যে কথা।

প্রশ্ন : ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে মদনলালের সঙ্গে আপনি ডাঃ জৈনের বাড়ী গিয়েছিলেন। আমেদনগরের জনৈক 'শেঠ' বলে ডাঃ জৈনের নিকট মদনলাল আপনার পরিচয় দিয়েছিলেন। আপনার কাছে মদনলাল যে-অর্থ পেতেন, ডাঃ জৈনকে সেই অর্থ দিয়ে-দেবার জন্যে মদনলাল অতঃপর আপনাকে অনুরোধ করেছিলেন।

উত্তর : সবই মিথ্যে কথা। বস্তুত ১৯৪৮ সালের ১৮ই জানুয়ারি আমি চেম্বুর আশ্রয়প্রার্থী শিবিরে ছিলাম।

প্রশ্ন : ১৫ই জানুয়ারি নাথুরাম গড্‌সে, আপ্তে, মদনলাল ও বাদগের সঙ্গে আপনি দীক্ষিত মহারাজের বাড়ী গিয়েছিলেন। একটি ব্যাগ আনা হয় সেখানে। ব্যাগের ভিতর ছিলো দু'টি গান-কটন স্ল্যাব, ডেটোনেটার সহ পাঁচটি হাতবোমা ইত্যাদি। বাদগেই সেই জিনিষগুলি আপনাদের দেখিয়েছিলেন। পরে জিনিষপত্রসহ ব্যাগটি আপনার হাতেই দেওয়া হয়। মদনলালের সঙ্গে সেই দিনই সন্ধ্যায় দিল্লী রওনা হতে আপনাকে অনুরোধ জানান আপ্তে।

উত্তর : সব মিথ্যে কথা। আমি দীক্ষিত মহারাজের বাড়ী যাই নি।

আরো-কিছু প্রশ্নের উত্তরে করকারে বলেন যে, মদনলাল ও তিনি দিল্লী পৌঁছেছিলেন ১৭ই জানুয়ারি বেলা প্রায় বারোটার সময়। দিল্লী পৌঁছে তাঁরা হিন্দু মহাসভা ভবন কিংবা বিড়লা মন্দিরে যান নি, সোজা

উঠেছিলেন চাঁদনী চকের শেরিফ হোটেলে। হোটেল-রেজিস্টারিতে দেবনাগরী অক্ষরে তিনি নিজের নাম লিখেছিলেন 'ব্যাস'। হোটেলে ছিলেন তাঁরা ১৭ই থেকে ১৯শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত। ১৯শে তারিখ গোপাল গড্‌সে তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে হোটেলে আসেন নি। ১৭ই থেকে ২০শে জানুয়ারির মধ্যে ম্যারিনা হোটেলে নাথুরামের সঙ্গেও দেখা করেন নি তিনি, কিংবা সেখানে চা অথবা মদ্যও পান করেন নি।

প্রশ্ন: ২০শে জানুয়ারি বিকেল প্রায় পাঁচটার সময় আপ্তে, বাদগে এবং আপনাকে বিড়লা ভবনের ভৃত্যাবাসের নিকট ঘোরাফেরা করতে দেখা গিয়েছিলো। আপ্তে বাদগেকে বলেছিলেন ফটোগ্রাফারের ভাণ করে ছোট্টুরামের ঘরে ঢুকতে। সে-সময় নাথুরাম গড্‌সেও এসে পৌঁছলেন। ছোট্টুরামের ঘরে ঢুকতে বাদগে অস্বীকৃতি জানালে নাথুরাম তাঁকে জানালেন যে, তাঁর ভয় পাবার কোনো হেতু নেই, কারণ সবারই পালাবার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। ছোট্টুরামের ঘরে ঢুকবার জন্যে ইতিমধ্যেই তাঁর কাছ থেকে আপনি সম্মতি আদায় করে রেখে-ছিলেন। খানিক পরে শঙ্কর ও বাদগের সঙ্গে আপনি চলে গিয়েছিলেন প্রার্থনা-সভায়।

উত্তর: এ-সকলই মিথ্যে।

করকারে বলেন যে, ২০শে জানুয়ারি রাত্রে দিল্লীর ফ্রন্টিয়ার হিন্দু হোটেলে 'জি. এম্.যোশী' ছদ্মনামে তিনি কখনো বাস করেন নি। ২৫শে জানুয়ারি 'ব্যাস' নাম দিয়ে আপ্তের কাছে টেলিগ্রামও করেন নি। ২৯শে ও ৩০শে জানুয়ারি দিল্লী মেন রেলওয়ে স্টেশনে ছ' নম্বর বিশ্রাম-কক্ষে নাথুরাম ও আপ্তের সঙ্গে তাঁকেও দেখা গিয়েছিলো, এ-কথাও অস্বীকার করেন করকারে, কারণ ঐ সময়ে তিনি ছিলেন বোম্বাইয়ে।

প্রশ্ন : সরকারপক্ষের সাক্ষীরা কেন আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন বলতে পারেন ?

উত্তর : সাক্ষীদের মধ্যে পনেরোজনই বিভিন্ন হোটেলের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। আমি নিজেও একজন হোটেলওয়ালা। হোটেলওয়ালাদের উপর পুলিশের প্রভাব কিরূপ, তা আমি জানি। ঐ সকল সাক্ষী পুলিশের চাপে পড়েই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। দীক্ষিত মহারাজ, দাদা মহারাজ ও বাদগে অস্ত্রশস্ত্র এবং বিস্ফোরকের কারবারী ছিলেন, তাঁরাও সাক্ষ্য দিয়েছেন পুলিশের চাপেই। আমাকে চেনে না বলায়, পুলিশ বাদগেকে প্রহার করেছিলো। আমার বিরুদ্ধে বাদগে-যে সাক্ষ্য দিয়েছেন, তা এই কারণেই। সাভারকরকে আমি চিনি না বলায়, পুলিশ আমাকেও মারধর করেছিলো।

প্রশ্ন : আপনি কি আর-কিছু বলতে চান ?

উত্তর : ১৯৪৮ সালের ৩১শে জানুয়ারি ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস রেল স্টেশনে আপ্তের সঙ্গে আমার দেখা হয়। তিনি সেখানে এসেছেন কেন, তাঁকে আমি এই প্রশ্ন করি। তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই তার উত্তর দিতে পারেন নি। পরে আমি জানতে পারি যে, মহাত্মা গান্ধী, নাথুরাম গড্‌সে কর্ত্তৃক নিহত হয়েছেন। আপ্তেকে অত্যন্ত ভীত-চকিত মনে হয়েছিলো। বাজারে গুজব রটেছিলো যে, ব্রাহ্মণদল, বিশেষত হিন্দু মহাসভাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ নাকি মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন। হিন্দু সভার কর্ম্মী ছিলাম বলে আমিও হতবুদ্ধি হয়ে পড়ি। মদনলালের বিয়ের ব্যবস্থা সম্পর্কে ১৭ই জানুয়ারি আমি দিল্লী এসেছিলাম। এই ঘটনার সুযোগ নিয়ে পুলিশ এই মামলায় আমাকে জড়িত করেছে। আমার আর-কিছু বলবার নেই।

ছেচল্লিশ

মদনলালের কথা

১৬ই নভেম্বর, গান্ধী-হত্যা মামলার চতুর্থ আসামী মদনলাল আদালতে তাঁর বিবৃতি দান সম্পর্কে বলেন যে, ২৯শে জানুয়ারি যখন তিনি বিড়লা ভবনে যাবেন বলে স্থির করেন তখন তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিলো আশ্রয়প্রার্থীগণকে গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় নিয়ে গিয়ে মহাত্মার সম্মুখে তাঁদের অভাব-অভিযোগ পেশ করা। বাদগের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হলে বাদগে তাঁকে একটি গান-কটন স্ল্যাব দেন। মদনলালের মনে হয়, প্রার্থনা সভায় ঐটির বিস্ফোরণ দ্বারা তিনি নিজেই যথেষ্ট গোলযোগের সৃষ্টি করতে পারবেন, অতএব বহুসংখ্যক আশ্রয়প্রার্থী নিয়ে যাবার প্রয়োজন নেই সেখানে।

মদনলাল বলেন, "করকারেকে আমি আমার পরিকল্পনার পরিবর্ত্তন ও গানকটন স্ল্যাব বিস্ফোরণের কথা বলেছিলাম। জাতির জনকের নিকট আমার নির্য্যাতিত দেশবাসীর বক্তব্য পেশ করবার সবটুকু কৃতিত্ব একাই ভোগ করবার বাসনা আমার মনে জেগে উঠে। মহাত্মা গান্ধী জাতিকে যে-সত্যাগ্রহের শিক্ষা দিয়েছিলেন আমার কাজকে তারই আর-একটি রূপ বলে মনে করেছিলাম আমি।

"২০শে জানুয়ারি আমি একলাই বিড়লা ভবনে যাই। প্রার্থনাস্থলটি পর্য্যবেক্ষণ করে বোমাবিস্ফোরণের স্থানও স্থির করি। সীমানা-প্রাচীরের কয়েকটি ইট ভাঙা ছাড়া অন্য কোনো ক্ষতি হবে না, এ-বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ হই। মহাত্মা গান্ধীর শারীরিক কোনো অনিষ্ট করবার কল্পনা আমার মনে ছিলো না। প্রাচীর ছাড়া যাতে আর-কোনো ব্যক্তি বা সম্পত্তির ক্ষতি না হয়, সে-বিষয়ে আমি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম।"

সরকারপক্ষ ষড়যন্ত্রের যে-অভিযোগ এনেছেন, মদনলাল তা অস্বীকার করেন। যদি তেমন কোনো ষড়যন্ত্র হয়েও থাকে, মদনলাল তার সঙ্গে জড়িত ছিলেন না। তিনি বলেন, "ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আমাকে অভিযুক্ত করা যেতে পারে না, এবং এই হেতুই ঐ ষড়যন্ত্রসংশ্লিষ্ট কোনো কার্য্যকলাপের অভিযোগেও অভিযুক্ত হতে পারি না আমি।"

বাদগে বলেছেন যে, ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মদনলালের কাজ ছিলো—পলিতায় আগুন ধরিয়ে দিয়েই প্রার্থনা সভায় ছুটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর প্রতি হাত-বোমা ছোড়া। মদনলাল বলেন, "এর চেয়ে হীনতম মিথ্যা আর কিছুই হতে পারে না। বাদগের কল্পিত কাহিনী যদি বিন্দুমাত্রও সত্য হতো এবং মহাত্মা গান্ধীর কোনোরূপ শারীরিক অনিষ্ট করবার ইচ্ছা যদি আমার থাকতো তবে পলিতায় আগুন দেবার পর অনায়াসেই আমি, মহাত্মা গান্ধী যেখানে বসেছিলেন, সেখানে চলে যেতে পারতাম। আমি যে সেরূপ কিছু করি নি, আদালতে তার সাক্ষ্যপ্রমাণ রয়েছে। এই থেকেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার কোনোরূপ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে কখনো আমি জড়িত ছিলাম না।"

গ্রেফ্তারের সময় মদনলাল বাধা দিয়েছিলেন এবং প্রার্থনা-সভার দিকে ছুটে যেতে চেয়েছিলেন বলে সরকারপক্ষ যে-প্রমাণ করতে চেয়েছেন তা সত্যই 'হাস্যকর।'

আদালতে মদনলালের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে যে, মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার জন্যে অন্যান্যের সঙ্গে তিনি ষড়যন্ত্র করেছিলেন। সেই ষড়যন্ত্র অনুসারে তিনি গান-কটন-স্ল্যাব বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন এবং তাঁর কাছে একটি হাতবোমাও ছিলো। অভিযোগের প্রথমাংশ যদি প্রমাণিত না হয়, তবে দ্বিতীয়াংশও যে স্বতই নাকচ হয়ে যায়—এ কথা অতি পরিষ্কার।

পাঞ্জাবের দাঙ্গাহাঙ্গামাজনিত আশ্রয়প্রার্থীদের হৃদয়বিদারক দৃশ্য ও

তাদের বর্ণিত মর্ম্মান্তিক কাহিনী তাঁর মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিলো, মদনলাল অতঃপর তা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেন। তারপর যখন তিনি মহাত্মা গান্ধীর অনশনের কথা শুনলেন তখন তাঁর মন অত্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত হলো এই ভেবে, পাঞ্জাবের ঘটনার পরেও মহাত্মার আধ্যাত্মিক বলের সমর্থনে যদি মুস্‌লিম-তোষণ-নীতি তেমনি চলতে থাকে তবে, কেবল আশ্রয়প্রার্থীগণের ভাগ্যই নয়, ভারতের ভবিষ্যতও অন্ধকারে আবৃত হবে। তাঁর মতে, তোষণপুষ্ট মুস্‌লিম সাম্প্রদায়িকতা একটি মুস্‌লিম রাষ্ট্রে অতিকায় দৈত্যবিশেষে পরিণত হইতে থাকে। ইহাকে যদি আরও তোষণ দ্বারা পুষ্ট করা হইতে থাকে তবে, তবে তাহা ভারতকে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত, ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত ও বিকলাঙ্গ করিয়া দিবে।"

তিনি ডাঃ জৈনকে সাভারকরের সঙ্গে তাঁর (মদনলালের) সাক্ষাতের কথা বলেছিলেন,-মদনলাল এ-কথা অস্বীকার করেন। তিনি বলেন, "সাভারকরের সঙ্গে আমি কোনোদিনই সাক্ষাত করি নি।"

বাদগের সাক্ষ্য সম্পর্কে মদনলাল বলেন, "বাদগে নিজেই তাঁর কল্পিত ষড়যন্ত্র কাহিনীর সর্ব্বাপেক্ষা বড়ো প্রতিবাদ। তাঁর মতে— একটি বিরাট ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা হয় এবং পরিকল্পনার ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সেটিকে কার্য্যে পরিণত করবার সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয়ও স্থির হয়ে যায়। কিন্তু যখন সময় এলো, দেখা গেলো, ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে গেছে। বাদগে এই ব্যর্থতার একমাত্র কারণ দেখিয়েছেন, ভৃত্যদের ঘরের জাফরির ভেতর দিয়ে তাঁর নিজের হাতবোমা নিক্ষেপে অনিচ্ছা। এ-কৈফিয়ৎ একেবারে অচল। তা ছাড়া যে-কোনো কারণেই হোক, শেষ মুহূর্ত্তে যদি ষড়যন্ত্র প্রত্যাহার করাই হয়ে থাকে তবে ষড়যন্ত্রে আমার অংশও প্রত্যাহার করা হলো কেন? এ-প্রশ্নের কোনো উত্তর বাদগে দেন নি।"

বিবৃতি পাঠের পর বিচারপতি মদনলালকে প্রশ্ন করেন। তার উত্তরে মদনলাল বলেন যে, গুপ্ত নামক জনৈক ব্যক্তি ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে ডাঃ জৈনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। কয়েকবার তিনি ডাঃ জৈনের সঙ্গে সাক্ষাতও করেছিলেন। তবে তিনি এ-কথা অস্বীকার করেন যে, তিনি ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহের শেষের দিকে ডাঃ জৈনকে বলেছিলেন যে, আমেদনগরে তিনি একটি দল গঠন করেছেন, তারা মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার জন্যে অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সংগ্রহ করেছে এবং তাঁর কাজের জন্যে সাভারকর [illegible]র পিঠ চাপড়ে, 'কাজ চালিয়ে যাও' বলে তাকে উৎসাহিত করেছেন।

বিচারক : ৯ই জানুয়ারি রাত প্রায় সাড়ে আটটার সময় আপনি, করকারে, ওম্ প্রকাশ ও চোপরা—বাদগের দোকানে গিয়েছিলেন। ওম্ প্রকাশ ও চোপরাকে, করকারে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন বাদগের সঙ্গে। বাদগের কাছে যে-বিস্ফোরক ছিলো, বাদগেকে করকারে তা আপনাকে দেখাতে বলেন। শঙ্কর ঐ বিস্ফোরকগুলি নিয়ে আপনাকে দেখিয়েছিলো। আপনি তখন বলেন যে, কি করে ঐগুলোতে আগুন ধরাতে হয়, আপনি তা জানেন।

মদনলাল : এটি সর্ব্বৈব মিথ্যা। প্রকৃতপক্ষে উক্ত তারিখে আমার স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কয়েকজন সভ্যের সঙ্গে আমি হায়দ্রাবাদ রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত খর্দ্দা গ্রামে ছিলাম। হায়দ্রাবাদ স্টেট কংগ্রেসের কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনাও হয়েছিলো আমার। আমাদের উদ্দেশ্য ছিলো, হায়দ্রাবাদ রাজ্যে প্রবেশের চারটি সেতু উড়িয়ে দেওয়া, যাতে হায়দ্রাবাদের দিক থেকে আর-কোনো আক্রমণের ভয় না থাকে।

প্রশ্ন : ১৫ই জানুয়ারি বাদগে, আপ্তে, নাথুরাম গডসে, করকারে ও শঙ্কর দাদার-হিন্দু-মহাসভা-আপিসে আসেন। করকারে আপনাকে

বিছানাপত্র নিয়ে রওনা হতে বলেন। তারপর আপনারা সবাই যাত্রা করেন দীক্ষিত মহারাজের বাড়ীর দিকে।

উত্তর : এ-সবই মিথ্যে। প্রকৃতপক্ষে ১৪ই ফেব্রুয়ারি নাগাদ বোম্বাইয়ে নূতন গোয়েন্দা আপিসে নাথুরাম, আপ্তে ও শঙ্করকে আমি সর্ব্বপ্রথম দেখি।

গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় বোমাবিস্ফোরণের আগে তাঁদের মধ্যে অস্ত্র-শস্ত্র বিতরিত হয়েছিলো, মদনলাল এ-কথা অস্বীকার করেন। তিনি গান-কটন-স্ল্যাব বিস্ফোরণ ঘটাবেন, এবং তাতে যে-বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে সেই সুযোগ আর-আর লোকেরা মহাত্মা গান্ধীর দিকে রিভলবার ও হাতবোমা ছুড়বেন, এমন কোনো ব্যবস্থা আগে থেকেই হয়েছিলো বলেও অস্বীকার করেন মদনলাল।

আদালতের সম্মুখে তাঁর কিছু বক্তব্য আছে কি না, এই প্রশ্ন করা হলে মদনলাল উত্তর করেন যে, বোম্বাইয়ের জনৈক পুলিশ-অফিসারের চাপে পড়ে তিনি স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন যে, (১) তিনি সাভারকর, নাথুরাম গড্‌সে ও আপ্তেকে জানতেন; (২) মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে তিনিও লিপ্ত ছিলেন।

সাতচল্লিশ

শঙ্করের কথা

১৮ই নভেম্বর পঞ্চম আসামী শঙ্কর কিস্তায়াকে বিচারপতি কতকগুলি প্রশ্ন করেন। লেখাপড়া জানেন না বলে শঙ্কর কোনো লিখিত বিবৃতি দাখিল করেন নি।

শোলাপুরের অধিবাসী বাদগের এই ভৃত্যকে বিচারপতি প্রশ্ন করেন: সাক্ষ্য-প্রমাণে আছে যে, ১৯৪৬ সালে তুমি বাদগের ভৃত্যরূপে নিযুক্ত হয়েছিলে। ছোরার হাতল তৈরি করাই ছিলো তোমার কাজ। বাদগের হয়ে তুমি অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরকদ্রব্য বহন ও সরবরাহ করতে।

শঙ্কর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন: ১৯৪৭ সালের জুলাই থেকে ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আপ্তে ও করকারেকে বহু 'মাল' সরবরাহ করেছিলেন বাদগে। আপ্তে ও করকারে পুণার শস্ত্রভাণ্ডারে আসা-যাওয়া করতেন।

উত্তর: আপ্তে ও করকারে রোজ শস্ত্রভাণ্ডারে আসতেন না। মাঝে মাঝে এসে তাঁরা মাল নিয়ে যেতেন।

আর-একটি প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর বলেন, "একদিন করকারে ও মদনলাল অন্য দু'জন লোককে সঙ্গে করে বাদগের দোকানে আসেন। তাঁদের নাম আমি জানতাম না। বাদগে আমাকে 'মাল' আনতে আদেশ করেন। মালসহ দু'টি থলে এনে আমি বাদগের হাতে দিই। ঐ সব 'মাল' পেছনের উঠানে ইট-পাথর চাপা দিয়ে রাখা হোতো। 'মাল' দিয়েই আমি অন্য ঘরে চলে যাই। ব্যাগগুলি আমার সামনে খোলা হয় নি। ব্যাগে কি ছিলো, তখন পর্য্যন্ত আমি তা জানতাম না।"

প্রশ্ন: ১৪ই জানুয়ারি সন্ধ্যায় বোম্বাইয়ে নাথুরাম ও আপ্তেকে সরবরাহ করতে হবে বলে, ১৩ই জানুয়ারি বাদগে পাঁচটি হাতবোমা, ফিউজ তার ও ডেটোনেটার সহ দু'টি গানকটস্ল্যাবের সঙ্গে কিছু মাল একটি ব্যাগের ভিতর পূরতে বলেন। মালগুলি একটি খাকি ব্যাগে রাখা হয়েছিলো। ১৪ই জানুয়ারি বাদগে ও তুমি পুণা থেকে রওনা হয়ে ঐদিনই সন্ধ্যা প্রায় সোয়া সাতটার সময় দাদারে পৌছও।

উত্তর: হ্যাঁ।

প্রশ্ন : ১৭ই জানুয়ারি সকালে নাথুরাম, আপ্তে ও বাদগে দাদার-হিন্দুমহাসভা আপিসে এসে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। নাথুরাম প্রস্তাব করেন, সাভারকরকে 'শেষ দর্শন' করবার জন্যে সকলেরই যাওয়া উচিত। অতঃপর তোমরা সবাই একটি ট্যাক্সিতে চড়ে সাভারকর-সদনের দিকে যাত্রা করো। ট্যাক্সি চালাচ্ছিলো আতপ্পা কোটিয়ান।

উত্তর : হ্যাঁ, ১৭ই জানুয়ারি তাঁরা এসে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমরা শিবাজী পার্কের দিকে রওনা হই। আতপ্পা কোটিয়ানই গাড়ি চালাচ্ছিলো। তখন পর্য্যন্ত সাভারকরকে আমি জানতাম না।

শঙ্কর বলেন, পরদিন বাদগে ও তিনি দিল্লী চলে যান। রেলস্টেশন থেকে তাঁরা হিন্দু মহাসভা ভবনে গিয়েছিলেন। একটি ঘরে তিনি—মদনলাল, গোপাল গড্‌সে ও একটি দাড়িওয়ালা লোককে দেখতে পান। কিছু পরেই নাথুরাম, আপ্তে এবং করকারেও আসেন সেখানে। সেই রাত্রে মদনলাল, গোপাল গড্‌সে, বাদগে ও শঙ্কর সেই ঘরেই ঘুমিয়েছিলেন। পর দিন সকালে আপ্তে ও করকারে হিন্দু মহাসভা ভবনে আসেন। তারপর, শঙ্করের কথাতেই বলি,—

আপ্তে, বাদগে ও আমি একটি মোটরে করে বিড়লা ভবনের দিকে যাত্রা করি। করকারে আপিসেই থেকে গিয়েছিলেন। বিড়লা ভবনের প্রবেশ-পথেই জনৈক ব্যক্তি আমাদের থামিয়ে আপ্তেকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কার সঙ্গে দেখা করতে চান? আপ্তে এক টুকরা কাগজে কি লিখে দেন, দ্বাররক্ষী সেইটি নিয়ে বিড়লা ভবনের অভ্যন্তরে চলে যায়। তখন আমরা প্রার্থনা সভার দিকে এগিয়ে যাই। এক টুকরো সূতো বের করে আপ্তে জাফরির মাপ নেন। তারপর আমরা সবাই হিন্দু মহাসভা ভবনে ফিরে আসি। বাদগে আমাকে আমার কোট পরতে বলেন। কোটের পকেটে ছিলো একটি পিস্তল আর কিছু কার্ত্তুজ। তারপর আপ্তে, গোপাল, বাদগে ও আমি ভবনের পেছন দিকের জঙ্গলে যাই। আপ্তে

আমাকে পিস্তল থেকে গুলী ছুড়তে বলেন। আমি বলি, আমি কোনোদিন পিস্তল ছুড়ি নি। তিনি তখন আমাকে কেবল পিস্তলের ঘোড়াটি টিপ্‌তে বলেন। আমি তাই করি। তারপর গোপাল গড্‌সেকে তাঁর পিস্তল ছুড়তে বলা হয়। এমন সময় তিনজন লোক যাচ্ছিলো সেখান দিয়ে। তাদের দেখে আপ্তে তাঁর কোলের ভেতর পিস্তল আর কার্তুজ লুকিয়ে ফেলেন। গোপাল গড্‌সে অতঃপর ঐ লোক-তিনটির সঙ্গে পাঞ্জাবী ভাষায় আলাপ করেন। পরে আমরা ফিরে যাই হিন্দু মহাসভা ভবনে। করকারে তখন মদনলালকে তাঁর বিছানা থেকে ব্যাগটি বের করে নিতে বলেন। মদনলাল ব্যাগটি বের করে নেন। তারপর করকারে ও মদনলাল সেখান থেকে চলে যান। গোপাল গড্‌সে তখন একটি শাদা ব্যাগ বের করেন। অতঃপর আপ্তে, গোপাল, বাদগে ও আমি, একটি টাঙ্গা করে ম্যারিনা হোটেলের দিকে রওনা হই। ব্যাগটি গোপাল গড্‌সের সঙ্গে ছিলো।

"ম্যারিনা হোটেলের একটি ঘরে নাথুরাম তখন শুয়েছিলেন। গোপাল তাঁর হাতের ব্যাগটি সেই ঘরেই রেখে দেন। তারপর বাদগে ও আমি খাবার জন্যে নীচের তলায় নেমে যাই। ফিরে এসে দেখি, নাথুরাম তখনো মাথা-ব্যাথায় শয্যাগত রয়েছেন। কাছেই গোপাল গড্‌সে তাঁর রিভলবার মেরামত করছেন। খানিক পরে আপ্তে, করকারে, মদনলাল ও বাদগে ঘরের ভেতরকার আর-একটি ঘরে চলে যান। আমিও তাঁদের অনুসরণ করি। সেখানে তাঁরা তার কেটে কোনো জিনিষে তা লাগাচ্ছিলেন। তাঁরা ঠিক কি করছিলেন, আমি বুঝতে পারি নি।"

প্রশ্ন : কিছু আলোচনার পর অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ তোমাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। তোমাকে দেওয়া হয় একটি রিভলবার ও হাতবোমা ?

উত্তর : আমাকে একটি পিস্তল ও একটি বোমা দেওয়া হয়েছিলো।

প্রশ্ন : ম্যারিনা হোটেল থেকে যাত্রা করবার সময় বাদগে তোমাকে

বলেছিলেন যে, তিনি যাঁকে লক্ষ্য করে হাতবোমা ছুড়বেন তোমাকেও তাঁকেই লক্ষ্য করে হাতবোমা ছুড়তে হবে ; তিনি যাঁকে লক্ষ্য করে গুলী করবেন তোমাকেও তাঁকেই লক্ষ্য করে গুলী করতে হবে। বাদগে আরো বলেছিলেন যে, উক্ত বৃদ্ধ লোক 'গান্ধীজী' নামে পরিচিত, তাঁকে খতম্ করতে হবে।

উত্তর : বাদগে আমাকে এরূপ কথা কখনো বলেন নি।

তারপর শঙ্কর যা বলেন তা বাদগের জবানবন্দীরই সমর্থন।

সবশেষে শঙ্কর বলেন, "বাড়ীর চাকর হিসাবে সর্ব্বদাই আমি বাদগের সঙ্গে নানা জায়গায় যেতাম। আমি গরিব লোক। বাদগে বলেছিলেন বলেই আমি দিল্লী এসেছিলাম। বাদগের কাপড় কাচা, ঘর ঝাঁট দেওয়া, জলতোলা প্রভৃতি কাজ করেই আমাকে জীবিকানির্ব্বাহ করতে হতো। মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আমি কিছুই জানি না।"

আটচল্লিশ

গোপাল গড্‌সের কথা

১৯শে নভেম্বর তারিখে গোপাল গড্‌সে আদালতে এক বিবৃতি দান করেন। তাঁর বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হয়েছে, বিবৃতিতে তিনি সব কিছুই অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন যে, তিনি নির্দ্দোষ ; কোনো বে-আইনী কাজ, অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার জন্যে কারো সঙ্গে তিনি ষড়যন্ত্র করেন নি।

১৯৪৮ সালের জানুয়ারি মাসের ১৭ই থেকে ২৫শে পর্য্যন্ত তিনি তাঁর নিজগ্রাম উক্সানে ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে কোনোদিন তিনি দিল্লী,

বোম্বাই অথবা পুণায় ছিলেন না। জানুয়ারি মাসের ২৬শে থেকে ৩রা ফেব্রুয়ারি পর্য্যন্ত কিরকি আপিসে কর্ম্মনিযুক্ত থাকাকালীন উত্তেজিত জনতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তিনি পুলিশের সাহায্য-ভিক্ষা করেছিলেন। অভিযোগে বলা হয়েছে যে, ৫ই ফেব্রুয়ারি উক্সানে তাঁকে গ্রেফ্তার করা হয়। এ-কথা সত্য নয়। বস্তুত ঐ দিন, জনতার হাত থেকে রক্ষা করা হবে, এই অছিলায় তাঁকে বোম্বাই নিয়ে যাওয়া হয়।

বিড়লা ভবনে ২০শে জানুয়ারি তারিখের সন্ধ্যার ঘটনা সম্পর্কে গোপাল গড্সে বলেন যে, ঘটনার কোনো প্রত্যক্ষদর্শীই তাঁর বিরুদ্ধে কিছু বলেন নি।

গোপাল গড্সে আরো বলেন, "আমি বিবাহিত, আমার স্ত্রী রয়েছেন, দু'টি সন্তানও আছে,—আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতার কথাও আমাকে ভাবতে হয়। মহাত্মার কথা দূরে থাক্—কোনো জাতির বা কোনো ব্যক্তিবিশেষের বিরুদ্ধেও কখনো কোনো দুরভিসন্ধি আমি অন্তরে পোষণ করি নি, এবং এখনো করি না। ২০শে অথবা ৩০শে জানুয়ারি তারিখে বিড়লা ভবনে অনুষ্ঠিত ঘটনাবলী সম্পর্কে আমার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আনা হয়েছে তার সমস্তই আমি অস্বীকার করছি। আমি সম্পূর্ণ নিরপরাধ। আমার প্রার্থনা এই যে, আমার প্রতি ন্যায়বিচার করে আমাকে মুক্তি দেওয়া হোক।"

উনপঞ্চাশ

সাভারকরের কথা

২০শে নভেম্বর তারিখে গান্ধী-হত্যা মামলার অন্যতম আসামী শ্রীযুত বিনায়ক দামোদর সাভারকর সাতান্ন পৃষ্ঠাব্যাপী একটি সুদীর্ঘ বিবৃতি পাঠ

করেন। বিবৃতিতে দেশ-বিভাগ সম্পর্কিত অংশ পাঠকালে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েন, তাঁর দু'চোখ বেয়ে অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ে। "স্বাধীনতার সংগ্রামে একজন সৈনিক হিসাবে আমিও যুদ্ধ করেছি। সমকালীন কোনো দেশপ্রেমিক নেতার চেয়ে আমার বিগত পঞ্চাশ বৎসর কালের ত্যাগ ও দুঃখবরণ এতোটুকুও কম নয়"—এই কথা কয়টি পড়বার সময় পকেট থেকে রুমাল বের করে তিনি নির্গত অশ্রুধারা মার্জ্জনা করেন।

সাভারকর বলেন, "আমার বিরুদ্ধে যে-সব অপরাধের অভিযোগ আনা হয়েছে আমি তার একটি অপরাধেও অপরাধী নই; ওরূপ কোনো অপরাধ করবার কোনো হেতুও আমার ছিলো না। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি যে, সরকারপক্ষের অভিযোগ অনুযায়ী কোনো দলীয়-চুক্তি বা ষড়যন্ত্রে আমি কখনো লিপ্ত ছিলাম না, কিংবা ঐরূপ কোনো অপরাধ-অনুষ্ঠানের পরিকল্পনার কথাও আমি জানতাম না। আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। অতএব আমার উপর বিন্দুমাত্র দোষারোপ না করে আমাকে মুক্তি দেওয়া হোক।"

তিনি বলেন যে, "সরকারপক্ষের সমস্ত সাক্ষ্যপ্রমাণের কাঠামো মাত্র দু'টি বাক্যের উপর গঠিত,—প্রথমটি শোনা-কথা, দ্বিতীয়টি অনুমান। দু'টি অভিযোগই করেছেন বাদগে এবং তা থেকেই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রমাণ করবার চেষ্টা করা হয়েছে। প্রথম বাক্যে বাদগে বলেছেন যে, আপ্তে তাঁকে বলেছিলেন—আমি গান্ধী, নেহ্‌রু ও সুরাবর্দ্দিকে খতম করে দেবার কথা আপ্তেকে বলেছিলাম। দ্বিতীয় বাক্যে বাদগে বলেছেন যে, তিনি শুনেছেন—আপ্তে ও গড্‌সেকে আমি বলেছি, "কৃতকার্য্য হয়ে ফিরে এসো।" এই কথায় বাদগে অনুমান করেছেন যে, এর সঙ্গে আপ্তে-কথিত প্রথম বাক্যের যোগ আছে। এ ছাড়া সরকার-পক্ষের রাশিকৃত সাক্ষ্যপ্রমাণের কলেবর বৃদ্ধির জন্যে আর যা-কিছু হয়েছে

—গাড়ি-বোঝাই চিঠিপত্র, খানাতল্লাস, মন্ত্রী থেকে ফিল্ম-তারকা ও মহারাজা থেকে ট্যাক্সিচালক পর্য্যন্ত বহুসংখ্যক সাক্ষীর সাক্ষ্য—সকলেরই উদ্দেশ্য হচ্ছে,—ঐ ষড়যন্ত্র-নাটকের মঞ্চাভিনয়কে আরো জোরালো ও ঘোরালো করে তোলা। আমার সংশ্লিষ্ট মামলাসম্পর্কে ঐ সবই নিরর্থক।

"বাদগের উক্ত কথা দু'টির মধ্যে প্রথম বাক্যটি শোনা-কথা মাত্র। রাজসাক্ষী তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে, আপ্তে তাঁকে এই কথা বলেছিলেন। আপ্তে ও গড্‌সে দু'জনেই, বাদগে ঐ কথা বলেছেন বলে, অস্বীকার করেছেন। বাদগের অভিযোগের সমর্থনে যথার্থ সাক্ষ্যপ্রমাণের সম্পূর্ণ অভাব। বাদগের প্রথম অভিযোগ কেবল শোনা-কথাই নয়, অসমর্থিত শোনা-কথা।"

বাদগের দ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে সাভারকর বলেন যে, এ-ক্ষেত্রেও আপ্তে এবং গড্‌সে বলেছেন যে, তাঁদের তিনজনের (আপ্তে, গড্‌সে ও বাদগের) তাঁর (সাভারকরের) বাড়ীতে আসা এবং সাভারকর কর্ত্তৃক উপরি-উক্ত বাক্য উচ্চারণ 'সাজানো ঘটনা ও সম্পূর্ণ মিথ্যা।" "অতএব দেখা যাচ্ছে, যেহেতু আমার বিরুদ্ধে আনীত মামলার ভিত্তি সম্পূর্ণরূপে যে-দু'টি কথার উপর গঠিত সে-দু'টি অভিযোগই কোনো আদালতে বিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য হতে পারে না, সেই হেতু আমার বিরুদ্ধে মামলা স্বতই টিকতে পারে না এবং আমার নির্দ্দোষিতা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়।"

বাদগে আরো অভিযোগ করেছেন যে, ১৯৪৬ সালের শেষের দিকে সাভারকর-সদনে একটি সভার অনুষ্ঠান হয়। সেই সভায় সাভারকর, হিন্দু-মুসলমান-সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, মুসলমানেরা আক্রমণ করলে হিন্দুদের আত্মরক্ষা করতেই হবে। বাদগের অভিযোগকে যদি সত্য বলেও ধরে নেওয়া হয় তবু সেই সভার সঙ্গে এই ষড়যন্ত্র-মামলার কোনো সম্পর্কই প্রমাণিত হয় না। কিন্তু আসল ঘটনা হচ্ছে এই যে,

ঐরূপ কোনো সভারই অনুষ্ঠান হয় নি, সাভারকরও ঐরূপ কোনো বক্তৃতা দেন নি।

"বাদগে তাঁর সাক্ষ্যদান কালে আরো বলেন যে, গড্‌সে ও আপ্তের দিল্লী যাত্রার পূর্ব্বে তাঁদের না কি আমি বলেছিলাম, "সফলকাম হয়ে ফিরে এসো।" আপ্তে, বাদগেকে একথা বলেছিলেন, তা যদি সত্য বলেও ধরে নেওয়া যায়, তবু একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে, আপ্তে বাদগেকে যা বলেছিলেন তা সত্যি কি না? গান্ধী, নেহ্‌রু ও সুরাবর্দ্দিকে খতম করবার জন্যে আপ্তেকে আমি কোনো কথা বলেছিলাম—এমন কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। হিন্দু-সংগঠনকারীদের উপর আমার নৈতিক প্রভাবের সুযোগ নিয়ে, নিজের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, আপ্তে হয়তো ঐরূপ জঘন্য মিথ্যার অবতারণা করেছেন। আপ্তে ও গড্‌সে দু'জনেই দৃঢ়ভাবে অস্বীকার করেছেন যে, আমার সম্পর্কে বাদগের কাছে তাঁরা এরূপ কোনো মিথ্যা বাক্য বলেন নি। নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই এবং রাজসাক্ষীরূপে অনুকম্পালাভের প্রত্যাশাতেই পুলিশের চাপে পড়ে আমাকে এই মামলায় জড়াবার জন্যে বাদগে ঐরূপ মিথ্যাভাষণ করেছেন।"

"আমার বিরুদ্ধে বাদগের মিথ্যা সাক্ষ্য দেবার হেতু খুব পরিষ্কার। তিনি নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন যে, পুলিশ হয়তো আশা করছে, যদি তারা কোনো জনবরেণ্য নেতাকে এই মামলায় জড়াতে পারে তবে সমস্ত দেশ জুড়ে তাঁদের একটা চমকপ্রদ আত্মপ্রচারের সুযোগ হবে, যে-সুযোগ অন্য কোনোরূপেই আর আসতে পারে না। এরূপ মারাত্মক অভিযোগের আসামীরূপে বাদগের মতো লোক নিশ্চয়ই ধারণা করতে বাধ্য যে, আত্মরক্ষার একমাত্র পথ রাজসাক্ষী হওয়া এবং অপরিহার্য্য রাজসাক্ষীরূপে নিজেকে পুলিশের ইচ্ছার কাছে সঁপে দেওয়া। আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানই তার একমাত্র স্বাভাবিক পরিণতি।"

বিবৃতিপ্রসঙ্গে সাভারকর তাঁর ব্যক্তিগত জীবন, ১৯৪৫ সাল থেকে

অদ্যাবধি তাঁর রাজনৈতিক কার্য্যকলাপ এবং হিন্দু মহাসভার উদ্দেশ্য, আদর্শ ও রাজনৈতিক মতবাদের আলোচনা করেন। হিন্দু মহাসভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিলো হিন্দু-সংগঠন। তা ছাড়া হিন্দুদের মধ্যে সামরিক শিক্ষাদানও ছিলো সভার অন্যতম উদ্দেশ্য। হিন্দু মহাসভার আদর্শ ছিলো এই যে, মূলত ভারত হবে একটি ধর্ম্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, সেখানে ধর্ম্ম, জাতি ও শ্রেণীনির্ব্বিশেষে প্রত্যেক অনুগত নাগরিকের থাকবে সমান কর্ত্তব্য ও সমান অধিকার। কিন্তু সভা কিছুতেই সহ্য করতে সম্মত হয় নি যে, কেবলমাত্র মুসলমান বলেই ঐ সম্প্রদায়ের লোকদের ন্যায্য-প্রাপ্যের চেয়েও অনেক বেশি দিতে হবে, নচেৎ তাঁরা অনুগত নাগরিক থাকবেন না; এবং মুসলমানদের খুশি করবার জন্যে হিন্দুদিগকে তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য ও অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সেই অধিকার তুলে দিতে হবে মুসলমানদের হাতে।

একাদিক্রমে ছ'বৎসর হিন্দুমহাসভার সভাপতি ছিলেন বলে স্বভাবতই তিনি তাঁর কর্ত্তৃত্বাধিকারসম্পন্ন মুখপাত্ররূপে গণ্য হতেন। মহাসভার কর্ম্মী ও স্বেচ্ছাসেবকরূপেই নাথুরাম গড্‌সে, আপ্তে ও ডাঃ পারচুরের সঙ্গে ঘটেছিলো তাঁর পরিচয়। ভারতের অন্যান্য হিন্দু-সংগঠনকারী নেতার মতো তিনিও ভারতের সর্ব্বপ্রদেশে মহাসভাপন্থী দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশের জন্যে উৎসাহ ও সাহায্য দানে চেষ্টিত ছিলেন। আপ্তে ও গড্‌সে 'অগ্রণী' নামে একটি মারাঠি পত্রিকা প্রকাশ করেছিলেন। তার সাহায্যার্থে সাভারকর আগাম পনেরো হাজার টাকা দেবেন বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। আপ্তে ও গড্‌সে অগ্রণীর পরিচালনা করতেন বলেই যে তিনি অগ্রণীর সমর্থক ছিলেন তা নয়, হিন্দু মহাসভার দলীয় কাগজ ছিলো বলেই তিনি তার উৎসাহদাতা ছিলেন। অগ্রণীর মতবাদ সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত হতো আপ্তে ও গড্‌সের দ্বারা।

সাভারকর বলেন, "সরকারপক্ষের দলিলী সাক্ষ্য থেকে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, কেবলমাত্র মহাসভার কার্য্য সম্পর্কে আপ্তে ও গড্‌সের সঙ্গে আমার সংযোগ ছিলো। সরকারপক্ষের অভিযোগ এই যে, তাঁদের হাতে এমন অসংখ্য দলিল রয়েছে যাতে প্রমাণ করা যায়, আসামীদের সঙ্গে—বিশেষত গড্‌সে ও আপ্তের সঙ্গে, আমার সম্পর্ক এতো ঘনিষ্ঠ ছিলো এবং তাঁদের পথপ্রদর্শক ও গুরুরূপে আমার প্রতি তাঁদের এরূপ অবিসম্বাদিত ভক্তি ছিলো যে, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে ও আমার অনুমতি না নিয়ে তাঁরা ঐরূপ কাজ (হত্যাকাণ্ড) করবার কথা ভাবতেও পারতেন না ; এবং আমার অনুমোদন না থাকলে এই হত্যাকাণ্ড আদৌ অনুষ্ঠিত হতো না।"

"উপরি-উক্ত অভিযোগসমূহ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও যুক্তিহীন। আদালতকে আমার প্রতি বিরুদ্ধভাবাপন্ন করবার জন্যে ঐসব অভিযোগ করা হয়েছে। সরকারপক্ষের হাতে যে-দশ-হাজার পত্র রয়েছে তাদের কোনোটিতে এমন একটি শব্দ বা পংক্তি নেই যাতে আমাকে এই মামলায় জড়ানো যেতে পারে। আপ্তে ও গড্‌সে এই ষড়যন্ত্র অনুষ্ঠানে আমার পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন, অতএব অপরাধের সঙ্গে আমিও সংশ্লিষ্ট রয়েছি বলে গণ্য করা যেতে পারে, সরকারপক্ষের এই উক্তি পক্ষপাতদুষ্ট।"

"বহু ব্যক্তিই নিজ সম্প্রদায়ের ধর্ম্মগুরুর প্রতি ও তাঁর নির্দ্দেশিত ধর্ম্মীয় অনুশাসনের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা সম্পন্ন থাকেন। কিন্তু অনুগামীদের কেউ যদি কোনো অপরাধ করেন তবে অপরাধীদের গুরু হবার জন্যেই তাঁকেও কি অনুগামীদের অপরাধের সঙ্গে কখনো জড়ানো হয়ে থাকে ? অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত বহু লোকেরই পিতা, মাতা, ভ্রাতা বা আত্মীয়-স্বজনের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে এবং তাঁদের নিকট আনুগত্য প্রকাশ করে তাঁরা পত্রাদিও লেখেন। কিন্তু যেহেতু তাঁরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের প্রতি এতো বাধ্য সেই হেতু আইনে কি একথা ধরে নেওয়া হয় যে,

অপরাধ করতে যেয়ে আসামীরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গেও পরামর্শ করেছিলো? অথবা কোনো রাজনৈতিক নেতার অসংখ্য অনুগামীদের মধ্যে কেউ যদি কোনো অপরাধ করেন তবে রাজনৈতিক নেতাকে কি তার জন্যে পুলিশের কাছে কৈফিয়ৎ-ভাজন হতে হবে?"

১৯০৮ সাল থেকে গান্ধীজীর সঙ্গে পরিচয়ের কথা বর্ণনা করে সাভারকর বলেন যে, "কোনো কোনো বিষয়ে আমাদের আদর্শের মধ্যে মৌলিক মতভেদ থাকলেও, বহু বিষয়ে আমাদের মতের ঐক্যও ছিলো; এবং আমাদের পরস্পরের মধ্যে সর্ব্বদাই শ্রদ্ধা ও ব্যক্তিগত শুভেচ্ছার সম্পর্কই বিদ্যমান ছিলো।"

শ্রীযুত সাভারকর তাঁর বিরুদ্ধে সরকারপক্ষের সমস্ত অভিযোগের বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে বলেন যে, তাঁর সম্বন্ধে এই বিষয়গুলিই বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য :—

"(১) ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনায় বা পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত কোনো কার্য্যকলাপে ব্যক্তিগতভাবে আমি যুক্ত ছিলাম বা অংশ গ্রহণ করেছিলাম —আমার বিরুদ্ধে এরূপ কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ একেবারেই নেই।

"(২) আমার অধিকারে বা কর্ত্তৃত্বে এমন কোনো অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্য অথবা অনুরূপ আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায় নি যার জন্যে আমাকে এই মামলায় অভিযুক্ত করা যেতে পারে।

"(৩) গত বছর-দশেকের মধ্যে আমার লিখিত প্রায় হাজার খানেক চিঠিপত্রের মধ্যে এমন একটি শব্দ বা এমন কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় নি যার জন্যে আমাকে এই মামলায় জড়ানো যেতে পারে।

"(৪) আমার বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগের ভিত্তি মাত্র তিন-চারটি বাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, সে বাক্যও আবার শোনা-কথা, এবং যে-সাক্ষীর মুখে তা উক্ত হয়েছে তিনিও তা, শোনাকথা বলেই স্বীকার করেছেন। তা ছাড়া সেই কথা বিশ্বাসযোগ্য কোনো ব্যক্তির দ্বারা সমর্থিতও হয় নি।

"(৫) ত্যাগ ও দেশসেবার জন্যে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত নেহ্রুকে আমি অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি। একই-উদ্দেশ্যে-প্রণোদিত কর্ম্মের জন্যে যখনই তাঁদের গ্রেফ্তার করা হয়েছে তখনই ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টকে আমি তীব্র নিন্দা করেছি। গান্ধীজীর পারিবারিক দুঃখ-শোকেও আমি অংশ গ্রহণ করেছি, তাঁর মুক্তিতে আনন্দ প্রকাশ করেছি। গান্ধীজী পঁচাত্তর বৎসর বয়সে পদার্পণ করলে আমি তাঁর দীর্ঘজীবন কামনা করেছিলাম, গান্ধীজীও আমার ষষ্টিতম জন্মোৎসবে আমাকে তাঁর আশীর্ব্বাণী পাঠিয়েছিলেন। এই সব থেকেই প্রমাণিত হয় যে, আদর্শগত বা কর্ম্মগত কিছু পার্থক্য থাকলেও আমরা তাকে কখনো ব্যক্তিগত বিদ্বেষে পরিণত হতে দিই নি।

"এই সব প্রণিধানযোগ্য বিষয় থেকে আমার বক্তব্য এই যে, ফৌজদারি মামলার জন্যে যেরূপ প্রমাণের আবশ্যক হয়, সেই মানদণ্ড অনুসারে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কোনোটিকেই, সরকারপক্ষ প্রমাণ করতে সক্ষম হন নি।"

বিবৃতি-পাঠ শেষ হলে বিচারপতি, শ্রীযুত সাভারকরকে যে-সব প্রশ্ন করেন তার সংক্ষিপ্ত রূপ এই :—

বিচারক : জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহ শেষ হবার দু'-তিন পরে মদনলাল ডাঃ জৈনকে বলেন যে, আপনি তাঁর (মদনলালের) আমেদনগরের দুঃসাহসিক কার্য্যকলাপের কথা শুনে তাঁকে ডেকে পাঠান। মদনলাল এলে প্রায় ঘণ্টা দুই ধরে তাঁর সঙ্গে আপনি আলাপ-আলোচনা করেন। পরে তাঁর পিঠ চাপড়ে বলেন, "কাজ চালিয়ে যাও।"—এ সম্বন্ধে আপনি কিছু বলতে চান?

সাভারকর : এ-সব কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাঁর সঙ্গে আমার দেখাই হয় নি।

প্রশ্ন : ১৫ই জানুয়ারি দীক্ষিত মহারাজের বাড়ীর প্রাঙ্গণে নাথুরামের সম্মুখে, আপ্তে বাদগেকে বলেন যে, আপনি স্থির করেছেন—মহাত্মা

গান্ধী, পণ্ডিত নেহ্‌রু ও জনাব সুরাবর্দ্দিকে খতম করতে হবে এবং সে-কাজের ভার আপনি তাঁদের উপরেই দিয়েছেন। এ-সম্পর্কে আপনার বলবার কিছু আছে?

উত্তর: এ-ও সর্ব্বৈব মিথ্যা। আপ্তে কিংবা অন্য কাউকে এমন কথা আমি বলি নি।

প্রশ্ন: ১৭ই জানুয়ারি নাথুরাম গড্‌সে, আপ্তে ও বাদগে আপনার বাড়ী গিয়েছিলেন। গড্‌সে ও বাদগে উপরতলায় চলে যান, বাদগে নীচের ঘরে অপেক্ষা করতে থাকেন। পাঁচ-দশ মিনিট পর আপ্তে ও গড্‌সে ফিরে আসেন। তাঁদের পেছন-পেছন আপনিও এসে বলেন, "সফলকাম হয়ে ফিরে এসো।"

উত্তর: এ-ঘটনা একেবারেই মিথ্যা।

প্রশ্ন: আপনার বাড়ী থেকে ফিরে যাবার পথে গড্‌সে ও বাদগেকে আপ্তে বলেন যে, আপনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন—গান্ধীজীর একশো বছর পরমায়ুর শেষ হয়েছে, অতএব তাঁদের কাজ-যে সাফল্যমণ্ডিত হবে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

উত্তর: আপ্তে কি বলেছে না-বলেছে, আমি জানি না। তবে আমি কাউকে এমন কথা বলি নি।

প্রশ্ন: প্রকাশ যে, গত ১৭ই জানুয়ারির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত নাথুরাম গড্‌সে, আপ্তে, করকারে, মদনলাল, ডাঃ পারচুরে ও বাদগের সঙ্গে আপনার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো।

উত্তর: হ্যাঁ, নাথুরাম ও আপ্তের সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিলো। করকারে, বাদগে ও ডাঃ পারচুরের নামও আমি জানতাম; কিন্তু তাঁদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিলো না। মদনলালের সম্পর্কে আমি বলতে পারি যে, তাঁর নামও আমি শুনি নি।

প্রশ্ন : আপনার বিরুদ্ধে সরকারি সাক্ষ্য-আপনি শুনেছেন। আদালতের নিকট আপনার আর-কিছু বক্তব্য আছে ?

উত্তর : আমি যা বলেছি তার বেশি কিছু আমার বলবার নেই।

পঞ্চাশ

পারচুরের কথা

বিবৃতিদানপ্রসঙ্গে ডাঃ পারচুরে বলেন, "রাজনীতি সম্পর্কে যাঁরা আমার বিরোধী তাঁরা ২৮শে জানুয়ারি তারিখে গড্‌সের নোয়াখালি গমন ও আমার যে-একটি পিস্তল ছিলো তার সুযোগ গ্রহণ করে আমাকে গান্ধী-হত্যা মামলায় জড়িত করেছেন। একথা সত্য যে, দিল্লীতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যে কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক দেবার অনুরোধ জানাতেই গত ২৮শে জানুয়ারি গড্‌সে ও আপ্তে আমার বাড়ী গিযেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রস্তাব আমি অগ্রাহ্য করি।"

গত ৩০শে জানুয়ারি সন্ধ্যায তিনি যখন তাঁর ডাক্তারখানায় ছিলেন তখনই গান্ধী-হত্যার সংবাদ তিনি প্রথম জানতে পারেন। জনৈক লোক তাঁকে ডাক্তারখানা বন্ধ করে দিতে বলে ; পারচুরেও তৎক্ষণাৎ ডাক্তারখানা বন্ধ করে চলে যান।

পারচুরে বলেন, "এই উপলক্ষে ৩০শে জানুয়ারি আমার বাড়ীতে মিষ্টি এনে তা বিতরণ করা হয়েছিলো, এ-কথা সত্য নয়।"

মধুকর কালের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, "মধুকর কালে ও তাঁর সঙ্গীরা এক হয়ে আমাদের রাজা ও ভারতীয় ইউনিয়নের পুলিশের সহায়তায়

গোয়ালিয়রের বিরোধীদলের প্রতিপত্তিশালী নেতা হিসাবে আমাকে পর্য্যুদস্ত করবার জন্যে, গান্ধীজীর মৃত্যুর পর যে-সব গুজব প্রচারিত হয়েছে তারই উপর ভিত্তি করে, মহাত্মা গান্ধী-হত্যার ষড়যন্ত্র-কাহিনীর সৃষ্টি করেছে।"

তিনি বলেন, পুলিশের নির্য্যাতনের ভয়েই তিনি তাঁর স্বীকারোক্তি করতে বাধ্য হয়েছিলেন। জেলে থাকবার সময় পুলিশ-কর্ম্মচারীগণ এসে তাঁকে নানারূপ প্রশ্ন করতেন, বহু ইঙ্গিতও দিতেন। কিন্তু বোম্বাই-পুলিশের দেউলকর নামক কর্ম্মচারী এসে তাঁকে ভীতি প্রদর্শন ও উপদেশ দান করতে সুরু করেন। তাঁকে বলা হয় যে, তাঁর পরিবারস্থ সকলকেই গ্রেফ্‌তার করা হয়েছে। আরো বলা হয়,—একটি সর্ব্বভারতীয় ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। পারচুরে স্বাক্ষরে অসম্মতিজ্ঞাপন করলে, দেউলকর জানান যে, তাতে পারচুরের পরিবারের সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। নাথুরাম যে ২৮শে জানুয়ারি পারচুরের বাড়ী গিয়েছিলেন,—পারচুরে কেবল এই কথাটুকু স্বীকার করতে চান। পুলিশ-কর্ম্মচারীটি বলেন যে, তাতে হবে না। তা ছাড়া আরও জানান যে, তাঁর ছেলের কাছ থেকে তাঁর পিস্তলটি হস্তগত করা হয়েছে। সেই পিস্তলটি নাথুরামের কাছ থেকে পাওয়া গেছে,—পুলিশ একথা বলতে কিছুমাত্র ইতস্তত করবে না। এই কথা শুনবার পরেই অত্যন্ত হতাশ হয়ে পারচুরে স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর করতে স্বীকৃত হন। শেষে তিনি বলেন, "গান্ধী-হত্যা-মামলা সম্পর্কে আমার বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ করা হয়েছে সে-সম্বন্ধে আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ; এবং আমার বিচার করবার অধিকার এই আদালতের নেই। সুতরাং আমি প্রার্থনা করি যে, আমার প্রতি ন্যায়বিচার করে আমাকে মুক্তি দেওয়া হোক।"

বিবৃতির পর বিচারক, ডাঃ পারচুরেকে নিম্নলিখিতরূপ প্রশ্ন করেন:

বিচারক: ২৮শে জানুয়ারি নাথুরাম ও আপ্তে কয়েকটি রিভলবার দেখেন এবং আপনার বাড়ীর পেছন-দিককার উঠানে সেগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষা করেন। এই মামলার ফেরারি আসামী গঙ্গাধর এস. দণ্ডবতে, আপনার পিস্তলটি আপ্তে ও গড্‌সেকে দেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। অবশ্য আপনি তাতে সম্মত হন নি। যাই হোক, দণ্ডবতের মারফৎ জগদীশপ্রসাদ গোয়েলের কাছ থেকে তাঁদের জন্যে একটি পিস্তল সংগ্রহ করেন।

পারচুরে: সব মিথ্যে কথা।

প্রশ্ন: ৩০শে জানুয়ারি সকালে জগন্নাথ সিংয়ের সঙ্গে দেখা হলে আপনি তাঁকে বলেন যে, একটা ভালো কাজ করা হলো, হিন্দু ধর্ম্মের একজন বিরুদ্ধাচারীকে হত্যা করা হয়েছে, এবার থেকে হিন্দুধর্ম্ম নিরাপদ হলো। আপনি আরো বলেছিলেন যে, যে-লোক গান্ধীজীকে হত্যা করেছে এবং যে-লোক ২০শে জানুয়ারি তারিখে বোমাবিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তারা আপনারই লোক, কেবল তাই নয়, পিস্তলটি পাঠানো হয়েছিলো গোয়ালিয়র থেকে এবং হত্যাকারী ব্যক্তি দক্ষিণ ভারতীয়, সে গোযালিয়রেই ছিলো। এ-বিষয়ে আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর: এ একেবারেই মিথ্যা। আদালতে ছাড়া জগদীশপ্রসাদ গোয়েলকে ইতিপূর্ব্বে আমি আর-কখনো দেখি নি।

প্রশ্ন: ১৮ই ফেব্রুয়ারি গোয়ালিয়রের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত অটলের সুমুখে আপনি একটি স্বীকারোক্তি করেছিলেন।

উত্তর: স্বীকারোক্তিতে স্বাক্ষর আমারই বটে, কিন্তু স্বীকারোক্তিটি আমার নয়। শ্রীযুত অটল ছ'পাতা কাগজ আমার সামনে বের করেছিলেন। কাগজে কি লেখা আছে, তা না জানিয়েই কাগজের উপর আমাকে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করা হয়। যে-অবস্থায় পড়ে

আমাকে স্বাক্ষর করতে হয়েছিলো তা আমি আমার লিখিত বিবৃতিতেই উল্লেখ করেছি। সে-সময় আমি ফেরিন্‌জাইটিস ও বাত-ব্যাধিতে ভুগছিলাম।

প্রশ্ন : সদাশিব গোপাল পারচুরে আপনার পিতা এবং গোপালকৃষ্ণ পারচুরে আপনার পিতামহ। সদাশিব গোপাল পারচুরে জন্মেছিলেন পুণায়। সেখানে তাঁর পৈতৃক সম্পত্তি ছিলো। পুণাতেই তিনি শিক্ষালাভ করেন এবং বোম্বাইয়ে চাকরি পান।

উত্তর : আমি আমার পিতার জন্মস্থান, সম্পত্তি, শিক্ষা বা চাকরিস্থল সম্পর্কে কিছুই জানি না।

প্রশ্ন : বিভিন্ন সাক্ষী কেন আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিলেন, সে-সম্বন্ধে আপনার কিছু বলবার আছে?

উত্তর : টাঙ্গাওয়ালা গরিবা ও জুম্মা পুলিশের চাপে পড়েই আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছে। তা ছাড়া—আমি "গোয়ালিয়র-রাজ্য-হিন্দু-সভা"র কর্ম্মী ছিলাম, আর জুম্মা ছিলো মুসলমান, অতএব আমার বিরুদ্ধে তার বিদ্বেষপ্রকাশের সুযোগ সে ছাড়ে নি। বছর দুই আগে মধুকর কেশব কালেকে আমি আমার প্রতিষ্ঠান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম, সুতরাং সে আমার উপর শত্রুভাবাপন্ন ছিলো। এতদ্ব্যতীত তাঁকে এবং তাঁর পরিবারকে নির্ভর করতে হতো কংগ্রেস-সরকারের সাহায্যের উপর। অধিকন্তু সে পুলিশ-গোয়েন্দা গঙ্গাধর পটবর্দ্ধনের বন্ধু, পটবর্দ্ধন নিশ্চয়ই তাঁকে শিখিয়ে-পড়িয়ে দিয়েছেন। রামদয়াল সিংয়ের সাক্ষ্যদানের হেতু—রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। জগন্নাথ রামদয়ালের বন্ধু, অতএব বন্ধুর বিরুদ্ধে তিনি যেতে পারেন না। আর জগদীশ যে আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন তার কারণ, পুলিশের নিদারুণ চাপ। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত অটলের বেতন তাঁর অসদাচরণের জন্যেই গত দশ বছরের মধ্যে বৃদ্ধি পায় নি। কিন্তু এই মামলায় সাক্ষ্য

দিয়ে দিল্লী থেকে ফিরবার পরই তাঁর বেতন বৃদ্ধি হয়েছে একশো টাকা।
আর আমার বলবার কিছু নেই।

একান্ন

দফ্‌তরির সওয়াল

ডাঃ পারচুরের বিবৃতিদানের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধী-হত্যা মামলার দ্বিতীয় পর্ব্ব শেষ হলো। এইবার সুরু হবে তৃতীয় পর্ব্ব, অর্থাৎ সওয়ালের পালা: ১লা ডিসেম্বর তারিখে সরকারপক্ষের প্রধান কৌসুলি শ্রীযুত দফ্‌তরি আরম্ভ করলেন সেই সওয়াল।

আসামীদের বিরুদ্ধে গঠিত অভিযোগের উল্লেখ করে শ্রীযুত দফ্‌তরি বলেন যে, গান্ধী-হত্যা কেবল এক নম্বর আসামীর (নাথুরাম গড্‌সের) একলার কাজ নয়, গড্‌সে ও অন্যান্য আসামীদের মধ্যে ষড়যন্ত্র, হত্যার সহায়তা ও প্ররোচনার ফলেই এই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূল অপরাধ, অর্থাৎ হত্যাকার্য্য, আসামী কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে। অন্যান্য আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই যে, তাঁরা নিজের হাতে হত্যাকর্ম্ম করেন নি বটে, কিন্তু হত্যার ষড়যন্ত্রে তাঁরা যুক্ত ছিলেন, হত্যাপরাধ অনুষ্ঠানে সহায়তাও তাঁরা করেছেন। যদি ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রমাণিত হয়,—আমি দেখাবোও যে, তা প্রমাণিত হয়েছে—তবে হত্যাকাণ্ডে সহায়তা করবার অপরাধে অভিযুক্ত আসামীরা হয় ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০-বি ধারা, না হয় ১০৭ (২) ধারা অনুসারে দণ্ডনীয় হবেন।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে ভোররাজ্যে যাবার পথে বাদগের সঙ্গে যখন দ্বিতীয় আসামীর সাক্ষাৎ হয়, ব্যাপারটার প্রথম সূত্রপাত ঘটে

সেইদিন। আপ্তে বাদগেকে সেখানে বলেছিলেন যে, তাঁর (বাদগের) কাছ থেকে তাঁদের কিছু অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদের প্রয়োজন।

আদালতের সম্মুখে বিবৃত পূরো ঘটনা থেকে একটি প্রণিধানযোগ্য ব্যাপার লক্ষ্য করা যায় যে, সাভারকর ও পারচুরে ব্যতীত, ৯ই জানুয়ারির পূর্ব্বে অন্যান্য আসামীদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিলো। নাথুরাম গড্‌সে, আপ্তে, করকারে, মদনলাল, গোপাল গড্‌সে, বাদগে ও শঙ্কর, একে অন্যের সঙ্গে, কিংবা পরস্পর যুক্তভাবে, অথবা সকলে একসঙ্গে মেলামেশা করতেন। ১৪ই ও ১৭ই জানুয়ারি সভারকরের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁরা। নাথুরাম ও আপ্তে দিল্লী রওনা হন ১৭ই জানুয়ারি। বাদগে ও শঙ্কর দিল্লী যাত্রা করেন সম্ভবত তার পরদিন। দিল্লীতে না থাকা সম্পর্কে গোপাল গড্‌সে যে-কারণ দেখিয়েছেন তা সরকারপক্ষের সাক্ষ্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যহীন। ২০শে জানুয়ারি তারিখে তিনি-যে কেবল দিল্লীতেই ছিলেন তা নয়, বোমাবিস্ফোরণের সময় বিড়লা ভবনেও উপস্থিত ছিলেন।

১৯শে অথবা ২০শে জানুয়ারি তারিখে দিল্লীতে তাঁদের উপস্থিতির কথা স্বীকার করলে আর কোনোই সন্দেহ থাকে না যে, একটা ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছিলো এবং সেই ষড়যন্ত্রে তাঁরা সকলেই হাত মিলিয়েছিলেন। তাঁদের একটিমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো—মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা।

আসামীদের ছদ্মনাম গ্রহণের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, উদ্দেশ্য যদি বৈধ হয় তবে ছদ্মনাম গ্রহণের কি প্রয়োজন থাকতে পারে? যেভাবে তাঁরা দিল্লীতে এসেছিলেন এবং যেভাবে সেখানে বাস করেছিলেন তা থেকে বেশ বোঝা যায় যে, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিলো বেআইনী কর্ম্মের অনুষ্ঠান।

তিনি বলেন, রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য-যে সর্ব্ববিষয়ে প্রত্যক্ষ-সমর্থন হবে, তার কোনো কথা নেই। সমর্থনের কোনো নির্দ্দিষ্ট মানদণ্ড নেই; সাক্ষ্যের পরিবেশ, প্রকৃতি ও পরিধি অনুসারে তার বিভিন্নতা ঘটে থাকে। রাজসাক্ষীর বিবৃতি সাধারণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলেই যথেষ্ট।

১৭ই জানুয়ারির ঘটনাবলী বিভিন্ন সাক্ষীর সাক্ষ্যে পূর্ণরূপেই সমর্থিত হয়েছে। কয়েক জায়গায় গিয়ে আসামীদের অর্থ সংগ্রহের কথা তাঁরা উল্লেখ করেছেন। ২০শে জানুয়ারি সকালে বিড়লা ভবন পরিদর্শন সম্পর্কে বাদগের সাক্ষ্যে প্রমাণিত হয় যে, ১৭ই থেকে ১৯শে জানুয়ারির মধ্যে আপ্তে বিড়লা ভবন পরিদর্শন করেছিলেন।

বাদগে বলেছেন যে, ২০শে জানুয়ারি ম্যারিনা হোটেলে আসামীরা সকলেই ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি নিজে নামগ্রহণ করেছিলেন 'ব্যাণ্ডো'।

এ-নামও খুব তাৎপর্য্যপূর্ণ, কারণ, নাথুরাম গড্‌সের ডায়েরিতে লেখা রয়েছে এই নাম। অতএব নাথুরাম ও আপ্তের মনে যে আগে থেকেই ছদ্মনাম গ্রহণের মতলব ছিলো,—একথা প্রমাণ করা খুব শক্ত নয়। গড্‌সে ও আপ্তে দিল্লী যাবার সময় যে 'দেশপাণ্ডে' ও 'করকারে' নাম গ্রহণ করেছিলেন, একথা তাঁরা স্বীকার করেছেন। বাদগের কথায় জানা যায় যে, এই নাম তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন ২০শে জানুয়ারি তারিখে।

বাদগের বিবৃতির সর্ব্বত্রই বলা হয়েছে যে, মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রের সক্রিয় প্রস্তাব এসেছিলো আপ্তের কাছ থেকে। বাদগেও বারবার বলেছেন এবং তাঁর জবানবন্দী থেকেও এই ধারণা হয় যে, আপ্তেই হত্যা-ষড়যন্ত্রের সলাপরামর্শে নায়কতা করেছেন। কিছুকাল পরে গড্‌সেকে সেই কর্ম্মানুষ্ঠানে প্ররোচিত করা হয়। আপ্তেই সব সময় সক্রিয় থেকে নেতৃত্ব করেছেন। ষড়যন্ত্র অনুযায়ী কাজ হচ্ছে কি না, আপ্তেই তার তদারক করতেন।

৯ই জানুয়ারি তারিখে হিন্দু রাষ্ট্র আপিসের ঘটনার উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সেদিন আপ্তে গড্‌সেকে বলেছিলেন, তাঁদের একটা কাজ শেষ হলো। সাক্ষ্যে আরো জানা গেছে যে, বাদগের প্রশ্নের উত্তরে আপ্তে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, অস্ত্রশস্ত্র ও গোলা-বারুদের কেন প্রয়োজন তা

তিনি তাঁকে জানাবেন। জেরাতেই স্বীকৃত হয়েছে যে, ৯ই জানুয়ারি নাথুরাম গড্‌সে, আপ্তে ও বাদগের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ও গুলীবারুদের কথা হয়েছিলো,—হয়তো এই ষড়যন্ত্রের জন্যে কিংবা অন্য কোনো উদ্দেশ্যেই প্রয়োজন ছিলো এই অস্ত্রশস্ত্রের।

বাদগেও ষড়যন্ত্রকারীদের একজন ছিলেন; কেবল ২০শে জানুয়ারি বিড়লা ভবনে শেষ মুহূর্তে তিনি বেঁকে দাঁড়িয়েছিলেন,—এই কারণে তাঁর সাক্ষ্যের উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করা চলে না,—বিবাদীপক্ষের কৌঁসুলির এই যুক্তির উল্লেখ করে শ্রীযুত দফ্‌তরি বলেন যে, একথা বিদিত যে, বাদগে উন্নত নৈতিক চরিত্রের অধিকারী ছিলেন না, কিংবা উচ্চতর সামাজিক স্তরের ব্যক্তিও ছিলেন না। কিন্তু কেবল এই জন্যেই তাঁর সম্পূর্ণ সাক্ষ্যকে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না।

করকারের জেরার কথা আলোচনা করে তিনি বলেন, বাদগের কাছ থেকে একটি চিঠি পাওয়া গেছে। জনৈক হস্তলিপিবিশেষজ্ঞ ঐ চিঠি পরীক্ষা করে বলেছেন যে, চিঠিটি করকারের হাতেই লেখা। ঐ পত্রে লেখক জানিয়েছেন যে, বাদগেকে তিনি টেলিগ্রাম মনিঅর্ডারে চারশো টাকা পাঠিয়েছেন। জেরার সময় বাদগেকে প্রশ্ন করা হয়েছিলো, ঐ টাকা তিনি পেয়েছেন কি না। তিন নম্বর আসামীর কৌঁসুলিও একটি আবেদনপত্রে বলেছেন, ঐ চিঠিটি ছেঁড়া বলেই আইনত তা মূল্যহীন এবং গ্রহণীয় দলিল নয়। এই সকল ঘটনায় বাদগের কথাই সমর্থিত হয়েছে, এবং প্রমাণিত হয়েছে যে, করকারে ও বাদগে পরস্পর পরিচিত ছিলেন এবং চিঠিটিও করকারেরই লেখা।

বোমাবিস্ফোরণও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। অন্যান্যের মতো মদনলালও এর কথা আগে থেকেই জানতেন। মদনলাল বলেছেন, বাদগে তাঁকে বিক্রি করবার জন্যে গান-কটন-স্ল্যাব ও হাতবোমা দিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি তা বিক্রি না করে তদ্দ্বারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করবার সিদ্ধান্ত করেন;

কিন্তু জেরার মুখে তা সমর্থিত হয় নি। ওটা একটা নিছক বানানো গল্প।

যে-দৃঢ়তা ও নির্ভরতার সঙ্গে বাদগে জেরার সম্মুখীন হয়েছিলেন, তাঁর সাক্ষ্যের মূল্য নির্দ্ধারণকালে আদালতকে সেই কথা স্মরণ করতে অনুরোধ করেন শ্রীযুত দফ্‌তরি। বাদগে যেভাবে সাক্ষ্য দিয়েছেন তাতে মনে হয় যে, তিনি যা বলেছেন তা সত্য ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। কাহিনীটি যদি মিথ্যা হতো তবে তিনি তা এমন বিশদভাবে কখনো বলতে পারতেন না।

অতঃপর তিনি কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে কিছু অংশ পাঠ করে বলেন যে, এই সব সাক্ষী, রাজসাক্ষী বাদগের উক্তিই সমর্থন করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি সিনেমা-অভিনেত্রী শান্তা মোদক,দীক্ষিত মহারাজ, দাদা মহারাজ, আমছেকর, ট্যাক্সিচালক সুরজিৎ সিং, সুলোচনা দেবী প্রভৃতির জবানবন্দীর উল্লেখ করেন।

তারপর তিনি বলেন যে, আদালতের একটি প্রশ্নের উত্তরে মদনলাল বলেন যে, গ্রেফ্‌তারের সময় তাঁর গায়ে কোনো সার্জের কোট ছিলো না। কিন্তু পূর্ব্ব-পাঞ্জাবের প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত শাহনী সেদিন দিল্লীর পুলিশ-ইনস্পেক্টর শ্রীদশবন্ধু সিংয়ের উপস্থিতিতেই মদনলালের নিকট থেকে হাতবোমা ইত্যাদি উদ্ধার করেছিলেন। তাঁরা দু'জনেই বলেছেন যে, মদনলালের গায়ে একটি সার্জের কোট ছিলো, পুলিশ তাও হস্তগত করে। তাঁরা সেই কোটটি সনাক্তও করেন। এস্থলে লক্ষণীয় এই যে, আসামীপক্ষের কৌসুলি ঐ কোট সম্পর্কে এই সাক্ষীদের কোনো প্রশ্নই করেন নি। অবশ্য ঐ কোটটি নিজের বলে আপ্তে অস্বীকার করেন।

আপ্তে তাঁর জবানবন্দীতে বলেছেন যে, ২০শে জানুয়ারি তিনি হিন্দু মহাসভা ভবন থেকে বাদগে ও শঙ্করকে নিয়ে একটি প্রাইভেট মোটরে করে বিড়লা ভবনে গিয়েছিলেন। গাড়িখানি সেদিনের জন্যে তাঁর জিম্মাতেই ছিলো। আপ্তে, গোপাল গড্‌সে, বাদগে ও শঙ্করকে তাঁর

ট্যাক্সিতে করে বিড়লা ভবনে নিয়ে গিয়েছিলো বলে সুরজিৎ সিং যে-সাক্ষ্য দিয়েছে, আপ্তের উক্ত মন্তব্য তার বিরোধী। আপ্তে-যে প্রাইভেট গাড়ি ব্যবহার করেছিলেন সে-সম্পর্কে কোনোরূপ সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করলেই কেবলমাত্র সুরজিৎ সিংয়ের ব্যক্তব্য সম্পর্কে সন্দেহের কারণ দেখা দিতে পারতো। কিন্তু আসামীপক্ষ থেকে সেরূপ কিছুই করা হয় নি। সে যাই হোক, আপ্তের বিবৃতি ও সুরজিৎ সিংয়ের সাক্ষ্য—দু'টির মধ্যেই একটি ঘটনার সামঞ্জস্য আছে যে, ২০শে জানুয়ারি তারিখে তাঁরা সবাই বিড়লা ভবনে গিয়েছিলেন। তা ছাড়া, আদালতে মিথ্যা কাহিনী বলবার মতো কোনো কারণই যাদের থাকতে পারে না,—ছোটু্রাম, ভূর সিং প্রভৃতি বিড়লা ভবনের সেই সব বিশ্বাসী সাক্ষীদের সাক্ষ্যেও সেদিন বিড়লা ভবনে ঐ সব আসামীর উপস্থিতির কথা প্রমাণিত হয়েছে।

শ্রীযুত চমনলাল গ্রোভারের সাক্ষ্যের সঙ্গেও বাদগের জবানবন্দীর আংশিক মিল রয়েছে। তিনি বলেছেন যে, তাঁর সুমুখেই শঙ্কর, হিন্দুমহাসভা ভবনের পেছনদিকের জঙ্গল থেকে দু'টি হাতবোমা উদ্ধার করে। এই হাতবোমা দু'টি বিড়লা ভবনে বাদগে ও শঙ্করের কাছেই ছিলো, এবং পরে বাদগের নির্দ্দেশেই শঙ্কর তা মাটির নীচে পুঁতে রেখেছিলো।

শ্রীপি. ডি. গোদবোলে স্বীকার করেছেন যে, বিক্রি করবার জন্যে গোপাল গড্‌সের কাছ থেকে তিনি একটি রিভলবার পেয়েছিলেন। গোবিন্দ কালেও গোদবোলের কথা সমর্থন করেছেন এই বলে যে, গোপাল গড্‌সে গোদবোলেকে খুব ভালোভাবেই জানতেন। জানুয়ারি মাসের ২২শে কি ২৩শে, গোপাল একটি রিভলবার দিয়েছিলো গোদবোলেকে, এবং সেই রিভলবার গোপালের কাছেই ছিলো ৩০শে জানুয়ারি পর্য্যন্ত। দিল্লীতে যে-দু'টি রিভলবার আনা হয়েছিলো, ঐটি নিশ্চয়ই তার মধ্যে একটি।

বাদগে বলেছেন, যে-ট্যাক্সিতে করে তাঁরা বিড়লা ভবনে গিয়েছিলেন

সেই ট্যাক্সিতেই তিনি দু'টি কাপড়ে-মোড়া রিভলবার একটি ব্যাগে পুরে রেখে দিয়েছিলেন। ট্যাক্সিচালক তাঁর সাক্ষ্যে বলেছে যে, তিনজন যাত্রীর মধ্যে বিড়লা ভবন থেকে গোপালই ট্যাক্সিতে ফিরে এসেছিলেন। গোপালকে গ্রেফ্‌তার করবার সময় সেই ব্যাগটি তাঁর কাছ থেকে পাওয়া যায়। বাদগের বক্তব্যের সঙ্গে এ-কাহিনীরও মিল আছে।

চারজন সাক্ষী, করকারে ও মদনলালকে এবং দু'জন সাক্ষী, গোপাল গড্‌সেকে সনাক্ত করেন। দিল্লীতে আসেন নি বলে গোপাল যা বলেছেন তা সত্য নয়। শেরিফ হোটেলের একজন সাক্ষীও, আমছেকর ও গোপালকে শেরিফ হোটেলে দেখেছিলেন। এ-থেকেই প্রমাণিত হয় যে, গোপাল দিল্লীতেই ছিলেন, এবং করকারে ও মদনলালকে তিনি দেখেছিলেন। এর সঙ্গেও বাদগের বক্তব্যের মিল আছে, কারণ, তিনি বলেছেন যে, ২০শে জানুয়ারি গোপাল গড্‌সে বিড়লা ভবনেই ছিলেন।

ম্যারিনা হোটেলের সাক্ষীরা বলেছে যে, নাথুরাম ও আপ্তে হোটেলের চল্লিশ নম্বর ঘরে ছিলেন। করকারের জন্যে সেই ঘরে তিন পেগ হুইস্কিও দেওয়া হয়েছিলো। তা ছাড়া পাঁচ কাপ চা-ও দেওয়া হয়েছিলো ঐ ঘরে। হোটেল-রেজিস্টারির স্বাক্ষর এবং ধোপার নিকট চল্লিশ নম্বর ঘরের বাসিন্দাদের বস্ত্রের মার্কা দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, ঐ ঘরে যাঁরা ছিলেন তাঁরা নাথুরাম গড্‌সে ও আপ্তে ছাড়া আর কেউ নন। অভ্যর্থনা-কেরাণী এবং প্রধান বেয়ারাও তাঁদের সনাক্ত করেছে। যে-বেয়ারা হুইস্কি দিয়েছিলো সে বলেছে, তাঁকে মদও সরবরাহ করা হয়েছিলো। প্রধান বেয়ারা বলেছে যে, ২০শে জানুয়ারি বিকেলে চল্লিশ নম্বর ঘরে পাঁচ কাপ চা দেওয়া হয়েছিলো। নাথুরাম বলেছেন, তিনি চা খান নি। অতএব ধরে নেওয়া যায় যে, সেদিন বিকেলে নাথুরাম ছাড়া আরো পাঁচজন লোক ঐ ঘরে জমায়েৎ হয়েছিলেন, এবং ঐ পাঁচজনের জন্যেই পাঁচ কাপ চা দেওয়া হয়েছিলো। হোটেলের চিরকুট থেকে জানা যায় যে, চল্লিশ নম্বর

ঘরে মদ্য পরিবেশন করা হয়েছিলো। 'বিলে'র সঙ্গে তার দামও জুড়ে দেওয়া হয়েছিলো, এবং চল্লিশ নম্বরের বাসিন্দারাই তা শোধ করেছিলেন। এই থেকেই প্রমাণিত হয় যে, নাথুরাম ও আপ্তের সঙ্গে করকারে মিলিত হয়েছিলেন। আরো প্রমাণিত হয় যে, নাথুরাম ও আপ্তের সঙ্গে মদনলালও মিলিত হয়েছিলেন; কারণ ২০শে জানুয়ারি রাত্রে মদনলাল পুলিশ-অফিসারদের নিয়ে গিয়েছিলেন ম্যারিনা হোটেলের চল্লিশ নম্বর ঘরেই। বাসিন্দাদের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে কিরূপে তিনি পুলিশ-কর্ম্মচারীদেরকে একটি বিশেষ ঘরে নিয়ে যেতে পারেন?

এক্ষণে প্রমাণিত হয়েছে যে, করকারে, মদনলাল ও গোপাল গড্‌সের মধ্যে সাক্ষাৎ হয়েছিলো; এবং নাথুরাম, আপ্তে, করকারে, মদনলাল ও গোপাল গড্‌সের মধ্যে যোগাযোগ ছিলো। এ-কথা যদি সত্য হয় তবে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহই থাকতে পারে না যে, এঁরা একই উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলেন। সাক্ষ্যে জানা গেছে যে, এঁদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের পরিচয় ছিলো, এঁরা বোম্বাইয়ে ছিলেন, সেখানে দীক্ষিত মহারাজের বাড়ীতে এঁরা জড়ো হয়েছিলেন এবং এঁদের কথা থেকেই জানা গেছে যে, বিভিন্ন তারিখে এঁরা এখানে এসেছিলেন। বস্তুত এঁরা এখানে এসেছিলেন একই উদ্দেশ্য নিয়ে এবং সেই হেতুই ম্যারিনা হোটেলের চল্লিশ নম্বর ঘরে সকলে একত্র হয়েছিলেন।

বিস্ফোরণের পরে গোপাল গড্‌সে ও করকারে ভিন্ন দলের অন্য সবাই দিল্লী ত্যাগ করেন। গোপাল ও করকারে সেদিন ফ্রন্টিয়ার হিন্দু হোটেলে রাত কাটান। পরদিন ভোরে গোপাল চলে যান বোম্বাই, আর করকারে মথুরায়।

ফ্রন্টিয়ার হিন্দু হোটেলের ম্যানেজার রামপ্রকাশ তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে, ২০শে জানুয়ারি রাত প্রায় ন'টার সময় দুই ব্যক্তি হোটেলে গিয়েছিলেন। হোটেল-রেজিস্টারিতে কিরূপে গোপাল গড্‌সের উপস্থিতির সময় বিকেল

চারটে লেখা হলো, তার কোনো কারণ অবশ্যি তিনি দেখাতে পারেন নি। ম্যারিনা হোটেলে বিকেলে তাঁদের একত্র হওয়ার ব্যাপারের সঙ্গে উক্ত সময়ের অসামঞ্জস্য রয়েছে। গোপাল গড্‌সের উপস্থিতি সম্পর্কে হয় রাম-প্রকাশ মিথ্যা বলেছেন, না হয় গোপাল গড্‌সে পূর্ব্বে কোনো এক সময়ে হোটেলে এসে ইচ্ছে-করেই ঐ সময় লিখে রেখে গিয়েছিলেন। রামপ্রকাশের মিথ্যা বলবার কোনো হেতু নেই। রামপ্রকাশ বলেছেন যে, দিনের বেলায় গোপাল আর-একবার হোটেলে এসেছিলেন; তখন তাঁকে ঘর দেখানো হয়েছিলো এবং খরচপত্র ও অন্যান্য ব্যবস্থার কথা ঠিক হয়েছিলো।

বাদগে বলেছেন যে, তিনি, শঙ্কর, আপ্তে, করকারে ও মদনলাল বিকেলে চল্লিশ নম্বর ঘরের বাথরুমে গানকটনস্ল্যাবে ফিউজ তার ইত্যাদি লাগিয়েছিলেন। তখন নাথুরাম তাঁর বিছানায় শুয়েছিলেন এবং গোপাল গড্‌সে তাঁর কাছে বসেই রিভলবার মেরামত করছিলেন। তাঁরা বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন বিকেল প্রায় পৌণে চারটেয়। ইতিমধ্যে গোপালের রিভলবার মেরামত শেষ হয়েছিলো, গোপালও সেই ঘরেই ছিলেন তখন। যখন তাঁরা বাথরুমে ছিলেন, গোপাল ও নাথুরাম তখন কি করছিলেন, বাদগে অবশ্য তার কোনো বিবরণ দিতে পারেন নি। কোনো বিবরণ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপরও নয়। ঐ সময়ের মধ্যে গোপালের পক্ষে হোটেলে গিয়ে রেজিস্টারিতে ঐরূপ সময় লিখে রাখবার যথেষ্ট অবসর ও সম্ভাবনা ছিলো। তিনি নিজে থেকেও তা করতে পারেন, কিংবা আর কারো প্ররোচনাতেও করে থাকতে পারেন। হোটেল-রেজিস্টারির সময় সম্পর্কে এই ব্যাখ্যাই হতে পারে; এবং বাদগের বিবৃতিতে অসামঞ্জস্য নেই বলেই তা মেনে নেওয়াও উচিত। বাদগের কথা এই জন্যেই বিশ্বাস করা উচিত যে,

যে ছ'জন সাক্ষীর সাক্ষ্য অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রতিপন্ন হয়েছে তার সঙ্গে বাদগের কথার মিল রয়েছে।

সরকারপক্ষের সাক্ষীদের সাক্ষ্য আলোচনা করে শ্রীযুত দফ্‌তরি বলেন যে, ২০শে জানুয়ারি-যে অভিযুক্ত আসামীগণ বিড়লা ভবনে প্রার্থনা-স্থলে গিয়েছিলেন, তার প্রমাণ আছে। আগে থেকে কোনোরূপ পরিকল্পনা না করেই তাঁরা সেখানে গিয়েছিলেন, এ-কথা ভাবা যায় না। গোপাল গড্‌সের ছুটির দরখাস্ত, দীক্ষিত ও দাদা মহারাজের নিকট রিভলবার প্রার্থনা, নাথুরাম কর্তৃক ইনসিওরেন্স পলিসির ওয়ারিশনামা লিখন, মহাত্মা গান্ধীর নীতির বিরুদ্ধে নাথুরাম, আপ্তে, করকারে ও মদনলালের একই প্রকার মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গী—সব কিছু জড়িয়ে দেখলে ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়।

আসামীপক্ষ বলেছেন যে, অধ্যাপক জৈন সংবাদপত্র পড়ে ষড়যন্ত্রের মিথ্যা কাহিনী রচনা করেছেন। কিন্তু এ একেবারেই অসম্ভব। কারণ, ২১শে জানুয়ারির কোনো সংবাদপত্রেই ষড়যন্ত্রের কথা বলা হয় নি। বস্তুত ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে এই সময়ে কিছুই জানা যায় নি। এ থেকেই বুঝা যায় যে, মদনলাল শ্রীযুত জৈনের কাছে গান্ধীজীকে হত্যা করার কথা হয়তো বলেছিলেন, না হলে গান্ধী-হত্যার ষড়যন্ত্রের কথা অধ্যাপক জৈন জানবেনই বা কেমন করে?

২৩শে জানুয়ারি আপ্তে ও নাথুরাম, ছদ্মনামে আর্য্য পথিকাশ্রমে ছিলেন। তাঁদের মতলব খারাপ না হলে তাঁরা মিথ্যা নাম গ্রহণ করবেন কেন? ২৭শে জানুয়ারি তাঁরা দিল্লী যান, সেখান থেকে যান গোয়ালিয়রে। একটি পিস্তলের জন্যে সেখানে ডাঃ পারচুরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তাঁরা। ডাঃ পারচুরে তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে, গোয়ালিয়রের সাক্ষীরা পুলিশের চাপে পড়েই তাঁর বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়েছেন। মধুকর কালের সঙ্গে গত ক'বছর ধরে শত্রুতা ছিলো তাঁর, সেই বিদ্বেষবশতই কালে তাঁর বিরুদ্ধে

সাক্ষ্য দিয়েছেন। কিন্তু জেরায় প্রমাণিত হয়েছে যে, মাত্র ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি মাসেই তাঁদের মধ্যে শত্রুতা সুরু হয়। সুতরাং কয়েক বছরের শত্রুতার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা।

নাথুরাম ও করকারে-যে ৩০শে জানুয়ারি তারিখে দিল্লীতে ছিলেন, তা-ও প্রমাণিত হয়েছে। দিল্লী রেল স্টেশনের সাক্ষীগণ—নাথুরাম, করকারে ও আপ্তে—এই তিনজনকেই স্টেশনের বিশ্রাম-কক্ষে দেখেছিলেন।

অতঃপর শ্রীযুত দফ্‌তরি মদনলালের পূর্বোক্ত কোটটির কথা উল্লেখ করে বলেন যে, ঐ কোটটি যে-স্যুট থেকে নেওয়া হয়েছে তার ট্রাউজারটি পাওয়া যায় আপ্তের একটি ট্রাঙ্কে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আপ্তে ও মদনলালের মধ্যে দীর্ঘ দিনের পরিচয় ছিলো।

সনাক্তকরণ প্যারেড সম্বন্ধে কৌসুলি বলেন যে, এ-সম্বন্ধে দু'টি বিষয় বিবেচ্য। প্রথম—গোয়েন্দা আপিসে বা তোঘলক রোড থানায় কোনো আসামীকে কোনো সাক্ষী দেখেছেন কি না। দ্বিতীয়—ঐসব স্থানের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা কিরূপ ছিলো? সব জায়গাতেই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বিত হয়েছিলো। নাথুরাম বলেছেন যে, তোঘলক রোড থানায় লোকজন তাঁকে দেখেছিলো, বিশেষত সুরজিৎ সিংয়ের সাক্ষ্য গৃহীত হয়েছিলো থানা-আপিসে, সেখান থেকে নাথুরাম যে-সেলে ছিলেন সে-সেল দেখা যায় না। বোম্বাই-গোয়েন্দা-আপিসে এবং সমস্ত সনাক্তকরণ প্যারেডেই-যে যথোপযুক্ত সতর্কতা অবলম্বিত হয়েছিলো,—শ্রীহলদিপুর, শ্রীনাগরওয়ালা, শ্রীচমনলাল গ্রোভার, শ্রীলালা কিষণচাঁদ প্রভৃতি সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকেই তা প্রমাণিত হয়েছে।

অতঃপর শ্রীযুত দফ্‌তরি প্রত্যেক আসামীর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যপ্রমাণ সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। প্রথমত নাথুরাম সম্বন্ধে বলেন যে, নাথুরাম তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন,—২০শে জানুয়ারির ঘটনাকে এক করে দেখা উচিত নয়। কিন্তু দু'টি ঘটনাই পরস্পর সংযুক্ত। তাঁর বিবৃতি থেকেই

বুঝা যায় যে, কার-বাঁচা-উচিত আর কার-মরা উচিত, সে-বিচারের ভার তিনি নিজেই নিয়েছিলেন। গান্ধীজীর হত্যা একটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড। কোনো মানুষেরই কাউকে হত্যা করবার অধিকার নেই।

নাথুরাম বলেছেন, আকস্মিক উত্তেজনাবশেই তিনি মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করেছেন। মহাত্মার অনশন ও তার ফলে পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা দানের ব্যাপার ২০শে জানুয়ারির অনেক আগেই ঘটেছিলো। সুতরাং আকস্মিক উত্তেজনার কথা অসম্ভব। এটি পূর্ব্ব সঙ্কল্পিত নৃশংস হত্যাকাণ্ড।

মহাত্মা গান্ধীর প্রার্থনা সভায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যে ডাঃ পারচুরের নিকট থেকে স্বেচ্ছাসেবক আনতে নাথুরাম ও আপ্তে গিয়েছিলেন গোয়ালিয়রে,—আসামীপক্ষ থেকে এই কথাই বলা হয়েছে। মদনলাল তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে, আশ্রয়প্রার্থী-শিবিরের কেউ-কেউ স্বতন্ত্র-ভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলো এবং কিছু লোক সেখানে গিয়েও ছিলো। এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহের জন্যে গোয়ালিয়রে যাওয়ার কথা সম্পূর্ণ বাজে।

বিচার্য্য বিষয় হলো,—এই লোকই মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করেছেন কি না? তাঁর বিবৃতিতে তিনি তা স্বীকার করেছেন।

অতঃপর তিনি আপ্তে, মদনলাল, শঙ্কর ও গোপাল গড্‌সের সম্পর্কে আলোচনা করেন। পরে সাভারকরের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে, সাভারকর-সদনে কর্ম্মীদের যে-বৈঠক হতো তাতে সাভারকর প্রবলভাবে মুস্লিমবিরোধী কার্য্যকলাপ প্রচার করতেন এবং মুসলমানদের 'বয়কট' করতে বলতেন। নাথুরাম ও আপ্তে-যে সাভারকরের উপর খুব বেশী নির্ভর করতেন তা তাঁদের পত্রালাপ থেকেই প্রমাণিত হয়। সুতরাং একটি উদ্দেশ্য নিয়ে ১৭ই জানুয়ারি দিল্লী যাত্রার পূর্ব্বে যে তাঁরা তাঁর সঙ্গে

সাক্ষাৎ করতে যাবেন—এ অসম্ভব নয়। ঐ সাক্ষাৎকারেই সাভারকর তাঁদের বলেছিলেন যে, 'সফল হয়ে ফিরে এসো।'

অতঃপর তিনি পারচুরের সম্পর্কে বলেন যে, ডাঃ পারচুরে শ্রীযুত অটলের নিকট একটি স্বীকারোক্তি করেছিলেন। যে-সব সত্য তাতে স্বীকৃত হয়েছে তা অপরাধমূলক। স্বীকারোক্তিটিও স্বেচ্ছাকৃত। আদালত যদি সেটিকে যথার্থ স্বীকৃতি বলে গ্রহণ করেন তবে পারচুরে সম্বন্ধে আর কোনোরূপ সমর্থনেরই প্রয়োজন হয় না।

তারপর তিনি-ডাঃ পারচুরের নাগরিকতার প্রশ্ন আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, সদাশিব গোপাল পারচুরে পুণায় জন্মেছিলেন বলেই তিনি বৃটিশ-প্রজা এবং সেই জন্যেই তাঁর পুত্র ডাঃ পারচুরে গোয়ালিয়রে জন্মগ্রহণ করলেও বৃটিশ-প্রজা। যে-কোনো লোক বৃটিশ-এলাকায় জন্মালেই বৃটিশ-প্রজা বলে গণ্য হবেন, বৃটিশ-এলাকা ত্যাগ করে অন্যত্র বসবাস করলেও সে-অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না। আইনে আছে যে, কোনো লোক যদি বৃটিশ-প্রজা হয় তবে তাঁর পুত্রের জন্ম যে-স্থানেই হোক না কেন পুত্রও যতোক্ষণ পর্য্যন্ত না যথাযথ অন্যরূপ ঘোষণা করেন ততোক্ষণ তিনি বৃটিশ-প্রজা বলেই বিবেচিত হবেন। তা ছাড়া ভারতীয় স্বাধীনতা আইন অনুসারে ভারত এবং ভারতে যোগদানকারী দেশীয় রাজ্যগুলিকেও বোঝায়; অতএব কেউ গোয়ালিয়রে ডোমিসাইল লাভ করলেও তাঁকে ভারতীয় নাগরিকই বলতে হবে। ডাঃ পারচুরে যদি বৃটিশ-প্রজা হন তবে তিনি এই আদালতের এলাকার মধ্যেই পড়েন।

সওয়ালের উপসংহারে শ্রীযুত দফ্‌তরি বলেন যে, এই ঘটনাকে ষড়যন্ত্র অথবা হত্যা, কিংবা হত্যা ও হত্যার সহায়তা—যা-ই মনে করা যাক না কেন, সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা সরকারপক্ষের অভিযোগ বেশ ভালোভাবেই প্রমাণিত হয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে যে,—নাথুরাম গড্‌সে নিঃসন্দেহে গোয়ালিয়র থেকে দিল্লীতে একটি পিস্তল নিয়ে এসেছিলেন; করকারে ও

মদনলালের সঙ্গে ছিলো বিস্ফোরক দ্রব্যপূর্ণ একটি ব্যাগ; ও নাথুরাম ও আপ্তে দিল্লী এসেছিলেন ২০শে জানুয়ারি তারিখে; গোপাল গডসে সঙ্গে করে যে রিভলবার এনেছিলেন, ২৭শে জানুয়ারি হিন্দু মহাসভার পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে সেটিকে পরীক্ষা করা হয়েছিলো; জানুয়ারির ১০ই থেকে ২০শে পর্য্যন্ত দিল্লীতে নাথুরাম, আপ্তে, মদনলাল, করকারে, গোপাল গডসে, বাদগে ও শঙ্করের সঙ্গে বিস্ফোরকদ্রব্যাদি ছিলো; এবং অপরাধ অনুষ্ঠানে তাঁরা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করেছেন।

মদনলাল একটি গানকটনস্ল্যাব বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন—এও প্রমাণিত হয়েছে। অন্যান্য আসামী সেই অপরাধ অনুষ্ঠানে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন। ষড়যন্ত্র অনুসারে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার অপরাধে সাভারকর সহ সকল আসামীই একজন আর-একজনকে সাহায্য করেছেন। নাথুরাম গডসে নিজে অনুষ্ঠান করেছেন সেই হত্যাকাণ্ডের।

বাহান্ন

মঙ্গলের সওয়াল

আপ্তের পক্ষের কৌসুলি শ্রীযুত মঙ্গলে, সওয়ালের প্রারম্ভেই বল্লেন যে, গত ছ'মাস যাবৎ এই মামলা সুরু হয়েছে। সাক্ষীদের মধ্যে পুলিশ, বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ও রেল-টেলিফোন-হোটেল প্রভৃতির কর্ম্মচারী থেকে আরম্ভ করে সিনেমা-অভিনেত্রী, ধর্ম্মগুরু, অধ্যাপক, জ্যোতিষী প্রভৃতি ছিলেন। সরকারপক্ষ বলেছেন যে, আসামীদের বিবৃতিতে যে-সব অভিযোগের কথা রয়েছে জেরার সময় সাক্ষীদের সে-সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নি, —পক্ষে বিবেচনা করেই ঐসব অভিযোগ করা হয়েছে।

আপ্তে ও গড্‌সে কর্ত্তৃক সাভারকরের নিকট লিখিত কতকগুলি চিঠির উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, ঐ চিঠিগুলি থেকে আপ্তের মনের অবস্থা জানা যাবে। চিঠিগুলিতে লিখিত বিষয় সম্বন্ধে কোনো বিরোধ থাকতে পারে না। আপ্তের বিবৃতিতে যে-বিক্ষোভ প্রদর্শনের কথা আছে, এই চিঠিগুলি তার কারণ প্রমাণ করতে সাহায্য করবে।

অতঃপর তিনি ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৮ সাল পর্য্যন্ত দেশের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের হিন্দুদের দুর্দ্দশা, কাশ্মীর আক্রমণের পর ভারত সরকার কর্ত্তৃক পাকিস্তানকে পঞ্চান্ন কোটি টাকা না-দেবার সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, পাকিস্তানকে টাকা দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য করার জন্যে মহাত্মা গান্ধীর অনশন ছিলো আপ্তের মতে অত্যন্ত বাড়াবাড়ি ব্যাপার। এই সব কারণেই আপ্তে প্রার্থনা সভায় বিক্ষোভ প্রদর্শনের সিদ্ধান্ত করেছিলেন। তদনুযায়ী আপ্তে ও নাথুরাম ১৪ই জানুয়ারি পুণা থেকে বোম্বাইয়ে যান। ১৪ই থেকে ১৭ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত তাঁরা কোথায় ছিলেন তৎসম্পর্কে সরকারপক্ষ থেকে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করা হয় নি। বোম্বাই সাউথ মেরিন ড্রাইভে অবস্থিত সী গ্রীন হোটেলের ম্যানেজার মিঃ ওয়াদিয়া-ই কেবলমাত্র তাঁদের অবস্থান সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। কিন্তু তিনি সনাক্তকরণ প্যারেডে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সরকারপক্ষ তাঁকে আদালতে হাজির করেন নি। এই ব্যাপারে একটু খোঁজখবর করলেই বাদগের উক্তির সত্যতা ধরা পড়ে যাবে বলেই ওয়াদিয়াকে আদালতে হাজির করা হয় নি।

১৭ই জানুয়ারি তারিখে আপ্তে ও গড্‌সে, দিল্লী যাত্রার পূর্ব্বে, বোম্বাইয়ের বিভিন্ন স্থানে গিয়েছিলেন। অন্যান্য স্থানে যাবার কথা সত্য বলেই, সেদিন সাভারকর-সদনে যাবার কথাও সত্য হবে তার কোনো যুক্তি নেই। হায়দ্রাবাদে আন্দোলন চালাবার জন্যে এবং তাঁদের পত্রিকার সাহায্যার্থে

অর্থসংগ্রহের ব্যাপারেই সেদিন তাঁরা নানা জায়গায় ঘোরাফেরা করেছিলেন। সরকারপক্ষের সাক্ষী শ্রীকালে কর্তৃক এ-কথা সমর্থিতও হয়েছে। বিমান-যাত্রার সময় আপ্তে ও গড্‌সেকে যে-কারণে অন্য নাম ব্যবহার করতে হয়েছিলো,আপ্তের বিবৃতিতে সে-কারণ উল্লিখিত হয়েছে। আদালত সে-কথা বিশ্বাস না করলেও, কেবল ছদ্মনাম গ্রহণ করেছিলেন বলেই আপ্তের বিরুদ্ধে বিরূপ মনোভাব অবলম্বন করা যেতে পারে না।

নাথুরাম ও আপ্তে ১৭ই তারিখে দিল্লী গিয়েছিলেন। ১৭ই, ১৮ই, ১৯শে—এই তিনদিন তাঁরা কি করেছিলেন, তাঁর কোনো প্রমাণ নেই। ঐ তিনদিন গান্ধীজীর প্রার্থনা সভার অনুষ্ঠান হয়েছিলো কি না, তারও প্রমাণ নেই। মহাত্মা গান্ধী অনশনভঙ্গ করেছিলেন ১৮ই জানুয়ারি তারিখে। তিনি এমন দুর্ব্বল ছিলেন যে, ঐদিন অথবা তার পরদিন তাঁর পক্ষে প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থাকা সম্ভবপর ছিলো না। ২০শে তারিখেই তিনি প্রার্থনা সভায় যোগ দিয়েছিলেন।

বোমাবিস্ফোরণের পরেই আপ্তে, নাথুরাম ও গোপাল এসে বাইরে-অপেক্ষমান ট্যাক্সিচালককে তাড়াতাড়ি গাড়ি ছেড়ে দিতে বলেন। এ তাঁদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক ছিলো। কারণ, অপ্রত্যাশিত ঘটনার দরুণ তাঁরা দ্রুত স্থানত্যাগ করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা যদি ষড়যন্ত্র করে থাকতেন তবে তাঁরা সেখান থেকে পালাতেন না। কারণ, ফরিয়াদীপক্ষের মতে বোমাবিস্ফোরণই তাঁদের একমাত্র পরিকল্পনা ছিলো না, গান্ধীজীর প্রতি রিভলবার ও হাতবোমা ছোড়াও পরিকল্পনার অঙ্গ ছিলো। উপরি-উক্ত কারণ-ছাড়া, স্থানত্যাগের আরো একটি কারণ হচ্ছে এই যে, সরকার তাঁদের ভালো চোখে দেখতেন না; হয়তো বোমাবিস্ফোরণের ব্যাপারে তাঁরা জড়িত হতে পারেন, এই ভয়ও ছিলো।

ফরিয়াদীপক্ষের সাক্ষ্য অনুসারে আপ্তে ও গড্‌সে ২৭শে

[illegible] তাঁরা সাড়ে এগারোটার সময় গোয়ালিয়রে পৌঁছে ডাঃ পারচুরের বাড়ী যান। কিন্তু রেলওয়ে টাইমটেবল অনুসারে জানা যায় যে, দিল্লী থেকে যে-ট্রেন ছাড়ে সেই ট্রেন গোয়ালিয়রে পৌঁছয় দশটায় এবং বোম্বাই থেকে যে-ট্রেন ছাড়ে সেটি পৌঁছয় রাত্রি সাড়ে এগারোটায়। যদি তাঁরা রাত্রি সাড়ে এগারোটায় গোয়ালিয়রে পৌঁছে থাকেন তবে নিশ্চয় তাঁরা বোম্বাইয়ের ট্রেনেই এসেছিলেন। এই একটি ব্যাপারেই ফরিয়াদী-পক্ষের বক্তব্য নাকচ হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া গরিবা টাঙাওয়ালার পক্ষে ছ'মাস দশদিন পরে সনাক্তকরণ প্যারেডে আপ্তে ও গড্সেকে সনাক্ত করা সম্ভবপর ছিলো না। যদি সে তাঁদের দেখেই থাকে তবে ২৭শে জানুয়ারি রাত্রি সাড়ে এগারোটার সময়েই দেখেছিলো, তা-ও খুব অল্প সময়ের জন্যে, এই অবস্থায় তার পক্ষে সনাক্তকরণ কিরূপে সম্ভবপর, তা বুঝে উঠা যায় না।

নাথুরাম ও আপ্তে, স্বেচ্ছাসেবক আনতে কেন গোয়ালিয়রে গিয়েছিলেন, এ-প্রশ্নের উত্তরে সরকারপক্ষের কৌঁসুলি বলেছেন যে, বোম্বাই ও পুণায় স্বেচ্ছাসেবক পাওয়া যাচ্ছিলো না বলেই তাঁরা ভেবেছিলেন যে, গোয়ালিয়রে গিয়ে ডাঃ পারচুরেকে কিছু স্বেচ্ছা-সেবক দেবার জন্যে মত করাতে পারবেন। সরকারপক্ষের কৌঁসুলি আরো বলেছেন যে, স্বেচ্ছাসেবকের জন্যে গোয়ালিয়রে যাবার কথা অসম্ভব বলে মনে হয়। যদি তা-ই হয়, তবে একটি পিস্তলের জন্যে গোয়ালিয়রে যাবার কথা আরো অসম্ভব বলে মনে হয়। আপ্তে তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে, বোম্বাইয়ে রিভলবার যোগাড় করা কঠিন ছিলো না।

মধুকর কেশব কালে তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে, ২৮শে জানুয়ারি তারিখে তিনি, নাথুরাম ও আপ্তেকে ডাঃ পারচুরের বাড়ীতে রিভলবার

পরীক্ষা করতে দেখেছিলেন। কিন্তু ঐ সাক্ষীই আবার বলেছেন যে, ১৯৪৭ সালের মে মাস থেকেই তিনি ডাঃ পারচুরের বাড়ী যাওয়া বন্ধ করেছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সেই মধুকর কেশব কালেই হঠাৎ ২৮শে জানুয়ারি তারিখে ডাঃ পারচুরের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলেন। অধিকন্তু ডাঃ পারচুরেও তাঁর তথাকথিত স্বীকারোক্তিতে, নাথুরাম ও আপ্তের রিভলবার পরীক্ষাকালে, কালের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করেন নি।

আপ্তের কাছ থেকে ৩১শে জানুয়ারির একটি রেলওয়ে টিকিট পাওয়া গেছে। তা থেকে এই প্রমাণিত হয় যে, আপ্তে সেদিন বোম্বাইয়ে ছিলেন। সেই টিকিটখানি জালও নয়, সেটি চুরিও করা হয় নি। ফরিয়াদীপক্ষ অস্পষ্টভাবে বলেছেন, যে, আপ্তে ও করকারে বিমানযোগে দিল্লী থেকে বোম্বাই গিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো সাক্ষ্য দ্বারাই তাঁরা তা প্রমাণ করেন নি। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, অন্যত্র ছিলেন বলে আপ্তে এই ব্যাপার দ্বারা ঘটনাটিকে সাজাতে চেয়েছিলেন, তবে তাঁর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা সহজ পন্থা ছিলো—কোনো টিকিটি কিনে, রেলে ভ্রমণ না করে, সেটি নিজের কাছে রেখে দেওয়া, অথবা কোনো বন্ধুকে তাঁর জন্যে একটি টিকিট কিনে আনতে বলা।

আপ্তের কাছ থেকে টেলিগ্রামের যে-রসিদ পাওয়া গিয়েছিলো তার উল্লেখ করে শ্রীযুত মঙ্গলে বলেন যে, ৩১শে জানুয়ারি, আপ্তের নির্দ্দেশেই কুমারী মনোরমা সালভা দিল্লী হিন্দু মহাসভার সেক্রেটারির নিকট ঐ তার করেছিলেন এবং তার-প্রেরণের সময় আপ্তেও বোম্বাই গ্র্যাণ্ট রোড টেলিগ্রাফ আপিসে উপস্থিত ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ৩১শে জানুয়ারি আপ্তে বোম্বাইয়ে ছিলেন। বিচারপতি মন্তব্য করেছেন যে, টেলিগ্রামের রসিদ থেকে শুধু এই বুঝা যায়, একটি টেলিগ্রাম পাঠানো হয়েছিলো। তা থেকে এই বুঝায় না যে, আপ্তে বোম্বাই টেলিগ্রাফ

আপিসেও ছিলেন। ঐ সম্পর্কে কুমারী মনোরমা সালভার উপস্থিত-সাক্ষ্যের প্রয়োজন।

ম্যারিনা হোটেলের বেয়ারার সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে শ্রীযুত মঙ্গলে বলেন যে, সেই বেয়ারা তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, ২০শে জানুয়ারি আপ্তে ও গড্‌সে, অতিরিক্ত তিন কাপ চা আনতে বলেছিলেন। অতিরিক্ত চা চাওয়ার অর্থ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়। চল্লিশ নম্বর ঘরের লোক কোনো একটি বিশেষ দিনে দু-এক কাপ চা তো বেশিও পান করতে পারেন।

পরিশেষে মঙ্গলে মন্তব্য করেন যে, উপরি-উক্ত যুক্তিগুলো বিবেচনা করে দেখলে বুঝা যাবে যে, সরকারপক্ষ আপ্তের বিরুদ্ধে যে-অভিযোগ গঠন করেছেন, সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা তা সমর্থিত হয় নি।

তিপান্ন

মেহ্‌তার সওয়াল

সওয়ালের প্রারম্ভেই শ্রীযুত মেহ্‌তা বলেন যে, শঙ্কর ছিলো বাগদের ভৃত্য, আনুগত্য সহকারে প্রভুর আদেশ পালনই ছিলো তাঁর কাজ। শঙ্কর অবশ্য ২০শে জানুয়ারি তারিখে তার বিড়লা ভবনে যাবার কথা স্বীকার করেছে। অন্যান্য আসামীরা শঙ্করের কাছে সব কথা বলতেন না, এবং শঙ্করও গান্ধী-হত্যার পরিকল্পনার কথা কিছুই জানতো না। এই ষড়যন্ত্রে যোগদানের ব্যাপারে তার কোনো উদ্দেশ্যও ছিলো না। তা ছাড়া হিন্দু মহাসভা বা অন্য কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্যও ছিলো না সে। বাদগের বিশ্বাসী ভৃত্য হিসাবেই সে অস্ত্রশস্ত্র বহনের কাজ করতো। তা থেকে এই বুঝায় না যে, ষড়যন্ত্রের কথা

সে জানতো। বাদগে ছিলেন তার প্রভু। প্রভু যা বলতেন—অনুগত ভৃত্য হিসাবে শঙ্কর সেই কাজই করতো। বাস্তবিকপক্ষে শঙ্করের নিজস্ব কোনো মানসিক সত্তা ছিলো না॥

এই সময়ে বিচারপতি বলেন যে, শঙ্করের যদি কোনো নিজস্ব মানসিক সত্তা না থাকবে, তবে কি করে তার পক্ষে এমন বিশ্বস্তভাবে তার প্রভুর আদেশ পালন করা, তথা ষড়যন্ত্রে যোগদান করা, সম্ভবপর হয়েছিলো? তা ছাড়া, বাদগে তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে, শঙ্কর ছিলো অত্যন্ত একগুঁয়ে। শঙ্করের যদি নিজস্ব কোনো মানসিক সত্তা না-থাকবে, তবে সেই উক্তির সঙ্গে এর সামঞ্জস্য কোথায়?

উত্তরে শ্রীযুত মেহ্‌তা বলেন যে, শঙ্কর বাদগের প্রভুভক্ত ভৃত্য, প্রভু তাকে যে-আদেশ করতেন, বিনা বিচারে সে তা পালন করতো। শঙ্কর তার বিবৃতিতেও বলেছে যে, বাদগে যখনই তাকে কিছু বহন করে নিয়ে যেতে আদেশ করেছেন, তখনই সে সেই আদেশ পালন করেছে। কি জিনিষ সে বহন করছে, তা তাকে জানতে দেওয়া হতো না। জানতে চেষ্টা করলে, তাকে চুপ করে থাকতে বলা হতো।

বস্তুত শঙ্কর বিশ্বাসী ভৃত্যই ছিলো মাত্র। সে না জানতো হিন্দু মহাসভার কথা, না জানতো ষড়যন্ত্রের কথা। হিন্দু মহাসভা ভবনে, বিড়লা ভবনে সে প্রভুর আদেশেই অস্ত্র বহন করে নিয়ে গেছে। কোনোরূপ প্রশ্ন না করেই আজ্ঞা পালন করেছে সে। এরূপ অবস্থায় স্বভাবতই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাকে জড়িত করা যেতে পারে না।

নাথুরামের নিজের সওয়াল

নিজের কৌন্সুলি শ্রীযুত ওকের পরিবর্তে নাথুরাম গডসে নিজেই স্বপক্ষের সওয়াল করেন। শ্রীযুত ওক অবশ্য সে-সময়ে আদালতেই অবস্থান করেন।

গডসে বলেন যে, মহাত্মা গান্ধীর হত্যা সম্পর্কে যা কিছু বলবার, তাঁর বিবৃতিতেই তিনি তা বলেছেন। গান্ধী-হত্যার স্বীকৃতির কথা আর তিনি প্রত্যাহার করতে চান না। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার যে-অভিযোগ আনা হয়েছে সে-সম্পর্কে স্বপক্ষ সমর্থনের কোনো ইচ্ছাই তাঁর নেই, সে-অভিযোগ অস্বীকারও করেন না তিনি। তবে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তিনি অস্বীকার করেন এবং তাঁর সওয়াল তারই সমর্থনে। সরকারপক্ষ বলেছেন যে, ষড়যন্ত্র অনুসারেই তিনি মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করেছেন, আর সেই ষড়যন্ত্র করেছেন তিনি এই মামলার অন্যান্য অভিযুক্ত আসামীদের সঙ্গে। বাদীপক্ষ আরো বলেছেন যে, ২০শে জানুয়ারি মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার চেষ্টা করা হয়, সেই চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার পর আসামীরা বোম্বাইয়ে চলে যান; সেখানে তাঁরা কোনো একটা সিদ্ধান্ত করেন; সিদ্ধান্ত স্থির হবার পর তাঁরা যান গোয়ালিয়রে; গোয়ালিয়র থেকে আসেন দিল্লীতে; সেখানে কয়েকজন আসামীর সাহায্যে তিনি মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করেন।

নাথুরাম তাঁর জীবনবীমা সম্পর্কে গোপাল গডসের স্ত্রীকে উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করার বিষয় উল্লেখ করে বলেন যে, ফরিয়াদীপক্ষ এ-বিষয়ের উপর যে-উদ্দেশ্য আরোপ করেছেন তা সত্যই অদ্ভুত। নাথুরামের-যে মাত্র ঐ ক'টি জীবনবীমাই ছিলো, আর-কোনো জীবনবীমা ছিলো না—তার কোনো প্রমাণ নেই। নাথুরাম তাঁর অন্যান্য সম্পত্তি

সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করেছিলেন, বাদীপক্ষ তা দেখায় নি। ঠিক রকম তিনি যদি মরবেন বলেই মনে করতেন, তবে জীবনবীমা সম্পর্কে উত্তরাধিকারী মনোনয়নের বেলায় তাঁর ভাই বা অন্য কোনো আত্মীয়ের কথাই আগে ভাবতেন। তাঁর বন্ধু আপ্তের স্ত্রী ও তাঁর ছোটো ভাইয়ের স্ত্রীকে উত্তরাধিকারিণী মনোনয়নের সময়ে তাঁর মানসিক গতি সম্পর্কে ফরিয়াদীপক্ষ যে-উদ্দেশ্য আরোপ করেছেন, তা-ও অতি অদ্ভুত।

হত্যার চূড়ান্ত ষড়যন্ত্র করবার পূর্বে আপ্তে ও গডসে বোম্বাইয়ে সাভারকর-সদনে গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করা হয়েছে। গডসে বলেন যে, ঐ ঘটনার সমর্থনে ফরিয়াদীপক্ষ কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করেন নি। সাভারকর-সদনে দ্বাররক্ষী, সাভারকরের দেহরক্ষী এবং আরো বহু লোক রয়েছে। ১৪ই জানুয়ারি সাভারকরের সঙ্গে দেখা করবার জন্যে নাথুরাম সেখানে গিয়েছিলেন, এ-কথা প্রমাণ করবার জন্যে উল্লিখিত ব্যক্তিদের একজনকেও আদালতে হাজির করা হয় নি,— এই বা কিরূপ?

১৫ই জানুয়ারি তারিখে আপ্তে, বাদগে ও করকারে দীক্ষিত মহারাজের বাড়ী গিয়েছিলেন,—বাদগের এই উক্তির সমর্থন করতে পারতো একমাত্র দীক্ষিত মহারাজের চাকর; কিন্তু আদালতে তাকেও হাজির করা হয় নি।

নাথুরাম আরো বলেন যে, ১৭ই জানুয়ারি তারিখে তিনি এবং আপ্তে সাভারকর-সদনে যান নি। এ-ঘটনার যাথার্থ্য প্রমাণার্থে সরকারপক্ষও কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থিত করেন নি। গোবিন্দ মালেকার তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে, বিড়লা ভবনে বোমাবিস্ফোরণের তিন দিন আগে তিনি নাথুরাম, বাদগে, গোপাল গডসে ও করকারেকে নয়া দিল্লীর মারিনা হোটেলে দেখেছিলেন; অথচ সরকারপক্ষ বলেছেন যে, ১৭ই জানুয়ারি তারিখে বাদগে বোম্বাইয়ে ছিলেন। ২০শে জানুয়ারি বিকেলে আপ্তে

বাদগে, করকারে, মদনলাল, গোপাল গড্‌সে ও শঙ্কর ম্যারিনা-হোটেলে মিলিত হয়েছিলেন, এ-কথা প্রমাণ করবার জন্যে কোনো সাক্ষ্য উপস্থিত করা হয় নি।

বাদগে বলেছেন যে, গান্ধীজীকে গুলী করবার পরিকল্পনায় তাঁর অংশ ছিলো এই যে, তিনি চৌকিদার ছোট্টুরামের ঘরে ঢুকে জাফরির ফাঁক দিয়ে মহাত্মা গান্ধীর উপর হাতবোমা ছুড়বেন। এ-সম্পর্কে যদি কোনো ষড়যন্ত্রই হয়ে থাকতো, তবে ষড়যন্ত্রকারীরা কি করে তাঁদেরই একজনকে বিপজ্জালে পা বাড়াতে দিতেন?

ন্যায়বিচারের দিকে লক্ষ্য করে শুধু এইটুকুই বলা যায় যে, ২০শে জানুয়ারি তারিখে বিস্ফোরণকালে নাথুরাম প্রার্থনা সভায় উপস্থিত ছিলেন না।

শ্রীযুত নাগরওয়ালা তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে, ২০শে জানুয়ারি থেকে সাভারকরের বাড়ীতে একজন প্রহরী মোতায়েন ছিলো। সাভারকর যদি ষড়যন্ত্রের মধ্যে থাকতেন তবে বোমাবিস্ফোরণের পর অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীগণ নিশ্চয়ই তাঁর কাছে যেতেন। কিন্তু তাঁরা কেউ ২১শে জানুয়ারির পর সাভারকরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, সাক্ষ্যপ্রমাণে এমন কিছুই নেই।

বাদগের সাক্ষ্য অনুযায়ী বলা যায়, ২০শে জানুয়ারি বিকেল চারটের সময় ম্যারিনা হোটেলে ষড়যন্ত্রকারীরা বোমায় ডেটোনেটার সংযুক্ত করেন। গোপাল গড্‌সে ছিলেন সেখানে। সেখানে তাঁরা ছদ্মবেশ ধারণ করেন, নিজেদের মধ্যে অস্ত্রশস্ত্র ভাগ করে নেন, কে কি করবেন ঠিক করেন, ছদ্ম নামও গ্রহণ করেন,—এবং বাদগের মতে সমস্তক্ষণই গোপাল গড্‌সে ম্যারিনা হোটেলেই ছিলেন। কিন্তু ফ্রন্টিয়ার হিন্দু হোটেলের ম্যানেজারের সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, ২০শে জানুয়ারি গোপাল গড্‌সে বিকেল চারটের সময় ফ্রন্টিয়ার হিন্দু হোটেলে গিয়ে ধীরেসুস্থে ম্যানেজারের সঙ্গে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট কথা বলেন এবং হোটেলে একটি ঘরও ঠিক

করেন। গোপাল গড্‌সে সেখানে ট্যাক্সিতেও যান নি বা মোটরে চড়েও যান নি। এ-অবস্থায় একই দিনে, একই সময়ে, এতো অল্পকালের মধ্যে, গোপালের পক্ষে ক্রণ্টিয়ার হোটেলে যাওয়া কিরূপে সম্ভব হতে পারে ?

বোমাবিস্ফোরণের পর গোপাল গড্‌সের পুণা গমনের কথা উল্লেখ করে নাথুরাম বলেন যে, পুণার একটি ইঞ্জিনীয়ারিং ফার্মের ম্যানেজার শ্রীযুত গোদবোলে তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে, গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের আট-দশ দিন আগে রাত ন'টার সময় গোপাল গড্‌সে তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। বাদগে বলেছেন যে, ২১শে জানুয়ারি সকালে গোপালকে তিনি দিল্লী হিন্দু মহাসভা ভবনে দেখেছেন। যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, ২১শে জানুয়ারি রাত্রেই গোপাল পাঞ্জাব-মেলে চড়েছিলেন, তবু তাঁর পক্ষে ২২শে জানুয়ারি সকালে পুণায় পৌছানো অসম্ভব। নাথুরাম বলেন যে, সাক্ষ্যের এই অংশটিও মিথ্যা।

অতঃপর নাথুরাম তাঁর ও আপ্তের গোয়ালিয়র যাত্রার কথা উল্লেখ করে বলেন যে, এই ব্যাপারে বিতর্কের বিষয় হচ্ছে—দিল্লী থেকে তাঁরা গ্র্যাণ্ড-ট্রাঙ্ক-এক্সপ্রেসেই গোয়ালিয়রে গিয়েছিলেন, না অন্য কোনো এক্সপ্রেসে গিয়েছিলেন। সরকারপক্ষ বলেছেন যে, ২৭শে জানুয়ারি বিমানে বোম্বাই থেকে দিল্লী আসবার পর তাঁরা গোয়ালিয়র পৌছলে গরিবা অথবা জুম্মা তাঁদের নিয়ে গিয়েছিলো ডাঃ পারচুরের বাড়ীতে। সাক্ষ্যের এই পরস্পরবিরোধী দু'টি অংশের মধ্যে কিছুতেই সামঞ্জস্য বিধান করা যায় না।

পারচুরের স্বীকারোক্তিতে এই কথা বলা হয়েছে যে, নাথুরাম ও পারচুরের মধ্যে কয়েক বছর ধরেই সদ্ভাব ছিলো না। সে-অবস্থায়, বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্যে "রাষ্ট্র সেনা" দলের স্বেচ্ছা-সেবক সংগ্রহের নিমিত্ত ডাঃ পারচুরের কাছে তাঁর যাবার কোনো মানেই হয় না ; পিস্তল যোগাড়ের চেষ্টায় সেখানে যাবার কথা তো আরো অসম্ভব।

গভর্নমেন্ট নাথুরাম বলেন যে, দিল্লী স্টেশনের বুকিং কেরাণী সুন্দরীলাল, সেখানকারই বিশ্রামকক্ষের বেয়ারা হরিকিষণ এবং মুচি জয় জ্যোতি,—এই তিনজন সাক্ষীই বলেছে যে, আপ্তে ও করকারে ৩০শে জানুয়ারি দিল্লীতেই ছিলেন। সুন্দরীলাল বলেছেন যে, ২৯শে জানুয়ারি বিশ্রাম-কক্ষ ভাড়া করবার সময় এবং ৩০শে জানুয়ারি সেই কক্ষ ত্যাগ করবার সময় নাথুরাম ও আপ্তেকে তিনি মাত্র কয়েক মিনিটের জন্যে দেখেছিলেন। হরিকিষণ বলেছে যে, ৩০শে জানুয়ারি সে নাথুরামকে বিশ্রাম-কক্ষ খালি করে দিতে বলেছিলো এবং সেই কক্ষে ঢুকে আরো দু'জন লোককে দেখতে পেয়েছিলো। ঘর খালি করে দেবার সময় সুন্দরীলালের উপস্থিতির কথা হরিকিষণ উল্লেখ করে নি। ৩০শে জানুয়ারি বিশ্রাম-কক্ষে-উপস্থিত ব্যক্তি হিসাবে সে আপ্তেকে আদালতে সনাক্তও করতে পারে নি। সুন্দরীলাল ও হরিকিষণের সাক্ষ্য যদি এক করা যায় তবে দু'টির মধ্যে এতো পার্থক্য দেখা যাবে যে, সমগ্র কাহিনীটিকেই মনে হবে সন্দেহজনক।

জয় তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, ধৌত করবার জন্যে হরিকিষণ নাথুরামের কয়েকটি বস্ত্র তাকে দিয়েছিলো। জয় কাজ করে মুচির, নিজে সে কাপড় ধোয় না। সুতরাং কাপড়গুলিকে নিশ্চয়ই সে কোনো বস্ত্র-ধৌত-করবার-দোকানে দিয়েছিলো। জয় মুচির কথা সত্য বলে প্রমাণ করবার জন্যে সরকারপক্ষের উচিত ছিলো,—সেই দোকানের কোনো লোককে সাক্ষীরূপে আদালতে হাজির করা।

অতঃপর নাথুরাম বলেন, "ভারতের ইতিহাসে এইটিই একমাত্র মামলা যে-মামলায় সরকার ও দেশবাসী একপক্ষে এবং আসামীরা একপক্ষে। ভগৎ সিংয়ের কার্য্য হিংসাত্মক হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসের করাচি-অধিবেশনে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিলো। কিন্তু আমাদের মামলা একেবারে অদ্ভুত ধরণের। কেউ আমাদের পক্ষে সাক্ষ্য দিতে আসতে পারেন না।

সাক্ষী হিসাবে কারো নাম উল্লেখ করে আমিও আমার লোকদের ক্ষতি করতে চাই না।"

উপসংহারে নাথুরাম বলেন যে, তিনি নিজে যে-হত্যা করেছেন তার জন্যে কারো কাছে দয়ার প্রত্যাশা করবার অধিকার তাঁর নেই।

পঞ্চান্ন

ডাঙ্গের সওয়াল

নাথুরামের পর সওয়াল সুরু করেন করকারের কৌসুলি শ্রীযুত ডাঙ্গে। তিনি বলেন যে, আসামীর সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে, এবং অপরাধ প্রমাণের সম্পূর্ণ ভার সরকারপক্ষের।

সনাক্তকরণ প্যারেডের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, কেবলমাত্র সনাক্তকরণই প্রমাণ নয়, যদি না তা অন্যান্য পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়। ম্যারিনা হোটেলের সাক্ষীদের সাক্ষ্য একেবারেই মূল্যহীন, কারণ তাদের কেউ করকারের সেই হোটেলে উপস্থিতির সম্বন্ধে সাক্ষ্য দেয় নি। বাদগের সাক্ষ্যও একই রূপ মূল্যহীন, কারণ অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ দ্বারা তা সমর্থিত হয় নি।

ষড়যন্ত্রে করকারে কোনো অংশ গ্রহণ করেছিলেন কি না, সে-কথার উল্লেখ করে শ্রীযুত ডাঙ্গে বলেন, ডাঃ জৈন তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন—মদনলাল করকারেকে আমেদনগরের একজন 'শেঠ' বলে তাঁর কাছে পরিচিত করেছিলেন। কিন্তু এ-কথা যে মিথ্যা—ডাঃ জৈনের নিকট মদনলালের লিখিত দু'টি পত্রেই তা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, সেই দু'টি পত্রের কোনোটিতে 'শেঠ' নামের কোনো উল্লেখ নেই।

শেরিফ হোটেলে ছদ্মনাম গ্রহণের উল্লেখ করে কৌঁসুলি বলেন যে, সাক্ষ্যপ্রমাণে দেখা যায়—করকারে তাঁর নাম লিখেছিলেন বি. এম. ব্যাস, কিন্তু মদনলাল লিখেছিলেন নিজের নামই। যদি ষড়যন্ত্রের কোনো পরিকল্পনা হয়ে থাকতো তবে দু'জ'নই ছদ্মনামের আশ্রয় নিতেন। এ থেকেই বুঝা যায় যে, ষড়যন্ত্র হয়েছিলো বলেই করকারে ছদ্মনাম গ্রহণ করেন নি।

ম্যারিনা হোটেলের জনৈক সাক্ষী বলেছে যে, হোটেলের চল্লিশ নম্বর ঘরে সে করকারকে চা পান করতে দেখেছিলো। বোম্বাইয়ের সনাক্তকরণ প্যারেডে করকারেকে সনাক্তও করেছে সে। সাক্ষী আরো বলেছে যে, শত-শত লোককে সে চা পরিবেষণ করতো। শত-শত লোককে-যে চা পরিবেষণ করে তার সাক্ষ্য কিরূপে বিশ্বাসযোগ্য বলে গণ্য করা যেতে পারে? অথচ সে-লোক মাত্র একটিবার করকারেকে চা পরিবেষণ করেই তাঁকে সনাক্ত করলে!

আর-একজন সাক্ষী বলেছে যে, ১৭ই জানুয়ারি আপ্তে, নাথুরাম গড্‌সে, গোপাল গড্‌সে ও বাদগে ছিলেন ম্যারিনা হোটেলে। করকারের নাম সে উল্লেখ করে নি। এই ব্যক্তির সাক্ষ্যও বাদগের বিবৃতি দ্বারা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, রাজসাক্ষী বলেছেন যে, ১৮ই জানুয়ারি তিনি বোম্বাই ত্যাগ করে দিল্লী পৌঁছেছিলেন ১৯শে তারিখে।

বিড়লা ভবনের মোটর-পরিষ্কারক ছোট্টুরাম বলেছে যে, ২০শে জানুয়ারি তারিখে করকারে তার কাছে গিয়ে, ভৃত্যাবাসের পেছন থেকে মহাত্মা গান্ধীর ফটো নেবার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু ২০শে ফেব্রুয়ারির সনাক্তকরণ প্যারেডে সেই ছোট্টুরামই করকারে ও আপ্তেকে দেখিয়ে বলেছে যে, ওঁদের দু'জনের একজনই ফটো নেবার অনুমতি চেয়েছিলেন। অতএব ছোট্টুরামের সাক্ষ্য-যে স্ববিরোধী, তা-ই নয়, —অস্পষ্টও বটে।

বিড়লা ভবনের চৌকিদার ভূর সিং বলেছে যে, ২০শে জানুয়ারি দু'জন

লোক বৃত্যাবাসে আসেন; তাঁদের একজন ফটো নেবার অনুমতি চান, কিন্তু যিনি অনুমতি চেয়েছিলেন তাঁকে সনাক্ত করতে পারে নি সে। ভূর সিং আরো বলেছে যে, সেই লোকটির সঙ্গে ছিলো একটি খাকি ব্যাগ। কিন্তু বাদগের বিবৃতিতে দেখা যায় যে, ব্যাগটি ছিলো তাঁর কাছে, করকারের কাছে নয়। সুতরাং পরস্পরবিরোধী বলেই ঐ দু'জনের সাক্ষ্য প্রামাণ্য বলে গৃহীত হতে পারে না।

২০শে জানুয়ারি তারিখে করকারে নাকি 'জি. এম. যোশী' ছদ্মনামে দিল্লীর ফ্রন্টিয়ার হোটেলে বাস করেছিলেন। হোটেল-রেজিস্টারিতেও জি. এম. যোশীর একটি নাম দেখা যায়। থানাতেও জি. এম. যোশী বলে জনৈক ব্যক্তি বাস করতেন, কিন্তু সরকারপক্ষ তাঁকে আদালতে হাজির করেন নি। তাঁকে আদালতে হাজির করতে পারলেই ব্যাপারটা পরিষ্কার হতে পারতো।

বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, হোটেল-রেজিস্টারিতে জি. এম. যোশীর কোনো ঠিকানা লেখা নেই, অতএব কি বলে থানার সেই যোশীকে সরকারপক্ষ আদালতে উপস্থিত করবেন? ঐ নামে বহু লোকই থাকতে পারেন।

শ্রীযুত ডাঙ্গে বলেন যে, ফ্রন্টিয়ার হোটেলের ম্যানেজারের সাক্ষ্যে জানা যায়, করকারে বাস করেছিলেন হোটেলের দু'নম্বর ঘরে, আর গোপাল গড্‌সে ছিলেন চার নম্বর ঘরে। তাঁরা যদি ষড়যন্ত্রকারীই হবেন তো দু'জনেই এক ঘরে বাস করেন নি কেন?

বিচারপতি মন্তব্য করেন যে, ব্যাপারটার অন্য অর্থও হতে পারে। ২০শে জানুয়ারির ঘটনার পরে হয়তো ষড়যন্ত্রকারীদ্বয় একত্রে থাকতে চান নি। উত্তরে শ্রীযুত ডাঙ্গে বলেন যে, করকারে ও গোপাল গডসে-যে কোনো দিন একই ঘরে বাস করেছিলেন, সাক্ষ্যপ্রমাণে এমন কথার উল্লেখ কোথাও নেই।

সুন্দরীলালের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, ৩০শে জানুয়ারি তারিখে দিল্লী রেলওয়ে স্টেশনের বিশ্রাম-কক্ষ খালি করে দেবার সময়ে নাথুরাম না কি করকারেকে তাঁর বিছানাপত্র বহন করতে বলেছিলেন। কিন্তু করকারে কেন বিছানাপত্রের বোঝা বইতে যাবেন? নিশ্চয়ই কোনো 'কুলি' মোট বয়েছিলো।

হরিকিষণ বলেছে যে, ২৯শে জানুয়ারি নাথুরাম যখন তাকে ধোয়াবার জন্যে কাপড়চোপড় দিয়েছিলেন তখন নাথুরামের সঙ্গে আরো দু'জন লোক ছিলেন। আবার সুন্দরীলাল বলেছেন যে, ২৯শে তারিখে বিশ্রাম-কক্ষে তিনি মাত্র দু'জন লোককেই দেখেছিলেন। দু'জনের উক্তিই পরস্পর-বিরোধী।

বাদগে বলেছেন যে, হিন্দু মহাসভা ভবনের পেছন দিকের জঙ্গলে করকারে উপস্থিত ছিলেন না। করকারে যদি ষড়যন্ত্রকারী হতেন তবে নিশ্চয়ই তিনি উপস্থিত থাকতেন সেখানে। ২০শে জানুয়ারি তারিখে বিড়লা ভবনেও করকারের উপস্থিতি অনুরূপভাবে প্রমাণিত হয় নি। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, দিল্লীতে বাদগের সঙ্গে করকারের দেখাই হয় নি।

বাদগে আরো বলেছেন যে, ২০শে জানুয়ারি বিকেলে ম্যারিনা হোটেলে করকারে এই প্রস্তাব করেছিলেন যে, মদনলাল যেই গানকটন বিস্ফোরণ করবেন অমনি করকারে ও বাদগে-সহ আর-পাঁচজন একসঙ্গে গান্ধীজীকে লক্ষ্য করে হাতবোমা ছুড়বেন। এ-প্রস্তাব কি পাগলামির নয়? গান্ধীজীকে হত্যা করাই যদি উদ্দেশ্য হবে তাঁদের তবে, বিস্ফোরক-বিশেষজ্ঞের মতে, একটি হাতবোমাই তো যথেষ্ট ছিলো। এ-ঘটনা বাদগের বানানো-গল্প ছাড়া আর-কিছুই নয়। কৌসুলি আরো বলেন যে, করকারে যদি ষড়যন্ত্রের মধ্যেই থাকবেন তবে তথাকথিত ষড়যন্ত্র অনুযায়ী গান্ধীজীর প্রতি হাতবোমা নিক্ষেপ না করবার তাঁর কোনো কারণই থাকতে পারে না।

অধ্যাপক জৈন, শ্রীঅঙ্গদ সিং, শ্রীমোরারজী দেশাই-এর সাক্ষ্যও পরস্পরবিরোধী। বোম্বাইয়ের চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক যে-সনাক্তকরণ প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছিলো, তা-ও বেআইনী।

উপসংহারে শ্রীযুত ডাঙ্গে বলেন যে, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগই প্রমাণিত হয় নি; অতএব সন্দেহের অবকাশে তাঁকে মুক্তি দেওয়া উচিত।

ছাপ্পান্ন

পি. আর. দাশের সওয়াল

শ্রীযুত সাভারকরের পক্ষে সওয়াল করেন পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি শ্রীযুত পি. আর. দাশ। তিনি প্রথমেই বলেন যে, সরকারপক্ষ কর্তৃক আনীত অভিযোগক্রমে এ-কথা যদি সত্য হয় যে, গান্ধীজীকে হত্যা করবার জন্যে একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিলো তবে প্রশ্ন এই যে, ঐ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সাভারকরের কোনো যোগ ছিলো কি না।

আসামীপক্ষ বলতে চান যে, তেমন কোনো ষড়যন্ত্র হয় নি। যদি কোনো 'ষড়যন্ত্র' হয়েও থাকে তবে তার উদ্দেশ্য ছিলো কেবল ২০শে জানুয়ারি তারিখে প্রার্থনা সভায় বিক্ষোভ প্রদর্শন। গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ড নিরপেক্ষভাবে তাঁর হত্যাকারীর দ্বারাই সংঘটিত হয়েছিলো, কোনো ষড়যন্ত্রের পরিণতি তা নয়। ২০শে জানুয়ারির বোমাবিস্ফোরণের উদ্দেশ্য ছিলো শুধু মহাত্মা গান্ধী ও সমবেত জনতার দৃষ্টি আকর্ষণ, কাউকে আঘাত করা বা হত্যা করা নয়। ২০শে জানুয়ারি তারিখে গান্ধী-হত্যার ষড়যন্ত্র যদি হয়ে থাকতো তবে সাতজন দৃঢ়সঙ্কল্প ব্যক্তি সেদিনে তা করতে সক্ষম হলেন না,—এর কোনো হেতুই থাকতে পারে না। অথচ সেদিন তাঁদের

[illegible]লাগে সন্দেহ করবারও কেউ ছিলো না। কিন্তু বোমাবিস্ফোরণের পরে যখন পুলিশ-প্রহরা বসানো হয়েছিলো এবং তাঁদের প্রতি সন্দেহ করবারও যথেষ্ট কারণ ছিলো—সেই দিনেই ঘটলো হত্যাকাণ্ড! এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে ষড়যন্ত্র থাকা সম্ভব নয়। তা ছাড়া, ৩০শে জানুয়ারি তারিখে কোনো ষড়যন্ত্র হয়েছিলো বলেও সরকারপক্ষের কেউ কোনো সাক্ষ্য দেন নি। বাদগের সাক্ষ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা হচ্ছে এই যে, ২০শে জানুয়ারি সন্ধ্যেবেলায় যখন তিনি হিন্দু মহাসভা ভবনে ফিরে গিয়েছিলেন, আপ্তে ও গড্‌সেও তাঁর পশ্চাতেই গিয়েছিলেন সেখানে। কি হয়েছে, জিজ্ঞাসা করা হলে রাজসাক্ষী কোনো উত্তর দেন নি। মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র হয়েছিলো,—ঐ ঘটনা দ্বারাই বাদগেব এ-কথা মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে যায়। ৩০শে জানুয়ারির ঘটনার পরে ষড়যন্ত্রকারীদের আবার কোথাও মিলিত হতে হবে,—এমন কোনো ইঙ্গিতও পাওয়া যায় নি।

দীক্ষিত মহারাজের সাক্ষ্যে জানা যায় যে, জানুয়ারি মাসে আপ্তে দু'টি গানকটন, দু'টি রিভলবার ও পাঁচটি হাতবোমার অর্ডার দিয়েছিলেন। ঐগুলি বাদগের ভৃত্য শঙ্কর কর্তৃক ডেলিভারিও দেওয়া হয়েছিলো। কিন্তু ঐ জিনিষগুলি মহাত্মা গান্ধীর হত্যার ব্যাপারেই ব্যবহৃত হয়েছিলো, না হায়দ্রাবাদে প্রেরিত হয়েছিলো,—তারও কোনো প্রমাণ নেই।

সাভারকরের সঙ্গে কথা কইবার বেলায় আপ্তে ও গড্‌সে বিশ্বাস করে বাদগেকে কখনো সঙ্গে নেন নি। তাই যদি হয় তবে, ষড়যন্ত্রেব মধ্যে সাভারকরকে জড়িত করবার জন্যে বাদগের সাক্ষ্যই বা আদালত বিশ্বাস করেন কিরূপে? ১৭ই জানুয়ারি সাভারকর-সদনে আপ্তে ও গড্‌সের গমনের কথাও প্রামাণ্য বলে গৃহীত হতে পারে না, কারণ, বাদগেই বলেছেন যে, সেদিন তাঁকে অন্য একটি কক্ষে অপেক্ষা করতে হয়েছিলো।

সাভারকরের আদেশ অনুযায়ী গান্ধীজী, পণ্ডিতজী, ও জনাব সুরাবর্দিকে হত্যা করবার জন্যে আপ্তে ও গডসে যখন দিল্লী যাত্রা করেন তখন বাদগেকেও তাঁদের সঙ্গে যেতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন তাঁরা,—বাদগের এই উক্তিও অত্যন্ত সন্দেহজনক। পুলিশকে ব্যাপারটা না জানিয়ে কেন বাদগে তখুনি নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন ?

২০শে জানুয়ারি সকালে আপ্তের বিড়লা ভবনে গমনের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, এই ঘটনা প্রমাণ করবার জন্যে ট্যাক্সি-চালক সুরজিৎ সিংয়ের (ঐদিনই সন্ধ্যায় ষড়যন্ত্রকারীদলকে বিড়লা ভবনে নিয়ে গিয়েছিলো বলে কথিত ব্যক্তি) মতো, সরকারপক্ষ আর-কোনো সাক্ষীর সাক্ষ্যই গ্রহণ করেন নি। হিন্দু মহাসভা ভবনের পেছন দিককার জঙ্গলে পিস্তল পরীক্ষার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, নিরক্ষর বনরক্ষীর সাক্ষ্য সমর্থনের জন্যে সরকারপক্ষের উচিত ছিলো কোনো সাক্ষীকে আদালতে উপস্থিত করা। তা করা হয় নি বলেই সরকার-পক্ষের সাক্ষ্য সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়। সুলোচনা দেবী, ছোট্টুরাম, ভূর সিং ও লালা কিষণচাঁদ—সবার সাক্ষ্যই পরস্পরবিরোধী বলে মূল্যহীন। প্রিভি কাউন্সিলের রুলিং-এ আছে,—যখনই কোনো সাক্ষীর সাক্ষ্য সম্বন্ধে সন্দেহ সমুপস্থিত হয়, আসামীকে তখুনি সন্দেহের অবকাশে মুক্তি দেওয়া যেতে পারে।

শ্রীযুত দাশ বলেন, ট্যাক্সি-চালক সুরজিৎ সিংয়ের সাক্ষ্যেরও কোনো মূল্য নেই। ২০শে জানুয়ারি বোমাবিস্ফোরণের অব্যবহিত পরেই নাথুরাম সুরজিতের গাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন বলে সুরজিৎ নাথুরামকে সনাক্ত করেছে। অথচ সাক্ষ্যে সে বলেছে যে, বাদগে, আপ্তে, গোপাল ও শঙ্কর—এই চারজনকে সে কনট সার্কাস থেকে বিড়লা ভবনে নিয়ে গিয়েছিলো, এ-সম্পর্কে নাথুরামের নাম সে উল্লেখ করে নি। আবার ছোট্টুরাম ও ভূর সিং বলেছে যে, তারা নাথুরামকে গাড়ি

মোরকে মারতে দেখেছে। সুরজিৎ সিংয়ের সাক্ষ্যেই ছোটুরাম ও সুর সিংয়ের সাক্ষ্য মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। অন্য দিকে, বাদগের সাক্ষ্য ও সুরজিৎ সিংয়ের সাক্ষ্য পরস্পরবিরোধী। বাদগে বলেছেন, বোমাবিস্ফোরণের পর তিনি তাঁর ভৃত্য শঙ্করকে তাঁর সঙ্গে হিন্দুমহাসভা ভবনে যেতে বলেছেন, এবং তাঁরা দু'জনে একটি টাঙ্গা করে সেখানে গিয়েছিলেন। কিন্তু সুরজিৎ সিং বলেছে,—বোমাবিস্ফোরণের পর শঙ্করও ফিরে গিয়েছিলো তার ট্যাক্সিতে।

তিনি বলেন, "সব সময়েই আমি বলে আসছি যে, সনাক্তকরণের ব্যাপার প্রহসন ছাড়া আর কিছুই নয়।"

তারপর তিনি বলেন যে, তাঁর যুক্তি অনুযায়ী ২০শে জানুয়ারি নাথুরাম যখন প্রার্থনা সভায় ছিলেনই না, তখন ২০শে জানুয়ারি তারিখে গান্ধী-হত্যার ষড়যন্ত্র কিরূপে সম্ভব? ২০শে জানুয়ারি তারিখে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্র হয়েছিলো—বাদগের এই উক্তির কোনো সমর্থনই এ-যাবৎ হয় নি কেন,—এ-সম্পর্কে এইটিই প্রধান প্রশ্ন।

২০শে জানুয়ারি বাস্তবিক যা ঘটেছিলো, সরকারপক্ষের ষড়যন্ত্র-অভিযোগকে তা অপ্রমাণিতই করে। সরকারপক্ষ বলেছেন, ষড়যন্ত্রকারীরা ২০শে জানুয়ারি সন্ধ্যায় মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার সঙ্কল্প করেছিলেন। কিন্তু আসামীপক্ষ বলতে চান যে, গান্ধী-হত্যার কোনো পরিকল্পনাই ছিলো না তাঁদের, তাঁরা চেয়েছিলেন কেবল বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে। বাদগের কথা যদি সত্য হতো, তবে সাতজন দৃঢ়-সঙ্কল্প ব্যক্তি ২০শে জানুয়ারি তারিখেই মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করতেন; যাতে কোনো লোকের কোনো ক্ষতিই হয় নি, তেমন গানকটন বিস্ফোরণ ঘটিয়েই ক্ষান্ত হতেন না তাঁরা। নিরাপদ দূরত্বে একটি বোমা না ফাটিয়ে সোজাসুজি গান্ধীজীর দিকেই সেটি নিক্ষেপ করে

একা মদনলালই মহাত্মাকে হত্যা করতে পারতেন। তথাকথিত ষড়-যন্ত্রকারী দল কেন যে তাঁদের পরিকল্পনামতো কাজ করলেন না—সরকারপক্ষ তার কোনো যুক্তি দেখান নি। গান্ধী-হত্যা নিরপেক্ষ-ভাবে একক ব্যক্তিরই কাজ, তার পেছনে কোনোই ষড়যন্ত্র ছিলো না।

আর-একটি বিষয় লক্ষণীয়। সুরজিৎ সিং তার সাক্ষ্যে বলেছে যে, বোমাবিস্ফোরণ হবার আগেই গোপাল ও শঙ্করকে নিয়ে আপ্তে ও নাথুরাম তার গাড়িতে ফিরে গিয়েছিলেন। গান্ধীজীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রই যদি হয়ে থাকে তবে এতো শীগগীর তাঁদের গাড়িতে ফিরে যাবার কোনো হেতুই থাকতে পারে না। বোমা ফাটবার আগেই তাঁদের গাড়িতে ফিরে যাবার ব্যাপার থেকে বুঝা যায় যে, লাউডস্পীকার খারাপ ছিলো বলে বিক্ষোভ প্রদর্শনের মূল পরিকল্পনাও পরিত্যক্ত হয়েছিলো। তা ছাড়া, দেশলাই জ্বালিয়ে গানকটন ধরানোর পর মদনলাল সে-জায়গা থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করেন নি। প্রথম থেকে তাঁর সব কাজ যিনি লক্ষ্য করছিলেন তিনি সুলোচনা দেবী। বিড়লা ভবনের অন্যান্য সাক্ষীদের সাক্ষ্য অপেক্ষা তাঁর সাক্ষ্যই বিশেষ করে গ্রহণীয়।

অধ্যাপক জৈনের সাক্ষ্য উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, অধ্যাপক জৈন, সমাজের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। গবেষণার জন্যে তিনি 'ডাক্তার' উপাধি লাভ করেছেন। বোম্বাইয়ের নাগরিক হিসাবে তাঁর স্থান অতি উচ্চে। তিনি সাক্ষ্য দিয়েছেন, মদনলাল তাঁর কাছে না কি বলেছেন যে, আমেদনগরের একটি দল গান্ধীজীকে হত্যা করবার সঙ্কল্প করেছে। এই কাহিনী একেবারেই অবিশ্বাস্য, কারণ গান্ধীজীর প্রতি অধ্যাপক জৈনের কোনো বিদ্বেষ ছিলো,—এমন কথা মনে করবার কোনো হেতুই মদনলালের ছিলো না। ষড়যন্ত্রে অধ্যাপকের সমর্থনও ছিলো না। ষড়যন্ত্রের কথা শুনে তিনি ভীতিবিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন।

সম্ভ্রান্ত নাগরিক হিসাবে অধ্যাপক জৈন যদি তাঁর কর্ত্তব্যপালন করতেন তবে বহুপূর্ব্বেই ষড়যন্ত্রের সমাপ্তি ঘটতে পারতো। কিন্তু অধ্যাপক জৈন তৎক্ষণাৎ ঐ-কথা পুলিশে জানান নি বলেই কাহিনীটি হয়ে পড়েছে অবিশ্বাস্য।

বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত মোরারজী দেশাইয়ের সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে শ্রীযুত দাশ বলেন যে, ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১৫৭ ধারা অনুযায়ী শ্রীযুত দেশাইয়ের সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয়। মদনলালের কথা শুনবার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক জৈন যদি তা স্বরাষ্ট্র-সচিবকে জানাতেন তবেই গ্রহণীয় হতে পারতো শ্রীযুত দেশাইয়ের সাক্ষ্য। কিন্তু অধ্যাপক ২০শে জানুয়ারির বোমা-বিস্ফোরণের দিন পর্য্যন্ত কিছুই জানান নি।

অধ্যাপক জৈন আরো বলেছেন যে, তিনি শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বলেছিলেন, দিল্লীতে খুব সম্ভব একটা বিরাট ষড়যন্ত্র চলেছে। অধ্যাপক জৈনের কথা বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে, এই মামলা সম্পর্কে শ্রীযুত জয়প্রকাশ নারায়ণ একজন গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী। কিন্তু অধ্যাপক জৈনের বিবৃতি সমর্থনকল্পে সরকার-পক্ষ তাঁকে আদালতে উপস্থিত করেন নি।

অধ্যাপক জৈনের সঙ্গে মদনলালের ছিলো ঘনিষ্ঠ পরিচয়। বোমা-বিস্ফোরণের পর মদনলাল হয় তো পুলিশের কাছে তাঁর নাম প্রকাশ করে ফেলতেও পারে, এই ভয়ে বোমাবিস্ফোরণের পরদিন অধ্যাপক জৈন সমস্ত ঘটনা পুলিশকে খুলে বলেছিলেন। তা নইলে, মদনলালের কাছ থেকে ষড়যন্ত্রের কথা জানবার পরই তিনি কেন তা পুলিশে জানান নি?

শ্রীযুত আমছেকরের সাক্ষ্যেও বুঝা যায় না যে, মদনলাল ষড়যন্ত্রকারী ছিলেন, কারণ তিনি বলেছেন যে, মদনলাল কেবল সর্ব্বত্র তাঁর

আমেদনগরের কার্য্যকলাপের প্রচার করেই বেড়াতেন। এরূপ কাজ কোনো ষড়যন্ত্রকারীর চরিত্রদ্যোতক নয়।

২৫শে জানুয়ারি থানার শ্রী জি. এম্. যোশীর বাড়ীতে নাথুরাম, আপ্তে, করকারে ও গোপাল গড্‌সের মধ্যে সক্ষাৎকারের উল্লেখ করে শ্রীযুত দাশ বলেন যে, ঐ সাক্ষাৎকারের কথা প্রমাণ করবার জন্যে সরকারপক্ষ শ্রীজি. এম্. যোশীর পুত্র শ্রীবসন্ত যোশীকে সাক্ষীরূপে হাজির করেছেন। বসন্ত যোশী কেবল বলেছেন যে, ঐ চারজন ২৫শে তারিখে রাত সাড়ে আটটা থেকে ন'টা পর্য্যন্ত তাঁদের বাড়ীতে ছিলেন। এ-কথা বিশ্বাস্য বলে ধরে নিলেও তাতে যড়যন্ত্র প্রমাণিত হয় না। কয়েকজন লোকের একত্র সমাবেশই ষড়যন্ত্র প্রমাণের পক্ষে যথেষ্ট নয়। ঐ চারজন লোকের মধ্যে কি কথাবার্ত্তা হয়েছিলো, বসন্ত যোশী তা জানতে পারেন নি। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পিতার পরিবর্ত্তে পুত্রকে সাক্ষীরূপে গ্রহণ করা হয়েছে। শ্রীজি. এম্. যোশী লালকেল্লায় ছিলেন পনেরো দিন। অথচ তাঁর কোনো সাক্ষ্য নেওয়া হয় নি। ব্যাপারটা সরকারপক্ষের পক্ষে হয়েছে মারাত্মক। ২৫শে জানুয়ারির ঐ বৈঠকের কি উদ্দেশ্যে ছিলো এবং সেখানে কোন বিষয়ের আলোচনা হয়েছিলো, একমাত্র জি. এম্. যোশীই বলতে পারতেন সে-কথা। বসন্ত যোশীর সাক্ষ্যের কোনো মূল্যই নেই। আবার এলফিনস্টোন হোটেলের ম্যানেজারের সাক্ষ্যে প্রকাশ যে, ২৫শে জানুয়ারি নাথুরাম ও আপ্তে ছিলেন বোম্বাইয়ে,—পুণায় নয়। সুতরাং ঐদিনই রাত্রিতে তাঁদের থানায় উপস্থিতি অলৌকিক ব্যাপার।

অতঃপর শ্রীযুত সাভারকরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সাভারকর ও গান্ধীজীর মধ্যে কতকগুলি মৌলিক মতভেদ থাকলেও অনেক বিষয়েই তাঁদের মধ্যে মতের পার্থক্য ছিলো না। শ্রীযুত সাভারকরও বলেছেন যে. গান্ধীজী ও তাঁর মধ্যে বরাবরই বিশ্বাস ও

সৌহার্দ্যের সম্পর্ক ছিলো। অতএব এরূপ মনোভাবসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষে গান্ধীজীর প্রতি কোনোবিদ্বেষই থাকতে পারে না। গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ডের পর শ্রীযুত সাভারকরের বাসভবন তল্লাস করে যে-দশ হাজার চিঠিপত্র পাওয়া যায়, সেগুলির মধ্যে এমন একটি শব্দও ছিলো না যা দ্বারা বুঝা যায়, সাভারকর মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু কামনা করেছিলেন বা তাঁর বিরুদ্ধে কোনো বিদ্বেষমূলক প্ররোচনা দিয়েছিলেন। আপ্তে ও গডসে কেন সাভাকরের নিকট পত্রাদি লিখতেন, সাভারকর তারও কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। আপ্তে ও গডসে ছিলেন হিন্দু মহাসভার কর্ম্মী, সাভাবকব ছিলেন তার সভাপতি। সুতরাং কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁরা সভাপতিব কাছ থেকে নির্দ্দেশ ও পরামর্শ প্রার্থনা কববেন, এ-তো স্বাভাবিক। নাথুরাম ও আপ্তে কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংবাদপত্রের জন্যে সাভারকরের পনেরো হাজার টাকা দানের ব্যাপারও অপরাধের বিষয় হতে পারে না। সাভারকর অন্যান্য সংবাদপত্রকেও আর্থিক সাহায্য দান করতেন। তা ছাড়া নাথুরামের সংবাদপত্র ছিলো হিন্দু মহাসভাপন্থী। এই হেতু সেই সংবাদপত্রকে আর্থিক সাহায্য ও আশীর্ব্বাদ দান করা সাভারকরের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়।

রাজসাক্ষী বাদগে বলেছেন যে, নেহরু-সরকারে যোগদান সম্পর্কে শ্রীযুত শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি সাভারকরের সঙ্গে পরামর্শ করেছিলেন। এ থেকে এই বুঝায় না যে, নেহরু-সরকারের প্রতি সাভারকরের বিদ্বেষ ছিলো। বরং এই অভিমতই সমর্থিত হয় যে, জাতীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার জন্যে সাভারকর শ্রীযুত মুখার্জিকে নেহরু-মন্ত্রীসভায় যোগ দিতে পরামর্শ দিয়েছিলেন।

বাদগে বলেছেন যে, ১৪ই জানুয়ারি তারিখে নাথুরাম, আপ্তে ও বাদগে সাভারকর-সদনে গিয়েছিলেন। সেখানে পৌছে আপ্তে, বাদগেকে বাইরেই অপেক্ষা করতে বলে নাথুরাম সহ উপরে চলে যান এবং

মিনিট পাঁচেক পর আবার দু'জনেই ফিরে আসেন। এই উক্তি যদি সত্য হয় তবে এ থেকে কেবল এই প্রমাণিত হয় যে, নাথুরাম ও আপ্তে সাভারকর-সদনে গিয়েছিলেন। তাঁরা সেখানে সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন কি না,—এই উক্তি থেকে তা বুঝবার উপায় নেই। তা ছাড়া, নাথুরাম ও আপ্তে—দু'জনেই, সেই দিন সাভারকর-সদনে যাবার কথা অস্বীকার করেছেন; এবং এই ঘটনা অন্য কোনো সাক্ষী কর্ত্তৃক সমর্থিতও হয় নি।

বাদগের সঙ্গে নাথুরাম ও আপ্তেব সম্পর্ক ছিলো সম্পূর্ণ ব্যবসায়গত। সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, তাঁরা বাদগেকে বিশ্বাস করতেন না। ১৪ই জানুয়ারি যদি তাঁরা সাভারকরের সঙ্গে দেখা করেও থাকেন তবে বাদগেকে বাড়ীর বাইরে রেখে আসতে তাঁরা ভুল করেন নি!

নাথুরাম ও আপ্তের প্রতি সাভারকরের উক্তি সম্বন্ধে যে-সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে তা-ও গ্রহণযোগ্য নয়। আপ্তে, বাদগেকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে প্ররোচিত করবার জন্যে সাভারকরের নাম ব্যবহার করেছিলেন—এই ধরণের সাক্ষ্য যদি স্বীকৃত হয় তবে বলতে হবে যে, কেউ সুস্থমস্তিষ্ক নন।

বাদগে বলেছেন যে, ১৭ই জানুয়ারি সাভারকর,—নাথুরাম ও আপ্তেকে বলেছিলেন, 'সফলকাম হয়ে ফিরে এসো।' আপ্তে ট্যাক্সিতে বলেছিলেন যে, গান্ধীজীর শতায়ু পূর্ণ হয়েছে বলে তাঁতিয়ারাও ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। যদি ধরেও নেওয়া যায়, তাঁরা ১৭ই জানুয়ারি সাভারকর-সদনে গিয়েছিলেন তবুও এই প্রশ্ন উঠে যে, পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাঁদের কি কথাবার্ত্তা হয়েছিলো? ঐ সময়ে হায়দ্রাবাদের সমস্যা ছিলো একটি বিরাট সমস্যা। এমনও হতে পারে যে, হায়দ্রাবাদ সম্পর্কেই তাঁদের মধ্যে কথাবার্ত্তা হয়েছিলো। তাঁদের সংবাদপত্র সম্বন্ধেও সাভারকরের সঙ্গে আলোচনা করে থাকতে পারেন তাঁরা। ১৯৪৭-৪৮ সালের মধ্যে

নাথুরাম অথবা আপ্তে সাভারকরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন,—এমন কোনো প্রমাণ নেই। তা হলে এ-কথা কি করে সম্ভব যে, নাথুরাম ও আপ্তে সাভারকরের কাছে গিয়ে বলেছিলেন যে, তাঁরা গান্ধীজীকে হত্যা করতে যাচ্ছেন এবং সেইজন্যে সাভারকরের আশীর্ব্বাদ নিতে এসেছেন তাঁরা? গান্ধীজীর শতায়ু পূর্ণ হবার কথাও অনুরূপ অবিশ্বাস্য। যে-ট্যাক্সিতে ঐ-কথা হয়েছিলো সেই ট্যাক্সির চালকও এ-কথা সমর্থন করে নি। তা ছাড়া গান্ধীজীর সঙ্গে সাভারকরের সম্পর্কের কথা বিবেচনা করেও এ-কথা বিশ্বাস করা যায় না যে, সাভারকর ঐরূপ কথা বলতে পারেন।

সাভারকরের বিরুদ্ধে মাত্র তিনটি সাক্ষ্য আছে,—(১) দীক্ষিত মহারাজের প্রাঙ্গণে আপ্তের উক্তি; (২) গত ১৭ই জানুয়ারি আপ্তে ও গডসের সাভারকর-সদনে গমন এবং (৩) সাভারকরের ভবিষ্যদ্বাণী সম্পর্কে ট্যাক্সিতে আপ্তের উক্তি। বর্ত্তমান মামলায় সাভারকরের বিরুদ্ধে আপ্তের বক্তব্য ব্যবহার করবার আগে এ-কথা বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ দেখাতে হবে যে, সাভারকর ষড়যন্ত্রকারীদের একজন ছিলেন। অন্যথায় তা গ্রহণ করা যেতে পারে না।

কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্যের সঙ্গে মিল না থাকায় বাদগের সাক্ষ্যও গ্রাহ্য হতে পারে না। রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য 'হাস্যকর'।

কার্য্যের সাফল্য কামনা করে সাভারকর মদনলালের পিঠ চাপড়ে দিয়েছিলেন বলেই তিনি যে এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, এ-কথা বুঝায় না। অধ্যাপক জৈন, শ্রীযুত মোরারজী দেশাইয়ের সাক্ষ্য এবং মদনলাল ও সাভারকরের জবানবন্দীর কথা বিবেচনা করে, সাভারকরের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকা সম্পর্কে অঙ্গদ সিংয়ের সাক্ষ্যও অগ্রাহ্য করা উচিত।

শ্রীযুত দাশ বলেন যে, রাজসাক্ষীর সাক্ষ্য কেবলমাত্র অযৌক্তিক নয়, পরস্পরবিরোধীও বটে—এ-কথা তিনি পূর্ব্বে বলেছেন। ২০শে

জানুয়ারির ঘটনার পর আপ্তে ও গড্‌সে আসেন বোম্বাইয়ে, ২৩শে থেকে ২৭শে পর্য্যন্ত বাস করেন এলফিনস্টোন হোটেলে। শ্রীনাগরওয়ালা বলেছেন যে, সাভারকর-সদনের উপর তখন সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছিলো; সাভারকর পর্য্যন্ত সে-কথা জানতেন না। সুতরাং আপ্তে ও গড্‌সে দু'জনেই সাভারকরের সঙ্গে দেখা করেছিলেন, এ-কথা সত্য হতে পারে না।

আদর্শগত মতভেদ থাকা সত্বেও সাভারকরের উপর মহাত্মার বিশ্বাস ও শুভেচ্ছা ছিলো বলে জানবার পর—সাভারকরের ন্যায় মর্য্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলে বিশ্বাস করা অসম্ভব। সাভারকর বহুবার বলেছেন যে, হিন্দু মহাসভার উচিত নেহ্‌রু-সরকারকে সমর্থন করা।

সরকারপক্ষের কৌঁসুলি এমন কোনো প্রমাণ দেখান নি যা দ্বারা প্রমাণিত হতে পারে যে, গান্ধীজীর প্রতি সাভারকরের কোনোপ্রকার আক্রোশ ছিলো। গান্ধীজীর সহিত আদর্শগত বিভেদের জন্যে যদিও তিনি মহাসভা নামক এক বিরাট প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন তবু গান্ধীজীর প্রতি তাঁর এতোটুকুও আক্রোশ ছিলো না। প্রকাশ্য রাজনৈতিক ক্ষেত্র হতে অবসর গ্রহণ করবার পর সাভারকরের ন্যায় কোনো ব্যক্তি-যে কোনো প্রকার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হবেন—তা পরম বিস্ময়ের বিষয়। কেবলমাত্র নির্দোষ বলে রায় দিলেই সাভারকরের পক্ষে যথেষ্ট হবে না। তাঁর সম্পর্কে এমন রায় দেওয়া প্রয়োজন যাতে তাঁর চরিত্রের উপর কোনো রেখাপাত না হয়।

সাতায়

ব্যানার্জির সওয়াল

শ্রীযুত ব্যানার্জি তাঁর সওয়ালের প্রারম্ভেই বলেন যে, প্রথমেই এই হত্যাপরাধের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিচার করতে হবে। সরকারপক্ষ বলেছেন, পাকিস্তানকে ভারত-সরকারের পঞ্চান্ন কোটি টাকা দানের সিদ্ধান্তের পরিণতিই হচ্ছে গান্ধীজীর হত্যাকাণ্ড। কিন্তু সরকারপক্ষ সে-সম্পর্কে লিখিত প্রমাণ দেখান নি একখানিও।

অতঃপর তিনি বলেন যে, অধ্যাপক জৈনের সাক্ষ্যে সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত হয় নি, প্রকৃতই ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর সঙ্গে মদনলালের সাক্ষাৎ হয়েছিলো কি না। ষড়যন্ত্র প্রকৃতপক্ষে কোন সময় থেকে সুরু হয়েছিলো তার তারিখ নির্দ্দিষ্ট করাই আদালতের কর্ত্তব্য। এ-বিষয়ে অনেকগুলি তারিখের কথা উল্লেখ করা হয়েছে,—কখনো বলা হয়েছে ১৯৪৭ সালের নভেম্বর, কখনো ঐ সালেরই ডিসেম্বর, আবার কখনো ব' ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি। সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে জানা যায় যে, ৯ই অথবা ১০ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত মদনলাল ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলেন না। আমেদ-নগরেই যদি ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে তবে মদনলাল যে ৯ই অথবা ১০ই জানুয়ারি আমেদনগরে ছিলেন না তারও প্রমাণ রয়েছে। ৯ই জানুয়ারি পর্য্যন্ত মদনলাল ষড়যন্ত্রের মধ্যে ছিলেন না, এ-কথা স্বীকার করে নিলে অধ্যাপক জৈনের সাক্ষ্য অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর হয়ে যায়। দীক্ষিত মহারাজের সাক্ষ্যও যদি গ্রাহ্য হয় তবু বলতে হবে যে, তাতে এমন কিছু নেই যাতে মদনলালকে ষড়যন্ত্রে জড়ানো যায়।

জানুয়ারি মাসের ১৭ই, ১৮ই অথবা ১৯শে তারিখে মদনলাল ম্যারিনা হোটেলে গিয়েছিলেন,—এ-কথা একজন সাক্ষীও বলেন নি। গ্রেফ্তারের পর পুলিশের নিকট ম্যারিনা হোটেলের চল্লিশ নম্বর ঘরের কথা বলা

ছাড়া ম্যারিনা হোটেলের সঙ্গে মদনলালের সংস্রবের আর-কোনো প্রমাণই নেই। পুলিশের নিকট কোনো আসামীর বিবৃতি আইনত গ্রহণীয় হতে পারে না।

তবে কি পটবর্দ্ধন সম্পর্কিত ঘটনা যখন ঘটেছিলো সেই ৫ই জানুয়ারি তারিখেই ষড়যন্ত্র হয়েছিলো? পটবর্দ্ধন-সম্পর্কিত ঘটনাও কি ষড়যন্ত্রেরই অঙ্গ? ষড়যন্ত্রের তারিখ নির্দ্ধারণকল্পে আদালতকে এই সব প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে। অধ্যাপক জৈনের কাছে কেন একজন ষড়যন্ত্রকারী ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করতে যাবে? অধ্যাপক জৈনের সাক্ষ্যও সম্পূর্ণ সমর্থিত হয় নি। ঘটনাবলী দ্বারা এ-কথাই প্রমাণিত হয় যে, কোনোরূপ ষড়যন্ত্রই হয় নি। আর হলেও অন্ততপক্ষে মদনলাল তার মধ্যে ছিলেন না। অধ্যাপক জৈনের সাক্ষ্যের যে-সব প্রধান অংশ শ্রীঅঙ্গদ সিং ও শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের সাক্ষ্য দ্বারা সমর্থিত হয় নি, মদনলালকে ষড়যন্ত্রে জড়াবার পক্ষে সাক্ষ্যের সেই সব অংশ মূল্যহীন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, অধ্যাপক জৈন তাঁর সাক্ষ্যে বলেছেন যে, মদনলাল আমেদনগরের স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কথা তাঁর কাছে বলেছিলেন। কিন্তু অঙ্গদ সিংয়ের সাক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কোনো উল্লেখ নেই। অধ্যাপক জৈন, শ্রীঅঙ্গদ সিং ও শ্রীমোরারজী দেশাইয়ের সাক্ষ্য থেকে বুঝা যায় যে, মদনলালের কাছ থেকে শুনে অধ্যাপক জৈন যা বলেছিলেন, শ্রীঅঙ্গদ সিং ও শ্রীমোরারজী দেশাই সেই কথারই আবৃত্তি করেছেন মাত্র। অধ্যাপক জৈনের সঙ্গে কথা কয়ে শ্রীমোরারজী দেশাই যদি গান্ধীজীকে হত্যা করবার কোনোরূপ ষড়যন্ত্রের বিষয় জানতে পেরেছিলেন তবে সেই হত্যাকাণ্ড বন্ধ করবার জন্যে তাঁর কাছ থেকে দ্রুত ব্যবস্থা অবলম্বনের আশা করা অযৌক্তিক নয়। কিন্তু বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র-সচিব কর্তৃক তেমন কোনো ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি। অতএব ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণের কোনো সাক্ষ্যই দেখতে পাওয়া যায় না।

বোমাবিস্ফোরণসম্পর্কে, ২১শে জানুয়ারি সংবাদপত্রে যা পাঠ করে ছিলেন, অধ্যাপক জৈন তারই উপর ভিত্তি করে তাঁর সাক্ষ্যের কাঠামো তৈরি করেছেন, এ-ধারণ খুবই সম্ভব। এই কারণেই তাঁর সাক্ষ্য গ্রাহ্য হতে পারে না।

শ্রীযুত মোরারজী দেশাই ষড়যন্ত্রের কথা বলেছিলেন শ্রীযুত নাগর-ওয়ালাকে, কিন্তু অধ্যাপক জৈনের নাম উল্লেখ করেন নি তিনি। শ্রীযুত নাগরওয়ালাও তাঁকে সে-বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি। এ থেকে বুঝা যায় যে, শ্রীযুত দেশাই অধ্যাপক জৈনের কাহিনী বিশ্বাস করেন নি। শ্রীযুত নাগরওয়ালা অধ্যাপক জৈনের নাম জানতে পারেন ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে, কিন্তু তাঁর (শ্রীনাগরওয়ালার) বিবৃতি লিপিবদ্ধ হয় ১৭ই ফেব্রুয়ারি। এই বিলম্বের হেতু কি? তা ছাড়া অঙ্গদ সিং তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন যে, মদনলাল যখন অধ্যাপক জৈনের নিকট মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রের কথা বলেন তখন তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। এ থেকে বুঝা যায় যে, অঙ্গদ সিং ও অধ্যাপক জৈনের প্রদত্ত সাক্ষ্য দু'টি এমনভাবে যুক্ত হয়েছে যাতে আপাতদৃষ্টিতে একে ষড়যন্ত্র বলে মনে হতে পারে।

বাদগের সাক্ষ্যেও এমন কিছু নেই যাতে প্রমাণিত হয় যে, মদনলালের সঙ্গে তাঁর বিশেষরূপ পরিচয় ছিলো। অতএব মদনলাল সম্পর্কে রাজ-সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা যেতে পারে না।

৯ই জানুয়ারি তারিখে 'জিনিষ' দেখবার জন্যে মদনলাল, করকারে, ওম প্রকাশ ও জগদীশচন্দ্র চোপরা বাদগের দোকানে গিয়েছিলেন। সে-কথার উল্লেখ করে শ্রীযুত ব্যানার্জি বলেন যে, আপ্তের নির্দেশে ঐ জিনিষগুলি কিনবার উদ্দেশ্য ছিলো বোধ করি হায়দ্রাবাদের হিন্দুদের মধ্যে সেগুলিকে বিতরণ করা। যতোক্ষণ না প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় ততোক্ষণ ঐ 'জিনিষ' দেখবার ব্যাপারটাকে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত করা

যেতে পারে না। ঐ ব্যাপারে ষড়যন্ত্র অপ্রমাণিত করবার জন্যে বিশদ সাক্ষ্য প্রমাণ উপস্থিত করা আসামীপক্ষের কাজ নয়।

রাজসাক্ষীর সাক্ষ্যে জানা যায় যে, কেবল মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রই হয় নি, পণ্ডিত নেহ্রু ও জনাব সুরাবর্দ্দিকে হত্যা করবার ষড়যন্ত্রও হয়েছিলো। ১৯শে অথবা ২০শে জানুয়ারি তারিখে, কিংবা তার পরেও জনাব সুরাবর্দ্দির প্রাণনাশের কোনো চেষ্টাই হয় নি। ষড়যন্ত্রকারীরা-যে পরিকল্পনার পরিবর্ত্তন করেছিলেন, ফরিয়াদীপক্ষ তা-ও প্রমাণ করেন নি।

অতঃপর শ্রীযুত ব্যানার্জি বলেন যে, বোম্বাই সিটি পুলিশ আইনের ৭০ ধারা অনুযায়ী বোম্বাইয়ের চীফ্ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ব্রাউনের, কোনো কারণ না দেখিয়ে, আসামীকে পুলিশ-হেপাজতে রাখবার কোনো ক্ষমতাই নেই। তা ছাড়া, পুলিশ-হেপাজতে থাকাকালীন সনাক্তকরণ প্যারেড পরিচালনা করবার অধিকারও তাঁর নেই। অধিকন্তু পুলিশ-হেপাজতে থাকাকালীন আসামীকে কোনোরূপ প্রশ্ন করাও পুলিশের পক্ষে বেআইনী কাজ। আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করবার জন্যে পুলিশ কখনো তাকে প্রশ্ন করতে পারে না। বোধ করি, একমাত্র সাভারকর ব্যতীত, অন্যান্য সকল আসামীই পুলিশ কর্ত্তৃক বিভিন্ন স্থানে নীত হয়েছিলো। বৃটিশ আমলের সর্ব্বাপেক্ষা জঘন্য সময়েও এমন ব্যবস্থা কখনো অবলম্বিত হয় নি।

মদনলাল কখন ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিলেন, সরকারপক্ষ তার কোনো প্রমাণ দেন নি। কখন, কোথায় মদনলাল ষডযন্ত্রে যোগদান করেছিলেন, সরকারপক্ষের কাছ থেকে আদালতের তা জানা কর্ত্তব্য ছিলো। সরকার-পক্ষ যদি এই ব্যাপাব প্রমাণ কবতে না পারতেন তবে ষড়যন্ত্রের কাহিনী স্বতই মিথ্যা হয়ে যেতো।

সরকারপক্ষ বলেছেন যে, হত্যাকাণ্ডের আগেই নাথুরাম তাঁর জীবন-বীমার পলিসিসমূহ তাঁর ওয়ারিশগণের নামে পরিবর্তিত করেছিলেন। ২০শে জানুয়ারি তারিখে তিনি অন্যান্য সহকর্মীদের সঙ্গে,—পাঁচটি হাতবোমা, দু'টি গানকটন ও দু'টি রিভলবার নিয়ে প্রার্থনা সভায় গিয়েছিলেন। ইচ্ছা করলে ঐদিনই তিনি গান্ধীজীকে গুলী করে হত্যা করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। সমগ্র ষড়যন্ত্রের একটি নাটকীয় রূপ দেবার জন্যেই সরকারপক্ষ এই ভাবে ঘটনাটি বিবৃত করেছেন।

বাদগে বলেছেন যে, ২০শে জানুয়ারি বিকেলে ম্যারিনা হোটেলে নাথুরাম তাঁকে বলেছিলেন যে, ঐ তাঁদের শেষ চেষ্টা, কাজ তাঁদের শেষ করতেই হবে। ঐ যদি ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা হয়ে থাকে তবে, শেষ চেষ্টা বলতে মহাত্মা গান্ধীর হত্যাই বুঝায়—আদালতের এরূপ ধারণা করা উচিত নয়। শেষ চেষ্টার অন্য অর্থও হতে পারে। শেষ চেষ্টা অর্থ যদি গান্ধী-হত্যাই হতো তবে ২০শে জানুয়ারি তারিখেই সেই হত্যাকাণ্ড ঘটতো।

শ্রীযুত ব্যানার্জি বলেন যে, আইন অনুসারে পুলিশ, আসামীকে প্রশ্ন করতে পারে না। আসামী যদি স্বেচ্ছায় বিবৃতিদান করে তবে পুলিশ কেবলমাত্র তা লিখে রাখতে পারে, কিন্তু তাকে বিবৃতিদানে বাধ্য করতে পারে না।

আটাশ

ইনামদারের সওয়াল

শ্রীযুত ইনামদার প্রথমেই বলেন যে, বিনা লাইসেন্সে আসামীরা দিল্লীতে দু'টি রিভলবার চালান দিয়েছিলেন, সাক্ষ্যে এ-কথা প্রমাণিত হয় নি।

অস্ত্র আইনের অভিযোগের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, আদালতকে যে-সকল অভিযোগের বিচার করবার ক্ষমতা দিয়ে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, তাতে অস্ত্র আইনের ১৯ ধারার উল্লেখ নেই। ডাঃ পারচুরে সব সময় গোয়ালিয়রে ছিলেন, অতএব তাঁর পক্ষে সেখান থেকে দিল্লীতে একটি রিভলবার আমদানীর প্ররোচনা দেওয়া সম্ভব নয়।

সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখে শ্রীনাগরওয়ালার সঙ্গে অধ্যাপক জৈনের কথাবার্তা হয়েছিলো। কিন্তু ১৭ই ফেব্রুয়ারির আগে তাঁর বিবৃতি লিপিবদ্ধ করা হয় নি। নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী জবানবন্দী দিতে বাধ্য করবার জন্যেই পুলিশ প্রথমে (১৩ই ফেব্রুয়ারি তারিখে) শ্রীযুত দেশাইয়ের বিবৃতি লিপিবদ্ধ করেছিলো। অতএব অধ্যাপক জৈন পুলিশের কাছে যা বলেছিলেন তা সত্য-ঘটনার যথার্থ বিবৃতি নয়।

গোপাল গডসের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, গোপাল গডসেকে এই মামলায় জড়িত করবার জন্যে তদন্তব্যাপারে ইচ্ছাপূর্ব্বক নিয়ম লঙ্ঘন করা হয়েছে। আসামীদের কেন বোম্বাই-গোয়েন্দা-আপিসে রাখা হয়েছিলো তার কারণ অবোধ্য। প্রত্যেক সনাক্তকারী-সাক্ষীকে বোম্বাই নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো। তদন্ত বিধানের উহাও নিয়মলঙ্ঘন। এই নিয়মলঙ্ঘনের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সনাক্তকরণের সন্দেহজনক ব্যাপার। পারচুরের ব্যাপারেও অনুরূপ নিয়মলঙ্ঘন ঘটেছে। অন্যান্য আসামীদের যখন বিচারাধীন বন্দী-হাজতে রাখা হয়েছিলো তখন পারচুরেকে কেন গোয়ালিয়র দুর্গে রাখা হলো? শ্রীযুত ইনামদার, এই মামলার তদন্তকারী কর্ম্মচারীদের ভুল এবং অসতর্কতাবশত যা হয়েছে, তাকে উপেক্ষা না করতে আদালতকে অনুরোধ জানান।

সাক্ষীদেরও পুলিশ-হেপাজতে রাখা যেতে পারে না। কাউকে সাক্ষ্য দেবার জন্যে ডাকা হলে তার যদৃচ্ছা যাবার ক্ষমতা থাকা চাই। কিন্তু এই মামলার সনাক্তকারী সাক্ষীদের, প্রকৃতপক্ষে, আটক রাখা হয়েছে। তার

প্রভাব সাক্ষীদের মনের উপর ছায়াপাত করতে বাধ্য। এ-অবস্থায় কি করে তারা মন খুলে আদালতে সাক্ষ্য দিতে পারে ?

৩০শে মার্চের আগে বিড়লাভবনের সাক্ষীদের সনাক্তকরণ ব্যাপারে ডাকা হয় নি। এই ব্যাপারের সমালোচনা করে শ্রীযুত ব্যানার্জি বলেন যে, এই বিলম্বের একটি মাত্র কারণ হতে পারে ; তা হচ্ছে এই যে,—ঐ সাক্ষীদের সকলকেই বিড়লা ভবনে এমনভাবে কর্মে নিযুক্ত করা হয়েছিলো যাতে পুলিশের ইচ্ছামতো যখন-খুশি-তখনই তাদের দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়া যায়।

২০শে জানুয়ারি করকারে ফটোগ্রাফারের ভাণ করে ছোট্টুরামের সঙ্গে কথা কয়েছিলেন বলে সাক্ষ্যে বলা হয়েছে। দিল্লীর ম্যাজিস্ট্রেট শাহনী তাঁর সাক্ষ্যের এক জায়গায় বলেছেন যে, বোমাবিস্ফোরণকালে বাবুরাম গুপ্ত নামক টাইম্‌স্ পত্রিকার জনৈক ফটোগ্রাফারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হতে পারে এই ভদ্রলোকই ছোট্টুরামের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। সরকারপক্ষ থেকে বাবুরাম গুপ্তকে আদালতে হাজির করলেই এই ব্যাপার পরিষ্কার হতে পারতো।

ফ্রন্টিয়ার হিন্দু হোটেলের ম্যানেজার শ্রীরামপ্রকাশের সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, রামপ্রকাশ বলেছেন, ২০শে জানুয়ারি বিকেল চারটের সময় গোপাল গডসে তার হোটেলে একটি ঘর ভাড়া করেন। গোপাল তখন সেখানে ছিলেন প্রায় পঁচিশ মিনিট কাল। আবার তাঁকে হোটেলে দেখা গিয়েছিলো রেডিওতে সান্ধ্য খবর বলবার সময়ে। লোকটি যদি সত্যই গোপাল গডসে হতো তবে নিশ্চয়ই সে ষড়যন্ত্র-সিদ্ধির মানসে তাড়াতাড়ি বিড়লা ভবনে ছুটতো। কিন্তু সাক্ষ্যপ্রমাণে এমন কিছু নেই যাতে বুঝা যায় যে, লোকটির খুব তাড়াহুড়া ছিলো।

গোপাল গডসের নিকট-থেকে-প্রাপ্ত বলে কথিত ক্যানভাস্ ব্যাগটি

আসলে বাদগের। বোম্বাই-গোয়েন্দা-আপিসে বাদগের কাছ থেকে তা -পাবার পর ব্যাগটির মালিকত্ব চাপানো হয়েছে গোপাল গড্‌সের উপর। বাদগের গ্রেফ্‌তারের পর যদি তাঁর বাড়ী তল্লাস হতো তবে ব্যাগটি হয়তো সেখান থেকেই পাওয়া যেতো।

সাক্ষ্যে দেখা যায় যে, ১৩ই জানুয়ারি তারিখে নাথুরাম, গোপাল গড সেকে আড়াইশো টাকা দিয়েছিলেন। নাথুরাম হয়তো ভেবেছিলেন যে, নিজের বেতন থেকে কিছু সঞ্চয় করতে পারেন না বলে গোপাল যখন তাঁর কাছে টাকা চেয়েছেন তখন গোপালের স্ত্রীকেই তাঁর (নাথুরামের) জীবনবীমার ওয়ারিশ মনোনীত করে গোপালকে সাহায্য করা উচিত। জীবনবীমার ওয়ারিশ মনোনীত করা সম্পর্কে অন্য কোনো ধারণা করা ঠিক নয়।

ডাঃ পারচুরে ছিলেন গোয়ালিয়র হিন্দু সভার নেতা। গোয়ালিয়র রাজ্যেও ছিলো তাঁর অসীম প্রতিপত্তি। গোয়ালিয়রে কংগ্রেস-সরকার প্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে তিনি বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন। এ খুবই স্বাভাবিক যে, উন্মত্ত কংগ্রেস দল সে-জন্যেই ডাঃ পারচুরেকে এই মামলায় জড়িয়েছেন।

মধুকর কালে যে একজন 'শেখানো সাক্ষী', তা মনে করবার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। পারচুরের বাড়ীর প্রাঙ্গণে নাথুরাম ও আপ্তে কর্তৃক অস্ত্র-পরীক্ষার ব্যাপার তিনি দেখেছিলেন এবং অস্ত্র দেওয়া-নেওয়ার সময়েও তিনি উপস্থিত ছিলেন বলে বলা হয়েছে। কিন্তু পুলিশের কাছে ঘটনাটি বলবার সময় আইনানুগতভাবে তাঁর বিবৃতি লিপিবদ্ধ হয় নি কেন? ডাঃ পারচুরের সম্পর্কে কোনোরূপ বিপরীত সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায় না—এ-কথাই প্রমাণিত হয়েছে। শ্রীযুত ইনামদার, বিচারপতিকে এই সকল অসামঞ্জস্যের কথা বিবেচনা করতে অনুরোধ করেন।

ডাঃ পারচুরেকে গোয়ালিয়র দুর্গে কেন সৈন্যবাহিনীর হেপাজতে

আবদ্ধ করে রাখা হয়েছিলো? ঐরূপ আটক রাখা বেআইনী। দুর্গে-আবদ্ধ পারচুরের স্বীকারোক্তি গ্রহণের ক্ষমতা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুত অটলের নাই।

ডাঃ পারচুরে,—নাথুরাম ও আপ্তেকে যে-পিস্তল দিয়েছিলেন বলে বলা হয়েছে, তার স্বত্বাধিকার সম্পর্কেও একটা স্বীকারোক্তি আছে। জনৈক বন্দুক প্রস্তুতকারী ও শ্রীনাথুলাল জৈন নামক এক ব্যক্তি তার সমর্থক। অথচ ঐ দু'জনকেই আদালতে হাজির করা হয় নি।

শ্রীযুত ইনামদারের সওয়াল শেষ হবার সঙ্গে গান্ধী-হত্যা মামলার শুনানিরও শেষ হলো। প্রায় আট মাস লাগলো শুনানি শেষ হতে। এইবার বিচারপতির রায় দানের পরেই ঘটবে এই কাহিনীর পরিসমাপ্তি।

ঊনষাট

বিচারপতির রায়

১৯৪৯ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি।

বিচারপতি শ্রীযুত আত্মাচরণ এইদিন বেলা সাড়ে এগারোটার সময় গান্ধী-হত্যা মামলার রায় প্রদান করেন।

দু'শো চার পৃষ্ঠাব্যাপী সুদীর্ঘ রায়ে তিনি বলেছেন যে, মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করবার যে-ষড়যন্ত্র হয়েছিলো, তা প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারির প্রথম দিক থেকেই নিঃসংশয়ে সুরু হয়েছিলো সেই ষড়যন্ত্রের। ষড়যন্ত্রের স্থান ছিলো পুণা, বোম্বাই, দিল্লী ও অন্যান্য জায়গা। ষড়যন্ত্রকারীদের মধ্যে ছিলেন অন্তত নাথুরাম গড্‌সে, নারায়ণ আপ্তে, বিষ্ণু

করকারে, মদনলাল, শঙ্কর কিস্তায়া, গোপাল গড্‌সে, ডাঃ পারচুরে ও দিগম্বর বাদ্‌গে। বাদগের প্রতি প্রদর্শিত হয়েছে রাজানুকম্পা। মনে হয়, সাভারকরের বিরুদ্ধে সরকারপক্ষ যে-মামলা দায়ের করেছেন, তার ভিত্তি কেবল রাজসাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাভারকরের বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী যা বলেছেন, তার উপর নির্ভর করে কোনো সিদ্ধান্ত করা ঠিক হবে না।

বিচারপতি বলেন যে, "২০শে জানুয়ারি তারিখে (বিড়লা ভবনে বিস্ফোরণের দিনে) মদনলাল গ্রেফ্‌তার হবার অব্যবহিত পরে, মদনলাল যে-জবানবন্দী দিয়েছিলেন এবং বোম্বাইয়ের স্বরাষ্ট্র-সচিব শ্রীযুত মোরারজী দেশাইয়ের নিকট ডাঃ জে. সি. জৈন যে-বিবৃতি দিয়েছিলেন, পুলিশ তাকে মোটেই কাজে লাগাতে পারে নি। এ-ব্যাপারে শোচনীয় ব্যর্থতারই পরিচয় দিয়েছে তারা। ঐ দু'টি বিবৃতির অব্যবহিত পরেই বোম্বাই-পুলিশ ও দিল্লী-পুলিশের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিলো। তবু তারা তার কোনোরূপ সুযোগগ্রহণ করতে নিদারুণ নিষ্ফলতাই দেখিয়েছে। ঐ সময়ের মধ্যে (১৯৪৮ সালের ২০শে জানুয়ারি থেকে ৩০শে জানুয়ারির মধ্যে) এ-সম্পর্কে তদন্তের জন্যে যদি সামান্য আগ্রহও দেখানো হতো, তবে হয়তো এই শোচনীয় ঘটনা আদৌ সংঘটিত হতো না।"

মামলার ঘটনাবলীর আলোচনা করে, শ্রীযুত আত্মাচরণ বলেন, "শ্রীযুত পি. আর. দাশ তাঁর সওয়ালে বলেছেন যে, ২০শে জানুয়ারি তারিখে প্রার্থনা সভায় বোমাবিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই ষড়যন্ত্রের (যদি কোনো ষড়যন্ত্র হয়ে থাকে) সমাপ্তি ঘটেছিলো ; ৩০শে জানুয়ারি তারিখে নাথুরাম কর্তৃক মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড কেবল নাথুরামের একক-কর্ম্মই ছিলো ; এবং সেজন্যে অন্যান্য আসামীদের কোনোরূপেই দায়ী করা যেতে পারে না। ষড়যন্ত্র অপরাধের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হচ্ছে,—দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মধ্যে অপরাধ অনুষ্ঠানের চুক্তি। ২০শে জানুয়ারি তারিখের

ব্যর্থতার পর সকল আসামীই গান্ধী-হত্যার পরিকল্পনা পরিত্যাগ করেছিলেন,—মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণে এমন কিছু লিপিবদ্ধ নেই।

"প্রকৃতপক্ষে মামলার সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকে এই কথাই বুঝা যায় যে, নাথুরাম গড্‌সে ও নারায়ণ আপ্তে তখনো ছদ্মনামে বোম্বাইয়ে বাস করছিলেন। নাথুরাম ও আপ্তে, করকারে ও গোপাল গড্‌সে, থানায় জি, এম. যোশীর গৃহে সম্মিলিত হয়েছিলেন। নাথুরাম ও আপ্তে একটি রিভলবারের জন্যে সাক্ষাৎ করেছিলেন দাদা মহারাজ ও দীক্ষিত মহারাজের সঙ্গে। তাঁরা দু'জনেই ছদ্মনামে বোম্বাই থেকে দিল্লীতে গিয়েছিলেন বিমানারোহণে। পরে তাঁরা গোয়ালিয়রে গিয়ে পারচুরের মারফৎ সংগ্রহ করেছিলেন একটি পিস্তল। ফিরে এসে নাথুরাম আশ্রয় নিয়েছিলেন দিল্লী মেন স্টেশনের একটি বিশ্রাম-কক্ষে। আপ্তে এবং বিষ্ণু করকারেও ছিলেন তাঁর সঙ্গে। অতঃপর নাথুরাম গড্‌সে বিড়লা ভবনে গিয়ে গোয়ালিয়র-থেকে-সংগৃহীত পিস্তল দিয়েই মহাত্মা গান্ধীকে গুলী করে হত্যা করেন।

"এই সব ঘটনা থেকে মাত্র একটি সিদ্ধান্তেই পৌঁছা যায় যে,—২০শে জানুয়ারির প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পরেও একই ষড়যন্ত্র অব্যাহতভাবে চলছিলো, এবং তারই ফলে নাথুরাম কর্তৃক অনুষ্ঠিত হয়েছে মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড।"

ষড়যন্ত্রের সূত্রপাতের কথা আলোচনা করে বিচারপতি বলেন, "কবে, কোথায় এবং কার দ্বারা প্রথমে ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়, সরকারপক্ষ থেকে তার কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করা হয় নি। যাই হোক, আসামীদের গতিবিধি ও কার্য্যকলাপ থেকে নিঃসন্দেহে একথা বলা যায় যে, অন্ততপক্ষে ৯ই জানুয়ারি তারিখে ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব ছিলো। সেদিন নারায়ণ আপ্তে—বিষ্ণু করকারে ও মদনলাল পাওয়াকে অপর দু'জন লোকের সঙ্গে বাদগের বাড়ীতে পাঠিয়েছিলেন 'মাল' পরীক্ষা করতে। আপ্তে, করকারে ও মদনলাল এই সময়ে নিশ্চিতভাবেই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।

"ষড়যন্ত্র-দৃশ্যে নাথুরাম প্রথম দেখা দেন ১০ই জানুয়ারি তারিখে। ঐই দিন নাথুরাম ও আপ্তে, বাদগেকে অনুরোধ করেছিলেন দু'টি গান-কটন স্ল্যাব ও পাঁচটি হাতবোমা সরবরাহ করতে। সুতরাং ঐ সময়ে নাথুরাম নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দিগম্বর বাদগে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন ১৫ই জানুয়ারি তারিখে। সেদিন তিনি নাথুরাম ও আপ্তের সঙ্গে দিল্লী যেতে সম্মত হয়েছিলেন। গোপাল গডসে যোগ দেন ১৪ই জানুয়ারি তারিখে। সেদিন তিনি এগারো দিনের ছুটির জন্যে দরখাস্ত করেছিলেন। শঙ্কর কিস্তায়া ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় জানুয়ারি মাসের বিশ তারিখে। ঐদিন বাদগে তাকে বিড়লা ভবনে গমনের উদ্দেশ্যের কথা জানান। পারচুরে ষড়যন্ত্রে যোগ দেন ২৭শে জানুয়ারি তারিখে। ঐদিনেই তিনি নাথুরাম ও আপ্তের জন্যে একটি পিস্তল সংগ্রহ করে দেবেন বলে সম্মত হন।"

নাথুরাম গড্‌সে, আপ্তে, করকারে, মদনলাল, শঙ্কর কিস্তায়া, গোপাল গডসে ও পারচুরে—সকলেই ভারতীয় দণ্ডবিধির ১২০-বি ধারা (ষড়যন্ত্র) অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাঁদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযোগ এই,—ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে বোম্বাই থেকে বিনা লাইসেন্সে তাঁরা অস্ত্রশস্ত্র চালান দিয়েছেন। দিল্লীতে আনা হয়েছিলো বলে কথিত যে-দু'টি রিভলবার তাঁরা হিন্দুমহাসভা ভবনের পেছন দিককার জঙ্গলে পরীক্ষা করেছিলেন সে-দু'টি রিভলবার উদ্ধার করা সম্ভবপর হয় নি, আদালতেও তা প্রদর্শিত হতে পারে নি। অতএব, দিল্লীতে কিরূপ জিনিষ আমদানী করা হয়েছিলো এবং জঙ্গলে কিরূপ বস্তুই বা পরীক্ষা করা হয়েছিলো, তা ঠিক করা যায় নি। তদনুসারে, দ্বিতীয় অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে, বলে ধরে নেওয়া নিরাপদ নয়। নাথুরাম, আপ্তে, করকারে, মদনলাল, শঙ্কর গোপাল গড্‌সে ও বাদগের কাছে গানকটন স্ল্যাব ও হাতবোমা ছিলো বলে আসামীদের বিরুদ্ধে যে-তৃতীয় অভিযোগ করা হয়েছে, বিচারক

বলেন যে, তৎসম্পর্কে একটি গানকটন স্ল্যাব ও চারটি হাতবোমা পাওয়া গেছে। মামলার সাক্ষ্য থেকে প্রমাণিত হয় যে, বিস্ফোরণের দিনে, অর্থাৎ ২০শে জানুয়ারি তারিখে, দিল্লীতে আসামীদের কাছে ঐসকল জিনিষ ছিলো, অতএব তাঁরা বিস্ফোরক-দ্রব্য-আইন অনুযায়ী অপরাধী। চতুর্থ অভিযোগ সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, ২০শে জানুয়ারি, মদনলাল, বিড়লা ভবনের পেছন দিককার প্রাঙ্গণ-প্রাচীরের গায়ে একটি গানকটন স্ল্যাব বিস্ফোরণ করে। তাঁর কাজ ছিলো বেআইনী ও বিদ্বেষপ্রসূত। ফলে প্রাণহানিরও সম্ভাবনা ছিলো। সুতরাং মদনলাল বিস্ফোরক-দ্রব্য-আইনে অপরাধী। অপরাপর আসামী তাঁকে ঐ-কাজে প্ররোচনা দেবার অপরাধে অপরাধী। পঞ্চম অভিযোগ সম্বন্ধে বিচারপতির বক্তব্য এই যে, ২০শে জানুয়ারি তারিখে বিড়লা ভবনে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করা হয়; কিন্তু বাদগে ছোটুরামের ঘরে প্রবেশ করতে সম্মত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত ঐ চেষ্টা পর্যবসিত হয় ব্যর্থতায়। বিচারপতি বলেন যে, নাথুরাম ও আপ্তে, গোয়ালিয়র থেকে একটি পিস্তল দিল্লীতে এনেছিলেন বলে যে-ষষ্ঠ অভিযোগ করা হয়েছে, তা-ও প্রমাণিত হয়েছে। ৩০শে জানুয়ারি তারিখে আপ্তে ও করকারে দিল্লী মেন রেলওয়ে স্টেশনে ছিলেন নাথুরামের সঙ্গে,—এ-ও প্রমাণিত হয়েছে। ঐদিনেই সমস্ত জেনেশুনেও নাথুরাম গড্‌সে ইচ্ছাপূর্ব্বক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু ঘটান। হত্যাকাণ্ডের সময়ে বিড়লা ভবনে আপ্তে ও করকারের উপস্থিতি সরকারপক্ষ কর্ত্তৃক প্রমাণিত হয় নি।

বিড়লা ভবনের ঘটনার পর বাদগে ও শঙ্কর ষড়যন্ত্র থেকে নিজেদের সংস্রব ছিন্ন করেছিলেন, এ-কথা নিঃসন্দেহে ধরে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু বিড়লা ভবনের ঘটনার পর গোপাল গড্‌সেও-যে ষড়যন্ত্রের সঙ্গে নিজের যোগ বিচ্ছিন্ন করেছিলেন, এমন কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় নি। বরং সাক্ষ্যপ্রমাণে জানা যায় যে, ২৪শে জানুয়ারি তারিখে গোপাল গড্‌সে বোম্বাইয়ে নাথুরাম ও আপ্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন।

পারচুরেকে গোয়ালিয়র রাজ্যের প্রজা বলে ধরে নিলেও তাঁর বিচার করবার অধিকার এই আদালতের আছে, কারণ, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে দিল্লীতে।

অতঃপর বিচারপতি মন্তব্য করেন, "স্বেচ্ছায় এবং পূর্ব্বনির্দ্ধারিত উপায়ে নাথুরাম গড্‌সে মহাত্মা গান্ধীকে হত্যা করেছেন। তাঁর পক্ষ থেকে অপরাধের গুরুত্ব লাঘব করবার কোনো চেষ্টা করা হয় নি এবং তা করবার উপায়ও ছিলো না। এ-অবস্থায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী একমাত্র মৃত্যুদণ্ডই তাঁর প্রাপ্য।

"মহাত্মা গান্ধীর হত্যা-ব্যাপারে সহযোগিতা সম্পর্কে আপ্তে যা করেছেন তা-ও 'কম ঘৃণ্য নয়' (no less heinous). ষড়যন্ত্রের প্রতিটি স্তরে তিনিই বরাবর নেতৃত্ব করে এসেছেন এবং অপরাধের সর্ব্বাপেক্ষা সঙ্গীন মুহূর্ত্তে হয় তিনি ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেছেন, না হয় ঘটনাস্থলে অনুপস্থিত থেকেছেন। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্য না পাওয়া গেলে, মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ড সম্ভবত কখনো অনুষ্ঠিত হতো না। অতএব ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা সহ পঠিত ১০৯ ধারা অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ডই তাঁর পক্ষে একমাত্র প্রযোজ্য।

"আমার মতে, গোপাল গড্‌সে এবং পারচুরেকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা সহ পঠিত ১০৯ ধারা অনুযায়ী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিলেই ন্যায়ের মর্য্যাদা রক্ষিত হবে। এই অপরাধে তার চেয়ে কম শাস্তি দেওয়া যেতে পারে না।

"শঙ্কর কিস্তায়া ও মদনলালকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা সহ পঠিত ১২০-বি ধারা অনুযায়ী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড দিলেই ন্যায়ের গুরুত্ব লঙ্ঘিত হবে না। এই দুই ধারা অনুযায়ী এর চেয়ে আর কম শাস্তি হয় না।"

বিচারপতি বলেন, শঙ্কর ছিলো বাদগের ভৃত্য। সে যা-কিছু

করেছে, প্রভুর নির্দ্দেশানুযায়ীই করেছে। বাদগে না থাকলে আসামীরা নিশ্চয়ই শঙ্করকে দলে টানতো না। সুতরাং তার দণ্ডের মাত্রা কিছু লঘু হওয়া উচিত। তার দণ্ডের পরিমাণ কমিয়ে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪০১ ও ৪০২ ধারা অনুযায়ী সাত বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া যেতে পারে তাকে।

অতঃপর বিচারপতি অন্যান্য আসামীদের দণ্ডের কথা উল্লেখ করেন। মৃত্যুদণ্ডাদেশ হাইকোর্টের অনুমোদনসাপেক্ষ কি না, এই প্রশ্নের উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিশেষ আদালত কর্ত্তৃক মৃত্যুদণ্ডাদেশদান হাইকোর্টের অনুমোদনসাপেক্ষ নয়।

তারপর সাভারকরের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, রাজসাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর ভিত্তি করে সাভারকর সম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা নিরাপদ হবে না। ২০শে ও ৩০শে জানুয়ারি তারিখে দিল্লীতে যা-যা ঘটেছিলো তাতে সাভারকরের কোনো হাত ছিলো বলে অনুমান করবার উপায় নেই। সাভারকরের সঙ্গেই সাক্ষাৎ করবার জন্যে নাথুরাম ও আপ্তে সাভারকর-সদনের সুমুখে মোটর থেকে নেমেছিলেন, এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। সাভারকর ব্যতীত ভিডে ও দামলে নামক দু'জন লোকও বাস করতেন সাভারকর-সদনে। "রাজসাক্ষী বাদগে বলেছেন যে, তিনি শুনেছেন—গড্‌সে ও আপ্তেকে সাভারকর আশীর্ব্বাদ করছেন এই বলে,—"সফলকাম হয়ে ফিরে এসো"। গৃহের দ্বিতলে নাথুরাম ও আপ্তের সঙ্গে সাভারকরের কি কথা হয়েছিলো, তার প্রমাণ নেই। অতএব রাজসাক্ষীর সুমুখে সাভারকরের ঐ উক্তি-যে গান্ধী-হত্যার পরিকল্পনাসংক্রান্ত, এরূপ মনে করবার কোনো হেতু নেই।"

রাজসাক্ষী বাদগে সম্বন্ধে শ্রীযুত আত্মাচরণ বলেন যে, বাদগে খোলা-খুলিভাবেই ঘটনা সম্পর্কে তাঁর সাক্ষ্য দিয়েছেন। "তিনি জেরা অথবা

প্রশ্ন—কোনোটাই এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেন নি।" এতো দীর্ঘকাল ধরে এমন নির্ভুলভাবে সাক্ষ্যদান আর-কারো পক্ষে সম্ভবপর হতো না। তাঁর যে-সব সাক্ষ্য সাধারণভাবে সমর্থিত হয়েছে, তার উপর *আস্থা স্থাপন না করবার সঙ্গত কারণ নেই।*

পারচুরের সম্বন্ধে তিনি বলেন যে, গোয়ালিয়র দুর্গে অবস্থানকালে পারচুরে যে-স্বীকারোক্তি করেছেন তা বিশ্বাস না-করবার কোনো হেতু নেই। শ্রীযুত অটল ঐ স্বীকারোক্তি লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তার আগে তিনি পারচুরেকে ভালোভাবেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, তিনি নিজের ইচ্ছাতেই স্বীকারোক্তি করতে পারেন। ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা ভয়ে তা করবার দরকার নেই। "সাক্ষীদের মধ্যে অন্তত কয়েকজন, পারচুরে সম্পর্কিত সাক্ষ্য অতিরঞ্জিত করবার চেষ্টা করেছেন। তবে সেই সব সাক্ষ্য থেকে মোটের উপর এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ৩০শে জানুয়ারি তারিখে একটি চাঞ্চল্যকর সংবাদের প্রতীক্ষা করছিলেন পারচুরে। হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে হর্ষোৎফুল্ল হযে তিনি তাঁর বাড়ীতে মিষ্টান্ন বিতরণ করেন।"

বিচারপতি যে-দণ্ডাদেশ দিয়েছেন তার বিশদ বিবরণ এইরূপ:—

নাথুরাম গড্‌সে

(১) ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (সি) ধারা অথবা বিকল্পে ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (সি) ধারার সঙ্গে পঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৪ ধারা অনুযায়ী ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(২) ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ) ধারা অনুযায়ী ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৩) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৫ ধারা অথবা বিকল্পে উক্ত আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত ৫ ধারা অনুসারে ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৪) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ৪ (বি) ধারা অনুসারে ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৫) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ৩ ধারা অনুসারে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৬) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুসারে মৃত্যুদণ্ড।

তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হবে। সমস্ত কারাদণ্ড একসঙ্গেই চলবে।

নারায়ণ আপ্তে

(১) ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (সি) ধারা অথবা বিকল্পে ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (সি) ধারার সঙ্গে পঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৪ ধারা অনুযায়ী ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(২) ভাবতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ্) ধারার সঙ্গে পঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৪ ধারা অনুযায়ী ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৩) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৫ ধারা অথবা বিকল্পে উক্ত আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত ৫ ধারা অনুযায়ী ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৪) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ৪ (বি) ধারা অনুযায়ী ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৫) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৬) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ১০৯ ধারা অনুযায়ী মৃত্যুদণ্ড।

তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হবে। সমস্ত কারাদণ্ড একসঙ্গে চলবে।

বিষ্ণু করকারে

(১) ভারতীয় অস্ত্র আইনের ১৯ (এফ্) ধারার সঙ্গে পঠিত ভারতীয় দণ্ডবিধির ১১৪ ধারা অনুসারে ২ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(২) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৫ ধারা অথবা বিকল্পে উক্ত আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত ৫ ধারা অনুযায়ী ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৩) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ৪ (বি) ধারা অনুযায়ী ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৪) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৫) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ১০৯ ধারা অনুযায়ী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। উক্ত দণ্ডের সঙ্গে অপর দণ্ডগুলি একসঙ্গে চলবে।

মদনলাল পাওয়া

(১) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সঙ্গে পঠিত ১২০ (বি) ধারা অনুযায়ী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

(২) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৫ ধারা অথবা বিকল্পে উক্ত আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত ৫ ধারা অনুযায়ী ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৩) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ৪ (বি) ধারা অনুযায়ী ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৪) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী ১০ বৎসর কারাদণ্ড।

(৫) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ১১৫ ধারা অনুযায়ী ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

যাবতীয় দণ্ড একসঙ্গে চলবে।

শঙ্কর কিস্তায়া

(১) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ১২০ (বি) ধারা অনুযায়ী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

(২) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৩) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ৪ (বি) ধারা অনুযায়ী ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৪) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৫) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনেব ১১৫ ধারা অনুযায়ী ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

বিচারপতি এ-ও সুপারিশ করেছেন যে, ফৌজদারি আইনের ৪০১ ও ৪০২ ধারার বিধান অনুসারে শঙ্কর কিস্তায়াকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সঙ্গে পঠিত ১২০ (বি) ধারা অনুযায়ী প্রদত্ত যাবজ্জীবন দ্বীপান্তব দণ্ড হ্রাস করে ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া যেতে পারে। সমস্ত দণ্ডাদেশ একসঙ্গে চলবে।

গোপাল গড্সে

(১) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনের ৫ ধারা অথবা বিকল্পে উক্ত আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত ৫ ধারা অনুযায়ী ৩ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(২) বিস্ফোরক-দ্রব্য আইনের ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ৪ (বি) ধারা অনুযায়ী ৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৩) বিস্ফোরক দ্রব্য আইনেব ৬ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী ৭ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড।

(৪) ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ১০৯ ধারা অনুযায়ী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

যাবতীয় দণ্ড একসঙ্গে চলবে।

দত্তাত্রেয় পারচুরে

পারচুরে, ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সঙ্গে পঠিত ১২০ (বি) এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সঙ্গে পঠিত ১০৯ ধারা অনুযায়ী দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন। তাঁকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার সঙ্গে পঠিত উক্ত আইনের ১০৯ ধারা অনুযায়ী যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত করা হলো।

শ্রীযুত সাভারকরের বিরুদ্ধে চার্জ-শীটে উত্থাপিত অভিযোগসমূহ প্রমাণিত না হওয়ায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলো।

রায় পাঠ করতে বিচারপতির সময় লাগলো বিশ মিনিট। আসামীগণ একের পর এক দণ্ডায়মান হয়ে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করেন। বিচারপতি বলেন যে, আপীল করতে হলে পনেরো দিনের মধ্যেই করতে হবে। অতঃপর তিনি আদালত-কক্ষ ত্যাগ করেন।

মিনিট দুই পরে, দণ্ডিত-বন্দীদের কাঠগড়া থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। আদালত-কক্ষ ত্যাগের পূর্বে শ্রীসাভারকর ব্যতীত অন্যান্য সকল আসামীই ধ্বনি করে উঠেন,—"হিন্দু ধর্ম কি জয়!" "হিন্দুস্থান হামারা হায়!" "পাকিস্তান মুর্দাবাদ!" "তোড়কে রহেঙ্গে পাকিস্তান!" "হিন্দুস্থান অমর রহে!" "অখণ্ড ভারত অমর রহে!"

গান্ধী-হত্যার কাহিনী এইখানেই শেষ